ভারতের সাধক
শঙ্করনাথ রায়

ভারতের সাধক

(ষষ্ঠ খণ্ড)

শঙ্করনাথ রায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬০

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
সুপ্রকাশ সেন

সূচীপত্র

বিদ্যারণ্য স্বামী

মাধবাচার্য্যের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। দিনের পর দিন তীব্র অনুশোচনায় জ্বলিয়া মরিতেছেন, জীবনের উপর আসিয়াছে প্রবল ধিক্কার।

বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কই, মনে মনে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তো আজো সিদ্ধ হয় নাই! মরীচিকার মত কাম্যধন দিনের পর দিন কেবলি দূরে সরিয়া গিয়াছে। সকল প্রয়াস, সকল সাধনা হইয়াছে ব্যর্থ।

তবে কেন শুধু শুধু এই নিষ্ফল জীবনের ভার বহিয়া চলা?

বেদবেদান্তে আচার্য্যের পাণ্ডিত্য অগাধ। মূল্যবান শাস্ত্রগ্রন্থও তিনি কম রচনা করেন নাই। হাজার হাজার জিজ্ঞাসু পাঠক তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতেছে। সুধীসমাজ দিয়াছেন অজস্র সাধুবাদ।

চতুর্দ্দশ শতকের দক্ষিণ ভারত মাধবাচার্য্যের মনীষার দীপ্তিতে চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছে। এসময়ে এমন কোন দার্শনিক, এমন কোন ধর্ম্মনেতা এ অঞ্চলে নাই, শাস্ত্রবিদ্যায় যিনি তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে সমর্থ।

কিন্তু এই বিদ্যাবত্তা, এই পরাক্রম আজ অবধি তাঁহার কোন্ কাজে লাগিয়াছে? সত্যকার শান্তি তো তিনি পান নাই। যে অভীষ্টের দিকে এতকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন, আজো যে তাহা রহিয়াছে সুদূরপরাহত।

মাধব চাহিয়াছিলেন, সারা ভারতে তিনি অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিবেন। আচার্য্য শঙ্করের মতবাদকে আবার করিবেন উজ্জীবিত। এ মতবাদ ও এ আদর্শকে স্থাপন করিবেন জাতীয় জীবনের পুরোভাগে।

এই মহান কর্ম্মযজ্ঞের জন্য চাই এক উপযুক্ত ভিত্তিভূমি। কিন্তু ধর্ম্মধৃত, দৃঢ়মূল রাজশক্তি ছাড়া তো এই ভিত্তি কখনো রচিত হইতে পারে না! আচার্য্যের অন্তরে আজ তাই জাগিয়া উঠিয়াছে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প।

দিনের পর দিন তিনি ধ্যান কল্পনায় দেখিয়াছেন, তাঁহার এই ধর্ম্ম-রাজ্যের শিয়রে দীপ্তিমান রহিয়াছে জ্ঞানধর্ম্মে চিরপ্রোজ্জ্বল এক রজত-শুভ্র গিরিশিখর! এই শিখর-নিঃসৃত পুণ্যধারা সারা বিশ্বে অজস্র ধারায় ছড়াইয়া পড়িতেছে, জাগাইয়া তুলিতেছে বৈদিক ধর্ম্মের প্রাণশক্তি!

আপন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাধব পথ চলিয়াছেন, দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া নিজেকে প্রস্তুতও করিতেছেন। কিন্তু এ প্রস্তুতিকে কাজে লাগাইতে পারিলেন কই?

জীবনপ্রভু একদিক দিয়া কৃপা তাঁহাকে যথেষ্টই করিয়াছেন অকৃপণ করে জীবনপাত্রে ঢালিয়াছেন মেধা, প্রতিভা আর বেদোজ্জ্বল বুদ্ধির ঐশ্বর্য্য। কিন্তু কৃপণতা দেখাইয়াছেন শুধু অর্থের বেলায়। চরম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সারা জীবন মাধব জর্জ্জরিত হইয়া আসিতেছেন, মাথা তোলার সুযোগ পান নাই।

আজ এতদিন পরে এবার আচার্য্য সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন।

নাঃ আর নয়! দারিদ্র্যের এ অভিশাপ দূর করিতেই হইবে। যে ধর্ম্মরাজ্য, যে ধ্যানের ভারত তিনি গড়িয়া তুলিতে চান, তাহার প্রধান বাধা এই দুঃসহ দারিদ্র্য। এ বাধা চূর্ণ করিতেই হইবে। এজন্য সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ব সাধনা, তিনি আজ নিয়োজিত করিবেন। প্রয়োজন হইলে দিবেন আত্মবলি।

মহান্ এই কর্ম্মযজ্ঞ, বিপুল ইহার দায়িত্ব। একাজে প্রথমেই চাই প্রচুর অর্থ। চাই লক্ষ্মীর ঝাঁপির কল্যাণস্পর্শ।

আর স্বপ্নলোকে বিচরণ না করিয়া অচিরে গড়িয়া তুলিতে হইবে সংগঠনশক্তি, লোকবল, সৈন্যবল। সংগ্রহ করিতে হইবে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা আর রত্নসম্ভার।

এজন্য চাই পরাশক্তি মহাদেবীর কৃপা। তা ছাড়া যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে না। তাইতো আচার্য্য আজ হাম্পির ভুবনেশ্বরী মন্দিরে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। এবার তাঁহার দৃঢ় পণ—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

সেদিন হোমক্রিয়ার শেষে তিনি ধ্যান-জপে নিবিষ্ট হইলেন। স্থির করিলেন, মায়ের প্রত্যাদেশ না পাওয়া অবধি নিরস্ত হইবেন না, চালাইয়া যাইবেন আমরণ অনশন।

সাতদিন এভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল।

রাত্রি সেদিন গভীর হইয়া আসিয়াছে। আশেপাশে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। অদূরে শুধু ধ্বনিত হইতেছে স্রোতস্বিনী তুঙ্গভদ্রার অশ্রান্ত কল্লোল।

গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। মন্দিরের এক কোণে, স্তিমিত দীপের আলোকে বসিয়া মাধবাচার্য্য একাগ্রমনে শক্তিমন্ত্র জপ করিয়া চলিয়াছেন।

হঠাৎ কাণে পশিল মধুময়, অলৌকিক কণ্ঠস্বর, "বৎস মাধব, চোখ মেলে চাও। বল, কি তোমার প্রাথনা।"

সারা কক্ষ দেবী-অঙ্গের শুভ্র জ্যোতিতে একেবারে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। নয়ন মেলিতেই আচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইলেন। পতিত হইলেন মায়ের চরণতলে।

যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, "জননী, যদি কৃপা ক'রে দর্শন আজ দিলেই তবে ব'লে যাও, আমার জীবনের স্বপ্ন কি সফল হবে না?"

"কি তোমার অভীষ্ট, বৎস?"

"অন্তর্য্যামিনী, তোমায় কি সে কথা খুলে বলতে হবে? এ অধম সন্তানের সন্তাপের কথা তো তুমি সবই জানো। বিধর্ম্মীর আক্রমণের আঘাতে সারা দেশ আজ খান খান হ'য়ে ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে। আমার স্বধর্ম্মীদের ভেতর নেই কোন নীতিনিষ্ঠা, নেই আত্মিক শক্তি।

তাই ধর্ম্মকে, দেশকে বাঁচাবার জন্য আমি ক'রতে চাই এক মহান ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা।"

"তা, আমায় কি ক'রতে হবে, বল।"

"মা, তুমি আমায় এমন ঋদ্ধির বর দাও, এমন বিপুল ধনৈশ্বর্য্য দাও, যাতে এক শক্তিশালী রাজ্য আমি প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারি—আর আমার সেই রাজ্য হোক্ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আর ক্ষাত্রশক্তির উৎস-স্থল!"

"মাধব, তোমার এ প্রার্থনা তো আমি পূর্ণ ক'রতে পারছিনে। এ জন্মে ধনসম্পদের অধিকারী তুমি হ'তে পারবে না। নিয়তির এই বিধানই রয়েছে, বৎস। পরবর্ত্তী জন্মে হবে তোমার বিত্ত লাভ। দৈব কৃপাতেই তা তুমি পাবে। আর কঠোর তপস্যায় কাজ নেই, তোমার সঙ্কল্প এবার ত্যাগ কর!"

দেবীর বাণী তো নয়, এ যেন এক বজ্রাঘাত!

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "একি কথা তুমি শোনালে, জননী! আমার সারা জীবনের স্বপ্নসৌধকে যে তুমি ক'রে দিলে ধূলিসাৎ।"

ভগ্নহৃদয়ে তিনি কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

বড় দুঃখে ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছাড়িয়া মাধবাচার্য্য ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণে আগাইয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া তিনি দেখিয়াছেন, দিন দিন দেশ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। দেশের রাজারা ভোগ বিলাসের পঙ্কিলতায় ডুবিয়া আছে। অনাচার আর দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি আজ শিথিল। ন্যায়নীতি আর কল্যাণের পথ হইতে সমাজ সরিয়া আসিয়াছে অনেক দূরে। ধর্ম্ম ও লক্ষ্মী দুই-ই বুঝি এক সঙ্গে বিদায় নিতে উদ্যত।

এইসঙ্গে দাক্ষিণাত্যে দেখা দিয়াছে মুসলমান শক্তির আবির্ভাব। খিলজী আর তুঘলক বাহিনীর অত্যাচারে সারা দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। জনজীবনে আতঙ্কের সীমা নাই। মাধবাচার্য্যের নিজের অঞ্চল আনাগোণ্ডিও আজ মহা বিপন্ন। এ রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া

দিল্লীর সুলতান, মহম্মদ তুঘলক লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। বার বার চালাইতেছেন প্রচণ্ড আক্রমণ।

মাধব প্রাণ দিয়া তাঁহার দেশকে ভালবাসেন। বেদধর্ম্মের রক্ষায়ও তাঁহার উৎসাহের সীমা নাই। সর্ব্বোপরি মনের গভীরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের, অদ্বৈতব্রহ্মবাদ প্রচারের, দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। তাই আজ বড় চঞ্চল হইয়া দেবীর মন্দিরে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস—দেবী কৃপা করিয়া আবির্ভূতা হইলেন, কিন্তু প্রার্থনা তাঁহার পূর্ণ হইল না।

আশাহত মাধব মন্দিরের সোপানে বসিয়া, শিরে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিলেন—এবার তিনি কি করিবেন? কোন্ পথে, কাহার কাছে যাইবেন?

ঘরে ফিরিয়া আগের মতই আচার্য্য-জীবন যাপন করা তাঁহার পক্ষে কোনমতে আর সম্ভব নয়। এবার সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া চিরতরে গ্রহণ করিবেন সন্ন্যাস।

অচিরে হাম্পি ত্যাগ করিয়া মাধব পদব্রজে উপস্থিত হন শৃঙ্গেরী মঠে। আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত এ মঠ অদ্বৈতবিদ্যার মহান কেন্দ্র। এখানে বসিয়া শুরু হয় তাঁহার জীবনের নূতনতর অধ্যায়।

উত্তরকালে মাধবাচার্য্যের এই সন্ন্যাস দাক্ষিণাত্যের জনজীবনে ঘটায় এক নাটকীয় রূপান্তর। সঙ্গম রাজবংশের সাহায্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন। তারপর বৃত হন শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষের পদে। অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে, জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নেতারূপে, অর্জ্জন করেন অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি।

ঋদ্ধি আর সিদ্ধির যুগ্মরশ্মি ধারণ করিয়া মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য তাঁহার ধ্যানের ভারত গঠনে ব্রতী হন।

হাম্পির নিকটে, বর্ত্তমান অন্ধ্র রাজ্যের বেলারী জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রাম মাধবাচার্য্যের জন্মস্থান। আনুমানিক ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি

এখানে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা আচার্য্য মায়ন ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রের যজুঃশাখীয় ব্রাহ্মণ।[১] বেদজ্ঞ ও বহু শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া যেমন আচার্য্যের খ্যাতি ছিল, তেমনি সদাচারী ও সাধনপরায়ণ বলিয়াও লোকে করিত গভীর শ্রদ্ধা। মাধবের জননীর নাম শ্রীমতী। তিনি ছিলেন এক উন্নতমনা, ধর্ম্মনিষ্ঠা মহিলা।

মাধবের দুই ভ্রাতা, সায়ন ও ভোগনাথ। ভগিনীর নাম সিঙ্গলী।

মাধবাচার্য্যের মত সায়নও ছিলেন মহা প্রতিভাধর। উত্তরকালে বেদবেদাঙ্গে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন, বেদভাষ্য রচনার মধ্য দিয়া অর্জ্জন করেন অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সায়নাচার্য্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগনাথ খ্যাতি লাভ করেন সমকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের সুদক্ষ সচিব।

পিতার চতুষ্পাঠীতেই মাধব আর তাঁহার ভ্রাতাদের পড়া শুনা শুরু হয়। মায়ন আচার্য্যের জীবনের প্রধান ব্রত শাস্ত্রচর্চ্চা আর বিদ্যাদান। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে পুত্রদেরও তিনি পরম যত্নে গড়িয়া তোলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র ও কাব্যকলার গ্রন্থ একে একে তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

তিন পুত্রের মধ্যে মাধব আর সায়ন অসামান্য শ্রুতিধর। যত কঠিন, যত জটিলই হোক না কেন, যে কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা একবার কাণে পশিলে আর কখনো তাহারা বিস্মৃত হয়না। পণ্ডিত মহা উৎসাহে পুত্রদের কৃতবিদ্য করিয়া তুলিতে থাকেন।

গৃহচতুষ্পাঠীর পড়া সমাপ্ত হইয়া যায়, পিতা এবার সবাইকে পাঠাইয়া দেন কাঞ্চীনগরে।

শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে সারা দক্ষিণ ভারতে তখন কাঞ্চীর খুব নাম। বিশিষ্ট অধ্যাপক, দার্শনিক ও ধর্ম্মগুরুরা সেখানে অবস্থান করেন।

১ দ্রঃ ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়েরী, ভল্যু ৪৫, ১৯১৬, জানুয়ারী—পৃঃ ১-৬; ১৭-২৪—আর, নরসিংহাচার।

দিক্ দিগন্ত হইতে শিক্ষার্থীরা দলে দলে আসিয়া ভীড় করে। শাস্ত্রের আলোচনা, বিচারদ্বন্দ্ব আর ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠানে আকাশ বাতাস সদাই থাকে সরগরম।

এখানে আসিয়া মাধবের আনন্দের অবধি রহিলনা।

তরুণ বয়সেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। সর্ব্বশাস্ত্র তিনি আয়ত্ত করিবেন হস্তামলকবৎ। অর্জ্জন করিবেন অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব। তারপর সে প্রভাব প্রয়োগ করিবেন দেশের উজ্জীবনে। কাঞ্চীর ছাত্রজীবন এ অভীষ্ট সাধনের সুযোগ আনিয়া দেয় এবং পূর্ণরূপে এই সুযোগ গ্রহণের জন্য তিনি তৎপর হইয়া উঠেন।

কাঞ্চীতে থাকিতেই নবীন শিক্ষার্থী বেঙ্কটনাথের সহিত মাধবের পরিচয় ঘটে। ক্রমে এ পরিচয় পরিণত হয় অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে।

উভয়েই উভয়ের চরিত্র, প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার প্রতি সশ্রদ্ধ, স্নেহ, প্রেমে ভরপুর। একে অপরকে একদিন না দেখিলে অস্থির হইয়া উঠেন। অথচ আদর্শ ও মতবাদের দিক দিয়া তাঁদের কোনই মিল নাই। জীবনদর্শনেও রহিয়াছে বিরাট পার্থক্য।

দুই সখার মধ্যে প্রায়ই চলে নানা রহস্যালাপ ও বাদানুবাদ। শঙ্করের বেদান্তবাদের উপর মাধবের প্রবল অনুরাগ, কিন্তু বেঙ্কটনাথ উহার ঘোর বিরোধী। নিজ জীবনে তিনি অনুসরণ করিতে চান রামানুজের ভক্তি ও শরণাগতির পথ।

বিতর্ক উঠিলেই বেঙ্কটনাথকে মাধব ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকেন। বলেন, "যাই বল ভাই, তোমার ঐ ভক্তি প্রপত্তির স্নিগ্ধ রসে এদেশের পুনরুজ্জীবন কখনো আসবেনা। এজন্য চাই শঙ্করের জ্ঞানধর্ম্ম আর ক্ষাত্রশক্তি—এই দুয়ের মিলন।"

বেঙ্কটনাথ ভক্তিরসের রসিক। স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "তোমার ঐ দুয়ের মিলন সাধনের জন্য চাই কিন্তু ভগবৎ-কৃপা। শরণাগতি না এলে সে কৃপা কি ক'রে মিলবে, ভাই, বলতো?"

"তুমি তোমার কোমলকান্ত ভাবালুতা নিয়ে আনন্দে থাকো। আমি বাধা দিচ্ছিনে। কিন্তু বাস্তবে কি দেখি? পুরাণে ইতিহাসে কি দেখি? ক্ষাত্র শক্তির বিকাশ না হ'লে, আর সেই শক্তির পেছনে জ্ঞানসূর্য্যের প্রেরণা না থাকলে, কবে কোথায় ধর্ম্মের উজ্জীবন দেখা গিয়েছে?"

"ভাই, নিজের ক্ষুদ্র শক্তির ওপর নির্ভর না ক'রে শ্রীবিষ্ণুর শরণ নাও। কেঁদে কেটে প্রার্থনা কর, তবে যদি তোমার প্রার্থিত বস্তু মিলে," বেঙ্কটনাথ মুচকি হাসিয়া বলেন।

দৃঢ়স্বরে মাধব কহেন, "নিষ্ক্রিয়তার পথ আমার নয়। আমি বেছে নিতে চাই কর্ম্মের বন্ধুর পথ। তোমার ভক্তিপথের ঐ আর্ত্তি আর স্তুতিবাদ মানুষকে ক'রে তোলে আরো দৈন্যময়, আরো নির্জ্জীব। চোখ মেলে ছ্যাখো, দেশের আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে আসছে ঝড়ের তাণ্ডব। বিধর্ম্মী হানাদার এগিয়ে আসছে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সমাজকে ধ্বংস করতে। এ আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে হলে, তা ক'রতে হবে এক নূতন ধর্ম্মরাষ্ট্রের দুর্গ থেকে।"

বেঙ্কটনাথ সচকিত হইয়া উঠেন। সবিস্ময়ে তাকান মাধবের দিকে। তরুণ সতীর্থের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে আত্মপ্রত্যয়ের অদ্ভুত উদ্দীপনা। আয়ত নয়ন দুইটিতে ঝলকিয়া উঠিয়াছে স্বপ্নলোকের অপরূপ দ্যুতি।

আলোচনা আর বেশী আগাইতে চায় না।

কিছুক্ষণ বাদে দুই বন্ধুর মধ্যে আবার শুরু হয় সহজ কথাবার্ত্তা, আর লঘু হাস্যপরিহাস।

বেঙ্কটনাথ হাসিয়া বলেন, "মাধব, তোমার পরাক্রম দেখ্‌বার জন্য অবশ্যই আমি অপেক্ষা ক'রে থাকবো। কিন্তু আপাতত ক্ষান্ত হও, ভাই। বেলা পড়ে এসেছে। এবার খেয়ে দেয়ে চতুষ্পাঠীতে যাও।"

"হ্যাঁ ভাই, তুমিও তোমার ভক্তিগ্রন্থের ডোর খুলে ব'সো, আর্ত্তি আর কান্নার পালা শুরু করো।"

"তুমিও ব'সে পড়ো তোমার জৈনগন্ধী বেদান্তীর গ্রন্থ নিয়ে," মুচকি হাসিয়া আচার্য্য শঙ্করের মতবাদকে কটাক্ষ করেন বেঙ্কটনাথ।

অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি নিয়া মাধব জন্মিয়াছেন। এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ক্ষুরধার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতা। এই উদীয়মান শাস্ত্রবিদের দিকে তাই কাঞ্চীর সকল শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুধীসমাজও তাঁহার প্রশংসায় সদাই পঞ্চমুখ।

কাঞ্চীর তখনকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরো দুইটি তরুণের নাম করা যায়, মাধবের মতই সাফল্যের বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়া যাঁহারা আসিয়াছেন। একজন পূর্ব্বোক্ত বেঙ্কটনাথ, মাধবের অন্তরঙ্গ সখা। অপরজন মাধবেরই মধ্যম ভ্রাতা, সায়ন।

বেঙ্কটনাথের প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার প্রকৃত মর্ম্ম মাধবের জানা আছে। এ সম্বন্ধে সদাই তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। মুখে যাহাই বলুন না কেন, মনে মনে তাঁহাকে করেন শ্রদ্ধা। সায়নও মাধবের এক গর্ব্বের বস্তু। বেদশাস্ত্রের অনুশীলনে সায়ন তাঁহার প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন, বেদচর্চ্চাকে দেশে নূতন করিয়া জাগাইয়া তোলার জন্য উৎসাহের তাঁহার অবধি নাই। এই ভ্রাতাটিকে মাধব বড় ভালবাসেন, দিনের পর দিন নব নব প্রেরণায় তাঁহাকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

শিক্ষার্থী জীবন শেষ হইয়া যায়। মাধব সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া উঠেন, বিশেষ করিয়া শাঙ্কর মতে বেদান্ত অধ্যয়ন শেষ করিয়া অর্জ্জন করেন বিপুল প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর নবীন পণ্ডিত একদিন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। শুরু হয় কুলগত আচার্য্যের বৃত্তি।

পুত্র কৃতী হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, পিতা মাতার তাই

আনন্দের সীমা নাই। অল্পদিনের মধ্যে তোড়জোড় করিয়া তাহারা মাধবের বিবাহ দিলেন।

শাস্ত্রচর্চ্চা, টীকাভাষ্য রচনা আর অধ্যাপনা, ইহাই হয় এখন হইতে মাধবাচার্য্যের প্রধান কর্ম্ম। কিন্তু এই দরিদ্র, নগণ্য গ্রামে বসিয়া জীবিকা অর্জ্জন সম্ভব হয় কই ?

বিষয় আশয় এমনিতেই বিশেষ কিছু নাই। তদুপরি পিতা পুত্র সবাই সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। ফলে অর্থের অনটন সব সময়ে লাগিয়াই থাকে।

নবীন আচার্য্য কিন্তু নিজ জীবনের লক্ষ্যটি একদিনের তরে বিস্মৃত হন নাই। সংসার সংগ্রামে বার বার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও বড় আশায় তিনি বুক বাঁধিয়া রহিয়াছেন। ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়াছে তাঁহার প্রস্তুতির পর্ব্ব। শাস্ত্রীয় গবেষণা আর গ্রন্থরচনার কাজে তিনি নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

অপূর্ব্ব প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাঁহার এক একটি গ্রন্থ। এই সব গ্রন্থের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের সর্ব্ব অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

কিন্তু এসব কোন খ্যাতিই আচার্য্যের মনে দাগ কাটেনা। দিন দিন তিনি আকুল হইয়া উঠেন জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য! মনের এই আকুলতা নিয়াই সেদিন হাম্পির মন্দিরে ধর্ণা দেন, দেবীর কাছে জানান তাঁহার প্রার্থনা।

চরম দুর্ভাগ্য, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানের কথা বলিয়া জগন্মাতা বিমুখ হইলেন।

দেবীর কণ্ঠস্বর এখনো মাধবাচার্য্যের কাণে বাজিতেছে। প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন নাই, সকল আশা ভরসা হইয়াছে চূর্ণ। তবে এই 'বন্ধ্যা' জীবন আর বহন করিয়া কি লাভ ? আজ এইখানেই সব শেষ হইয়া যাক্ !

বিদ্যারণ্য স্বামী

খরস্রোতা তুঙ্গভদ্রা সম্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে এক একবার ইচ্ছা হয়, এই নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া সকল জ্বালার অবসান ঘটানো যাক্—এ ব্যর্থ, অভিশপ্ত জীবন হোক্ নিশ্চিহ্ন।

সঙ্গে সঙ্গেই জাগে বিবেকের দংশন। মনে পড়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের সতর্কবাণী—আত্মহত্যা যে মহাপাপ!

দেহ বিসর্জ্জন দেওয়া আর হইয়া উঠিল না। এবার তবে মাধবাচার্য্য কি করিবেন? সংসার জীবনে আবার ফিরিয়া যাইতে মন চাহে না। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রমতে অনেক আগেই গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করা তাঁহার উচিত ছিল। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের আশা? তাহাও স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছে। এবার বরং খুঁজিতে বাহির হইবেন নিজেরই মুক্তির পথ। অবিলম্বে নিবেন তিনি সন্ন্যাস।

আত্মপরিজনের মায়া কাটাইয়া, আচার্য্য জীবনের যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল তাহার উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া, মাধবাচার্য্য উপস্থিত হইলেন শৃঙ্গেরী মঠে।

শঙ্করের যুগ হইতে, শত শত বৎসর ধরিয়া জ্ঞানসাধনার ধারা এখানে রহিয়াছে বহমান। প্রবীণ সন্ন্যাসী বিদ্যাশঙ্করতীর্থ তখন এই মঠের অধ্যক্ষ—জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য। ভারতের দিক্ দিগন্ত হইতে জ্ঞানপন্থী সাধকেরা দলে দলে এখানে আসিয়া সমবেত হয়, তাঁহার চরণতলে আশ্রয় নেয়।

এই মহা বৈদান্তিকের কাছেই দীক্ষা ও সাধন গ্রহণের জন্য মাধব ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। আশ্রয় অচিরে মিলিয়া গেল। দীক্ষার পর গুরু নামকরণ করিলেন বিদ্যারণ্য স্বামী।

মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী, আচার্য্য শঙ্করানন্দের কৃপা পাইতেও দেরী হয় নাই। সানন্দে বিদ্যারণ্যের শিক্ষাগুরুরূপে এই মহাপুরুষ সেদিন আগাইয়া আসিলেন।

ধর্ম্ম ও দর্শনগ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে মাধবাচার্য ইতিমধ্যেই খ্যাত হইয়াছেন, তাই শৃঙ্গেরীর সন্ন্যাসীরা পরম উৎসাহের সহিতই তাঁহাকে

গ্রহণ করিলেন। প্রতিভাধর সাধকের আগমনে মঠের বিদ্যাচর্চ্চা ও সাধনায় সঞ্চারিত হইল নূতন প্রাণের জোয়ার।

আপন সাধনা ও শাস্ত্ররচনার কাজে মাধব দিনরাত নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু এখনো মনের গোপন পুরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বড় সাধের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা।

যে আশার বাতি তরুণ হৃদয়ে একদিন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল আজো তাহা একেবারে নিভিয়া যায় নাই।

শৃঙ্গেরীতে প্রায়ই ধর্ম্মসভার অধিবেশন বসে। জ্ঞানবাদী বড় বড় মহারথীরা সেখানে আসিয়া সমবেত হন। অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যায়, ভাষণে সারা মঠ মুখর হইয়া উঠে। বিদ্যারণ্যের মনে এক একদিন জাগে তীব্র আলোড়ন। বেদান্তের এই তত্ত্বভাবনায়, সূক্ষ্মতর এই সব বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া সত্যই কি দেশ জাগিতেছে? মঠবাসী সন্ন্যাসীদের জীবনের ব্রত—আত্মজ্ঞান লাভ, আর অদ্বৈত-বেদান্তের প্রচার। কিন্তু এ ব্রত কি সফল হইতেছে? তাছাড়া, এ পরম তত্ত্ব ও আদর্শ কি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে?

বেদান্তের জয়পতাকা তাঁহারা উড্ডীন করিতে চান। কিন্তু কই সে দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার, যেখানে উহা প্রোথিত করিবেন? এই কর্ম্মের পশ্চাতে কোথায় রহিয়াছে জনসমর্থন? কোথায় রাষ্ট্রশক্তি? আত্ম-জ্ঞানের যে পরম সাধনায় তাঁহারা ব্রতী, কিভাবে সারা দেশকে তাহা উদ্বুদ্ধ করিবে?

অব্যক্ত ব্যথা স্বামী বিদ্যারণ্যের হৃদয়ে গুমরিয়া ওঠে। বারবার মনে পড়ে খিলজী আর তুঘলক বাহিনীর আক্রমণের কথা। যেখানেই তাহারা গিয়াছে, নির্ব্বিচারে চালাইয়াছে হত্যা, লুণ্ঠন আর অগ্নিদাহ। মঠ মন্দির হইয়াছে বিধ্বস্ত। বিগ্রহ অপবিত্র করিয়া, বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া চালাইয়াছে ত্রাসের রাজত্ব। সনাতন ধর্ম্ম আর সংস্কৃতি আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এক বিরাট বিপর্য্যয়ের মুখে।

এ সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায় ? স্বামী বিদ্যারণ্য ভাবিয়া কোন কূল কিনারা পান না।

১৩৩৪ খৃষ্টাব্দের এক প্রভাত। কৃত্যাদি সারিয়া বিদ্যারণ্য সবে মঠের সভাকক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন। প্রবীণ সন্ন্যাসীদের অনেকেই সেখানে উপস্থিত। বেদান্তের নানা জটিল প্রশ্ন নিয়া জোর বিতর্ক শুরু হইয়াছে। হঠাৎ সেখানে পৌঁছে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ। বিজয়-নগরের রাজা জম্বুকেশ্বর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন !

দুঃসংবাদের শেষ এখানেই নয়। রাজার কোন পুত্র সন্তান নাই; ফলে রাজ্যে এবার মাৎস্যন্যায় অবশ্যম্ভাবী।

এ অরাজকতা ও অন্তর্বিপ্লবের ফল অনুমান করা কঠিন নয়। এবার দিল্লীর সুলতান বাহিনীর আঘাতের সম্মুখে এ রাজ্য শুষ্কপত্রের মত ঝরিয়া পড়িবে।

মঠের সন্ন্যাসীরা সবাই বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন।

আর স্বামী বিদ্যারণ্য ? তাঁহার কাছে এ সংবাদ যে বজ্রাঘাত তুল্য ! লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর জীবনে আসিবে চরম বিপর্য্যয়, তাঁহার জন্মভূমি এবার পড়িবে বিধর্ম্মীর কবলে। মাদুরা ও শ্রীরঙ্গমের মত এখানেও অবাধে চলিতে থাকিবে বীভৎস অত্যাচার। এ চিন্তা যে তাঁহার পক্ষে দুঃসহ !

নয়ন তাঁহার বার বার অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

এই পরিস্থিতিতে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিতে সেদিন তাঁহার দেরী হয় নাই। পরদিনই গুরু বিদ্যাতীর্থের সম্মুখে গিয়া তিনি উপস্থিত হন, যুক্তকরে নিবেদন করেন, "আচার্য্যদেব, কিছুদিনের জন্য মঠ থেকে আমি বিদায় নিতে চাই।"

"কোথায় যেতে চাও, বৎস ?"

স্থির করেছি, একবার বিজয়নগরের দিকটা ঘুরে আসবো। আমার স্বদেশ আজ অরাজক, মহা বিপন্ন। এ সময়ে তার রক্ষার

চেষ্টা না ক'রলে সর্ব্বনাশ হবে। জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ সবই যাবে রসাতলে।"

বিদ্যাতীর্থ চমকিয়া উঠেন। "সে কি বিদ্যারণ্য! তুমি হচ্ছো সহায়-সম্পদহীন সন্ন্যাসী। এই ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লবে তুমি কি ক'রবে? কার কোন সাহায্যে আসবে?"

"তা জানিনে, প্রভু। তবে এটুকু জানি, চরম দুঃসময়ে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর পাশেই রয়েছে আমার স্থান। আমি কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী, ঠিক কথা। কিন্তু প্রভু, দৈব অনুকূল হ'লে কি না সম্ভব হ'তে পারে? নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ দধীচির অস্থি থেকেই তো একদিন নিৰ্ম্মিত হয়েছিলো দানবসংহারী বজ্র।"

"বৎস সবাই দধীচি নয়। স্থির হ'য়ে আরো একটু ভেবে ছাখো। যা তুমি চাচ্ছো, আসলে তার জন্য চাই ক্ষাত্রশক্তি। সত্ত্বগুণাশ্রয়ী সাধককে দিয়ে তো একাজ হয় না।"

"আচার্য্যবর, অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। পুরাণে কিন্তু দেখি, সত্ত্বগুণাশ্রয়ী সাধকেরাই যুগে যুগে করেছেন ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন। বিশ্বামিত্র রামকে জুগিয়েছেন সংহারমন্ত্র, গুরু দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে শিখিয়েছেন অস্ত্রচালনা। ক্ষত্রিয় কখনো ক্ষত্রিয়কে মন্ত্রঃপূত অস্ত্র দেননি—দিয়েছেন বরং সত্ত্বগুণাশ্রয়ী দেবতা আর ব্রাহ্মণেরা।"

"ঠিকই বলেছো। কিন্তু এ যে কলিযুগ। আচ্ছা বৎস, তুমি দেশে গিয়ে কি ক'রতে চাও, খুলে বল তো।"

"প্রভু, পারি বা না পারি, একবার শেষ চেষ্টা আমি ক'রে দেখবো। মন্ত্রসিদ্ধির ভেতর দিয়ে জাগাবো নূতন ক্ষাত্রতেজ। শক্তিমান এক ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলবো আমি।"

স্বামী বিদ্যাতীর্থের আনন গম্ভীর হইয়া উঠে। ধীর স্বরে কহেন, "বিদ্যারণ্য, ভুলে যেয়ো না—পরমহংস-সন্ন্যাস তুমি গ্রহণ করেছো। ইহলোকেই লাভ করবে তত্ত্বজ্ঞান আর মোক্ষ, এই হচ্ছে তোমার ব্রত। তাছাড়া, বৎস বিরজা হোম ক'রে তুমি যে পূর্ব্বাশ্রমকে, আর

তোমার সর্ব্ব সংস্কারকে আহুতি দিয়ে ফেলেছো। তবে আত্মোপলব্ধির পথ ছেড়ে, কেন মিছিমিছি মায়ার বন্ধনে নিজেকে জড়াবে ?"

"আচার্য্যবর, সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে, বাসনা আমার আজো নির্ম্মূল হয়নি। বেদ-ধর্ম্ম আর স্বদেশের সেবা ক'রবো, এ বাসনা আজো প্রচ্ছন্ন- রয়েছে আমার হৃদয়ে। তা' ক্ষয় না ক'রে যে মুক্তির পথে আমি আর এগুতে পারছিনে। বহুতর সংস্কার আজো ভেতরে রয়েছে অনড় হয়ে। আমায় অনুমতি দিন, বিজয়নগরে ফিরে যাই। কর্ম্মব্রতের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত বাসনা আর সংস্কার ক্ষয় ক'রে ফেলি।"

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বিদ্যাতীর্থ কি যেন ভাবিয়া নিলেন। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "বিদ্যারণ্য, তোমার সঙ্কল্পে আমি বাধা দেবোনা। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনাবশে তুমি একাজে যেন ঝাঁপ দিয়োনা। বেশ তো, বিজয়নগরের অবস্থা তুমি এখানে থেকেই কিছুদিন পর্য্যবেক্ষণ কর। তারপর ধীরে সুস্থে, বিচার বিবেচনা ক'রে স্থির কর তোমার কর্ত্তব্য।"

গুরুদেবের কথা বিদ্যারণ্য মানিয়া নেন। আপাততঃ শৃঙ্গেরীতেই রহিয়া যান বটে কিন্তু সারা মন তাঁহার পড়িয়া থাকে মাতৃভূমির বিপন্ন নরনারীর পাশে।

ক্রমে দুই বৎসর অতীত হয়, কিন্তু বিজয়নগরের রাজনৈতিক অবস্থার কোন রকম উন্নতি দেখা যায় না। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার ফলে লোকের দুর্দ্দশা পৌঁছে চরমে।

এ সময়ে একদিন মঠের সন্ন্যাসীদের শোকসাগরে ভাসাইয়া জগদ্‌গুরু বিদ্যাতীর্থ মহারাজ চির-সমাধিতে মগ্ন হন।

এবার বিদ্যারণ্যকে আর ঠেকানো যায় নাই। গুরুর সমাধিবেদীতে প্রণাম নিবেদন করিয়া ধীর পদে সেদিন শৃঙ্গেরী হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান।

লক্ষ্য আগে হইতে স্থির করাই আছে। সরাসরি আসিয়া উপস্থিত হন দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে।

জগজ্জননী একবার তাঁহাকে বিমুখ করিয়াছেন। কিন্তু এই চরম সঙ্কটে লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত মানুষ যে আজ সকাতরে তাঁহাকে ডাকিতেছে! সঙ্কটহারিণী কি তাহাতে কাণ দিবেন না? তবে কি পাষাণী তিনি?

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বিদ্যারণ্যের এবার শেষ প্রয়াস।

দেশ ও ধর্ম্মের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারে তো তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। এমন কি নিজের মোক্ষসাধনা ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন। করিয়াছেন জীবন পণ। তবুও কি জগন্মাতার কৃপা হইবে না?

দুর্ব্বার সঙ্কল্প নিয়া সন্ন্যাসী ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হন। প্রগাঢ় ধ্যানে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। বাহ্যজ্ঞান হয় বিলুপ্ত।

সেদিন রাত্রির শেষ যামে জগন্মাতা দর্শন দিলেন।

দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে বসিয়া কল্যাণময়ী দেবী ভুবনভোলানো হাসি হাসিতেছেন। নয়নে প্রসন্নতার দীপ্তি, হস্তে বরাভয়।

সস্নেহে কহিলেন, "বৎস, তোমার আহ্বানে আমি এসেছি। সানন্দে এবার বর দিচ্ছি, ধনরত্ন আমার কাছে যা তুমি চেয়েছিলে তা প্রচুর পাবে। হ্যাঁ, আরো শোন। অচিরে এখানে অভ্যুদয় ঘটবে নূতন রাজশক্তির, আর তা পরিচালিত হবে তোমারই ইঙ্গিতে।"

আনন্দে বিদ্যারণ্য স্বামী উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিয়া শুরু করিলেন স্তবগান।

স্তবস্তুতি শেষ করিয়া সাশ্রুনয়নে, অভিমানভরা কণ্ঠে কহিলেন, "মা গো, প্রার্থিত বর আমায় যদি দিলেই, তবে এতদিন কেন কৃপা করনি? কেন বিমুখ হয়েছিলে সন্তানের ওপর? জীবনের এতোগুলো বৎসর আমার গিয়েছে বৃথায়। কৃপাময়ী, দেখো, তোমার কৃপা থেকে আর যেন বঞ্চিত না হই।

"বৎস, তোমার ওপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। আবার আসবার প্রয়োজনও ছিলো। তাই তো আজ এসে পড়লাম।"

আব্দারের সুরে বিদ্যারণ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু জননী, একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও। আগের বার যখন তোমার দুয়ারে এসে ধর্না দিই, তুমি বলেছিলে—নিয়তির বিধানে এজন্মে আমার ভাগ্যে ধনপ্রাপ্তি নেই। তখন সোজাসুজি করেছিলে আমায় প্রত্যাখ্যান। কিন্তু এবার কেন এতো প্রসন্ন হ'লে? কেনই বা দিলে এই বর? কেমন ক'রে এ সম্ভব হ'লো?"

"শুনে তোমার লাভ?"

"বড় কৌতূহল হয়েছে মা। তোমার অবোধ ছেলেকে এ কথাটা একটু বুঝিয়ে বল।"

"শোন বৎস, তখন তুমি ছিলে মাধবাচার্য্য, গার্হস্থ্যাশ্রমী পণ্ডিত। এবার এসেছো সন্ন্যাসী হয়ে। তোমার যে পুনর্জ্জন্ম হয়েছে। নিয়তির বিধানও তাই গেছে পাল্‌টে। মাধবাচার্য্য-জীবনে যা তুমি পাওনি, সর্ব্বত্যাগী বিদ্যারণ্য-স্বামী হ'য়ে তা আজ লাভ করলে। যাও, এবার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন ক'রে ব্রত সাধনে তৎপর হও।"

বিদ্যারণ্যের দুই চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠে। ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠের উচ্চ মা—মা রব বারবার প্রতিধ্বনিত হয় মন্দির কক্ষে।

দেবী সহসা কখন অন্তর্হিতা হইয়া যান।

দিব্য আনন্দের অনুভূতিতে বিদ্যারণ্যের দেহ তখনো টলমল করিতেছে। অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে অপার তৃপ্তিতে। জগজ্জননীর দর্শন ও কৃপা দুই-ই মিলিয়াছে। তিনি আজ ধন্য। আর তাঁহার কোন খেদ নাই, কোন দুশ্চিন্তাও নাই।

এবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ভাবিলেন, তার আগে, অদূরস্থিত পর্ব্বত গুহায় নির্জ্জনে কয়েকদিন কাটাইয়া গেলে মন্দ কি? ব্রত উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা সেখানে বসিয়া রচনা করিবেন। স্থির করিবেন ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা।

গুহার দ্বারে বসিয়া বিদ্যারণ্য সেদিন নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছেন,

হঠাৎ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান সুন্দর-সুঠাম দেহ এক তেজস্বী তরুণ। কটিতে অসি, হস্তে বর্ষা ও শরাসন। পরিধানে যোদ্ধবেশ।

তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া ভক্তিভরে তিনি বিদ্যারণ্যকে প্রণাম নিবেদন করেন।

"জয়স্তু, বৎস"—হাত তুলিয়া আচার্য্য আশীর্ব্বাদ জানান। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন তাঁহার দিকে। কি অদ্ভুত আকর্ষণ এই তরুণের! সারা দেহে পৌরুষের দৃপ্ত তেজ। বুদ্ধির দীপ্তিতে নয়ন দু'টি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। প্রশস্ত ললাটে সৌভাগ্যের চিহ্ন অঙ্কিত। সহস্র মানুষের ভীড়েও তাঁহাকে ভুল করার উপায় নাই।

আগন্তুক জোড়হস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে বিদ্যারণ্য প্রশ্ন করিলেন, "কোথা থেকে আস্‌ছো? এই বিজন পার্ব্বত্য অঞ্চলে কি করতেই বা আসা?"

"প্রভু, এ অধীনের নাম হরিহর রায়। পূর্ব্বেকার নিবাস ছিল ওয়ারেঙ্গেলে। সেখানকার রাজ-অমাত্য ব'লেই লোকে আমায় জানতো। সে রাজ্যের পতন হবার পর আশ্রয় নিয়েছিলাম কম্পিলি রাজ্যে। সেখানকার রাজবংশের সঙ্গে কুটুম্বিতা ছিল। কিন্তু সে আশ্রয়টুকুও ভগবান কেড়ে নিলেন। তুঘলক সুলতান কম্পিলি অধিকার করার পর সপরিবারে আমি বন্দী হলাম।"

"বড় দুঃখের কথা। তারপর, বৎস?"

"দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়, প্রভু। সুলতান আমাদের দক্ষতা ও গুণপনার কথা শুনে নিজের কার্য্য সাধনে নিয়োজিত করলেন। আদেশ হ'লো, তাঁর রাজ্য বিস্তারে আর এখানকার বিদ্রোহ দমনে আমাদের সাহায্য ক'রতে হবে।"

"তোমরা কি ক'রলে?"

"কূটনীতি অনুসরণ ক'রলাম। রাজী হ'য়ে গেলাম এ প্রস্তাবে। কিন্তু মনে রইলো দৃঢ় সংকল্প, দিল্লীর সেনাবাহিনীর সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নেব, তারপর সুলতানের সংস্রব ত্যাগ ক'রবো জীর্ণ বস্ত্রের মত।

দুর্ভাগ্যবশে তা আর হ'য়ে উঠলো না। হয়শাল অধিপতির কাছে আমরা পরাজিত হয়েছি। তাছাড়া, বিধর্ম্মী সংসর্গের জন্য চারদিকে নিন্দা রটে গেছে। দেশের কেউ আমাদের সমর্থন ক'রতে চাইছে না। চরম নৈরাশ্য এসেছে জীবনে। ভাবছি, এবার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আর কোথাও চলে যাবো।"

"না বৎস, ভয় নেই। তোমার ললাটে যে আমি রাজটীকা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আমার মন বল্‌ছে, বিরাট ঐশী কাজ সাধিত হবে তোমায় দিয়ে। তাই তো ঈশ্বর তোমায় এতো অভিজ্ঞতা আর দুঃখ দহনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আর একদিন এসো হরিহর, তোমায় আমার কিছু বল্‌বার আছে।"

হরিহর বিদায় নিতে যাইবেন, এমন সময় বিদ্যারণ্য কৌতূহল ভরে কহিলেন, "আচ্ছা বৎস, বল তো, এই জনমানবহীন জায়গায় আজ হঠাৎ তুমি কেন এসেছিলে?"

"মন ভাল ছিল না। তাই আমার সকল কাজের সঙ্গী ছোট ভাই বুক্ককে নিয়ে এখানে এসেছিলাম শিকার করতে।"

সস্নেহে বিদ্যারণ্য কহিলেন, "তা বৎস, তোমার ভ্রাতাকে নিয়ে এলে না কেন? কোথায় সে?"

"এ পাহাড়ের নীচেই অপেক্ষা ক'রছে। ঘোড়া আর কুকুরগুলো তার কাছে রেখে আমি আপনাকে দর্শন ক'রতে এলাম। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, প্রভু। এখানকার বনের ভেতর ঢুকে আমাদের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো আজ।"

"কি, বলতো শুনি।"

"এতকাল জানতাম, শশক নিতান্ত নিরীহ, ভীরু জীব। এখানে এসে দেখলাম, তারা ভয়ঙ্কর হিংস্র। আমাদের যে সব কুকুর বাঘের সাথে লড়াই করে, তাদের ওপর ঐ শশকেরা সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দংশনে ক্ষত বিক্ষত ক'রে নিমেষে কোথায় ছুটে পালালো। এমনতর কাণ্ড কখনো দেখিনি, শুনিওনি!"

"এ যে সত্যই বড় বিস্ময়কর! চল বৎস, ঐ জায়গাটি আমায় এখনি দেখাবে, চল।" ঔৎসুক্যভরে বিদ্যারণ্য স্বামী তখনি পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন।

হরিহর ও বুক্ক স্থানটি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। চোখে মুখে ঝলকিয়া উঠিল দিব্য উদ্দীপনা।

দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বৎস হরিহর, বুক্ক! তোমরা ধন্য। আমি নিজেও ধন্য। আজ সত্যই এক অপূর্ব্ব দৈবী যোগাযোগ এখানে ঘটে উঠেছে। আর তা ঘটেছে দেবী ভুবনেশ্বরীরই কৃপায়! সব কথা তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না। আমি নিজে এখানে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছি—এ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এক বিশাল ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি। তা-ই জগন্মাতার অভিপ্রেত। বৎস হরিহর, আমার মন বলছে, তুমিই বহন ক'রবে সে দায়িত্ব।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে হরিহর ও বুক্ক অমিততেজ সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া আছেন। কিছুই যে তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সহায় সম্পদহীন হরিহর প্রতিষ্ঠা করিবেন ধর্ম্মরাজ্য? এ যে অসম্ভব কথা! ভাবের ঘোরে সন্ন্যাসী কি প্রলাপ বকিতেছেন? তাঁহাদের মুখে কথা যোগাইতেছে না।

আবার শোনা গেল বিদ্যারণ্যের গম্ভীর কণ্ঠ, "শোন হরিহর, শোন বুক্ক। কথাটা তোমাদের খুলে বলছি। আমার নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। পূর্ব্বাশ্রমে আমি ছিলাম মাধবাচার্য্য নামে পরিচিত। এখন শৃঙ্গেরী মঠের সন্ন্যাসী—বিদ্যারণ্য স্বামী। আজীবন ধ্যানকল্পনায় দেখে এসেছি ধর্ম্মধৃত মহান ভারতের রূপ। ব্রত নিয়েছি আমার স্বদেশভূমি বিজয়নগরকে কেন্দ্র ক'রে ধর্ম্মরাজ্য গঠনের জন্য। এই ব্রত সাধনে দেবী ভুবনেশ্বরীর আজ্ঞাও মিলে গিয়েছে। কৃপা ক'রে দর্শন দিয়ে দেবী বলেছেন—রাজ্য সংস্থাপনের জন্য যা কিছু অর্থ, যা কিছু আনুকূল্য প্রয়োজন, তা অচিরে মিল্‌বে। তারপরই ঘট্‌লো এখানে তোমাদের আগমন।"

দুই ভ্রাতার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত সন্ন্যাসীর দিকে তাঁহারা চাহিয়া আছেন।

হরিহর জোড়হস্তে কহিলেন, "প্রভু, আমরা ভাগ্যবান, তাই চরণ দর্শনের সুযোগ পেলাম। এবার আদেশ করুন, ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আপনার বৃহৎ যজ্ঞের কোন্ কাজে নিজেদের লাগাবো।"

"তোমরা অনেক কিছু পারো এবং অনেক কিছু তোমাদের করতে হবেও, হরিহর। শুধু প্রমোদের জন্য, শিকারের জন্য, আজ তোমরা এখানে আসোনি। এসেছো লীলাময়ী দেবী, ভুবনেশ্বরীর ইচ্ছায়। হরিহর, এবার তোমার ক্ষাত্রশক্তি নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমার ঐশী কাজের প্রধান সহায় হও তুমি। ঐ যে স্থানটি আমায় এখনি দেখালে, তারও গুরুত্ব আছে আমার এ ব্রতের উদ্‌যাপনে। তুমি কি মনে কর, ভীরু সদাসশঙ্ক শশক যে ভূমিতে দাঁড়ানো মাত্র তার স্বভাব ভুলে যায়, অমিত তেজবীর্য্যসম্পন্ন হয়, তার একটা নিগূঢ় তাৎপর্য্য নেই? ঐ ভূমি যে মহা পুণ্যময় পীঠ! ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই-ই নিহিত রয়েছে ওর গর্ভে। এ ভূমিকে কেন্দ্র ক'রেই তুমি স্থাপন কর তোমার দুর্গ। প্রতিষ্ঠা কর নূতন রাজ্য। অপরাজেয় হবে তুমি, আর তোমার দুর্জ্জয় রাজশক্তির মাধ্যমে আমি রূপায়িত করবো আমার ধর্ম্মরাজ্যের ধ্যানকল্পনা।"

প্রত্যেকটি কথা যেন দিব্যশক্তিতে স্পন্দিত। হরিহর ও বুক্ক মন্ত্রমুগ্ধের মত সন্ন্যাসীর তেজোগর্ভ বাক্য শুনিতেছেন, আর নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন আত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তাঁহার আননের দিকে।

শ্রদ্ধাভরে উভয়ে বিদ্যারণ্যের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। কহিলেন, "প্রভু, আমরা আপনার কিঙ্কর। যেভাবে চালিত করবেন, সেভাবেই আমরা চলবো। আজ থেকে আপনার আদেশ পালন করাই হবে জীবনের ব্রত।"

দুই ভ্রাতাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বিদ্যারণ্য গুহায় ফিরিয়া আসিলেন। আজ তাঁহার আনন্দ আর ধরেনা। জগন্মাতার

উদ্দেশে বারবার প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মাগো, আমি বুঝতে পাচ্ছি, তোমার প্রসাদে অভীষ্ট আমার সিদ্ধ হ'তে চলেছে। দয়াময়ী! শেষ অবধি সন্তানের প্রতি তোমার করুণা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।"

পরদিন হরিহর ও বুক্ক আবার আসিয়া উপস্থিত। এবার তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিতে হইবে। শুরু করিতে হইবে সংগঠন ও দুর্গ নির্ম্মাণের কাজ।

বিপুল অর্থের প্রয়োজন এ সময়ে। কিন্তু কে তাহা যোগাইবে? বিদ্যারণ্য স্বামী নিজে কাঙাল সন্ন্যাসী। হরিহর রায়েরও ধন-সম্পদ বলিতে তেমন কিছু নাই। ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হইবে, সেই আশায় দিন গুণিয়া চলিয়াছেন।

বুক্ক রায় যুদ্ধকুশলী, সাহসী ও করিৎকর্ম্মা যুবা। তাড়াতাড়ি একটা কিছু গড়িয়া তোলার জন্য মহা ব্যগ্র। আলোচনার শেষে হতাশভাবে কহিলেন, "প্রভু, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বিপুল অর্থ ছাড়া তো এ কাজ সম্পন্ন হবেনা। তার কোন ব্যবস্থা না হলে সবই যে হবে ব্যর্থ। আপনি আগে সে বিষয়ে নির্দ্দেশ দিন।"

"শোন বৎস, দেবীর বরে আমার এ কাজে অর্থাভাব কোনদিনই হবে না। আমার মন আজ বারবার কেবলি ছুটে যাচ্ছে কাল্‌কের সেই চিহ্নিত স্থানটিতে, যেখানে দুর্গের ভিৎ গড়বার কথা ঠিক হয়েছে। তোমরা খনন শুরু ক'রে দাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মায়ের কৃপায় প্রয়োজনীয় অর্থ ওখান থেকেই উঠ্‌বে।"

জনশ্রুতি আছে, এই খনন কার্য্যের ফলে অচিরে বাহির হইতে থাকে বিপুল ধনরাশি। অজস্র স্বর্ণপিণ্ড আর রত্নসম্ভার শত শত বৎসর ধরিয়া এখানকার মৃত্তিকা গর্ভে লুক্কায়িত ছিল। এবার তাহা নিয়োজিত হয় মহাসন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের আরব্ধ কর্ম্মে।

দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়া গেল। হাম্পি-হস্তিনাবতীর অরণ্যময় জনহীন অঞ্চলে জাগিয়া উঠিল নূতন প্রাণস্পন্দন।

বিদ্যারণ্য সেদিন হরিহর রায়কে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, এবার শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ক'রতে হবে, তোমার অভিষেক সম্পন্ন ক'রতে হবে। কিন্তু তার আগে হওয়া চাই তোমার গুরুকরণ। তোমায় দীক্ষা নিতে হবে। নইলে রাজ্যের শাসন তো সত্ত্বগুণাশ্রয়ী হ'তে পারবে না।"

"বেশ তো প্রভু, কবে আপনি এ অধমকে কৃপা ক'রবেন, বলুন।"

"না বৎস, অমি তোমায় দীক্ষা দেবনা। আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু, মহাবৈদান্তিক বিদ্যাশঙ্করতীর্থ বিরাজ ক'রছেন শৃঙ্গেরী মঠে। তাঁর কাছ থেকে তুমি ও বুক্ক শৈব দীক্ষা নাও। তাঁর শক্তি-সঞ্চারণ আর শুভেচ্ছা করুক তোমাদের জয়যুক্ত।"

হরিহর রায় নিঃশব্দে নত মস্তকে বসিয়া আছেন, কোন মতামত প্রকাশ করিতেছেন না। বিদ্যারণ্য বুঝিলেন, এ প্রস্তাব তাঁহার মনঃপুত হয় নাই, বিদ্যারণ্যের কাছেই হরিহর দীক্ষা চান।

এবার সন্ন্যাসী যে কথা কয়টি বলিলেন, তাহাতে ফুটিয়া উঠিল অসামান্য দূরদৃষ্টি ও রাজনীতি জ্ঞান। বলিলেন, "শোন হরিহর, খিলজি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার ক'রে, তাঁর সহযোগিতা ক'রে, এখানকার জনসাধারণের আস্থা তোমরা হারিয়েছ। সে আস্থাকে ফিরিয়ে আনতে হলে শৃঙ্গেরী মঠের আশীর্ব্বাদ তোমাদের চাই। চাই সেখানকার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আর সমর্থন। সারা দক্ষিণ ভারতে এ মঠের প্রভাব অপ্রতিহত। তাই মঠগুরুর কাছেই তোমরা দীক্ষা নাও, তাহলে সর্ব্বজনের সমর্থন প্রাপ্ত হবে অতি সহজে। ভেবোনা বৎস, আমার স্নেহদৃষ্টি চিরদিনই থাকবে তোমাদের ঘিরে। আমিই থাক্‌বো এ রাজ্যের সর্ব্বনিয়ন্তা হ'য়ে।"

এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী হরিহর রায় বিদ্যাতীর্থকেই গুরুরূপে বরণ করেন। তাঁহার জীবন ও কর্ম্মে শৃঙ্গেরীর মঠাধীশের, জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের, আশীর্ব্বাদের সাথে মিলিত হয় বিদ্যারণ্য স্বামীর প্রেরণা আর বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি।

রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হরিহর রাজধানীর নব নামকর
করেন—বিদ্যানগর। তাঁহার ইচ্ছা, রাজ্যের স্থাপয়িতা বিদ্যারণ্য স্বামী
নামটি এভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকুক।

এই নামকরণে বিদ্যারণ্য কিন্তু আপত্তি জানান। হরিহর উত্তে
বলেন, "প্রভু, আমাদের মিনতি, আপনি এ প্রস্তাবের বিরোধিত
ক'রবেন না। আপনার ঋদ্ধি সিদ্ধির বলে এ নগরের পত্তন হয়েছে
আপনিই অধিষ্ঠিত এর ভাগ্যনিয়ন্তারূপে। তাই আমাদের ইচ্ছা
জনমনে আপনার স্মৃতি চির জাগরূক হয়ে থাক্। তাছাড়া, আমা
নিজের দিক থেকেও এর প্রয়োজন আছে। বিদ্যানগর নাম আমা
সদাই স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এ রাজ্যর পেছনে জাগ্রত রয়েছে এ
ঋষিপ্রতিম মহাসাধকের সদাজাগ্রত দৃষ্টি, আর এ রাজ্য বিধৃত রয়েছে
সত্ত্বগুণাশ্রয়ী শক্তি দ্বারা।"

রাজা হরিহর রায়ের এই যুক্তির সাথে মিলিত হইল সকলে
আন্তরিক ইচ্ছা। তাই বিদ্যারণ্য স্বামীর পক্ষে আর এই নামকরণে
বিরোধিতা করার উপায় রহিল না।

পরবর্ত্তীকালে বিদ্যারণ্যের স্থাপিত এই দুর্গনগর—বিদ্যানগর ব
বিজয়নগর—এই দুই নামেই অভিহিত হইতে থাকে।

বিদ্যারণ্যের সহিত হরিহর ও বুক্কের এই নাটকীয় সাক্ষাৎ ও
পরিচয়ের প্রামাণ্য তথ্য বেশী পাওয়া যায় না। প্রধানতঃ সমকালী
সাহিত্য ও জনশ্রুতি হইতেই প্রচলিত কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

ডক্টর এন, বেঙ্কটরামানাইয়া এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন, "বিদ্যারণ্য
কথাজ্ঞান ও বিদ্যারণ্য-বৃত্তান্তের বর্ণনার সারাংশ এইভাবে দেওয়া
যায়ঃ 'হরিহর এবং বুক্ক প্রথমে কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে
রাজকীয় কোষাগারের অধিকর্ত্তারূপে কাজ করিতেন। সুলতানে
সেনাবাহিনী তাঁহাদের মনিবকে পরাস্ত করে এবং বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে
দিল্লীতে নিয়া যায়। এই সঙ্কট কালে হরিহর ও বুক্ক রায় ওয়ারেঙ্গল
হইতে পলায়ন করেন। তারপর কম্পিলিতে আসিয়া সেখানকার বীর

রাজতনয় রামনাথের আশ্রয় তাঁহারা প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সুলতান মহম্মদের আক্রমণে কম্পিলির পতন ঘটে, রাজা ও তাঁহার পুত্র নিহত হন। হরিহর ও বুক্ক এসময়ে বন্দীরূপে দিল্লীতে নীত হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের আচরণ ও সততায় তুষ্ট হইয়া সুলতান তাঁহাদের মুক্তি দেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহাদের তিনি নিজের কাজেও লাগান। হরিহর ও বুক্ককে কর্ণাটের শাসকরূপে নিযুক্ত করা হয়। নির্দ্দেশ থাকে, বিদ্রোহী রাজা বল্লালের দমন ও সুলতানের হৃত রাজ্যাদির পুনরুদ্ধার হইবে তাঁহাদের প্রধান কাজ। হরিহর ও বুক্ক নৌকাযোগে কৃষ্ণা নদী পার হইয়া দক্ষিণকূলে পা দিবার পরই বল্লালের সেনাবাহিনীর সহিত ঘোর সংঘর্ষ বাধে, এ সংঘর্ষে দুই ভাই পরাজিত হন। অতঃপর তাঁহারা দক্ষিণাঞ্চলে পলাইয়া আসেন। এই সময়ে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করার কালে তুঙ্গভদ্রা তীরে, হাম্পিতে, প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য স্বামীর দর্শন তাঁহারা লাভ করেন।

"এই সন্ন্যাসীরই পরামর্শমত উভয়ে নূতন সেনাদল গঠন করেন। বল্লাল তাঁহাদের হস্তে পরাজিত হন। সঙ্গে সঙ্গে হরিহর ও বুক্ক রায় আনাগোণ্ডীতে স্থাপন করেন তাঁহাদের রাজধানী। কর্ণাট অঞ্চলও তাঁহাদের শাসনাধীনে আসিয়া যায়।'

"উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ নাই। কেলড়িনৃপবিজয়ম্-গ্রন্থে তাহা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই গ্রন্থ অনুযায়ী কম্পিলি রায়ের রাজসভায় অবস্থান করার সময় হরিহর ও বুক্ক কুরুব বংশের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন। কম্পিলিরাজও ছিলেন ঐ বংশ হইতে উদ্ভূত।"[১]

বিদ্যারণ্যের আবির্ভাব ও বিজয়নগর স্থাপনের মূলে ছিল এক

১ দি হিষ্টরি অ্যাণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপল্—মজুমদার, পুসলকার—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩২২।

ঐতিহাসিক প্রয়োজন। দেশের রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তখন চরম দুরবস্থা চলিতেছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়ারূপে সমকালীন দাক্ষিণাত্যে দেখা দেয় এক নূতন জাগৃতি। এই জাগৃতি সারা দেশে বিদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তোলে। ধর্ম্মীয় উজ্জীবনের প্রস্তুতি শুরু হয় ইহারই মাধ্যমে।

ঐতিহাসিক শ্রী কে, এ, এন, শাস্ত্রীর বর্ণনায় দেখিতে পাই, "দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় কখনো মুসলমান শাসন স্বীকার করিয়া নেয় নাই। এ সময়ে তাহারা এবং তাহাদের নেতৃবর্গ নব-উদ্ভূত শৈব আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ছিল—নিজেদের ঐতিহ্য হারাইতে কখনো রাজী হয় নাই। মঠ মন্দিরের ধ্বংসসাধন, দেবমন্দির অপবিত্রকরণ তাহাদের কাছে খুব অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন শৈববাদীরা ছিল প্রলয়-দেবতা শিবের অনুরক্ত, অপর সম্প্রদায় বা ধর্ম্মের প্রতি কোন সহনশীলতা তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। কিন্তু জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শিবোপাসকদের ইহারা সমান চক্ষে দেখিত। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য দাক্ষিণাত্যের নূতন শৈববাদ ইসলাম ধর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য হয়, প্রতিরোধ করার মত শক্তি নিয়া আগাইয়া আসে। এই মতবাদ দেশের রাজনৈতিক জীবনে যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে, তুঘলক শাসনকে তাহা এই অঞ্চলে শিকড় গাড়িতে দেয় নাই।

"সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা ধর্ম্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান-গুলিকে ধ্বংস করিতেন, চাষী ও শিল্পকর্ম্মীদের অর্থ করিতেন নির্ব্বিচারে শোষণ। কাজেই মুসলমানের অধীনতাপাশ ছিন্ন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়া উঠে। শুরু হয় মুক্তির সংগ্রাম। বিদ্যারণ্য স্বামীর ধর্ম্মরাজ্য, বিজয়নগর, আত্মপ্রকাশ করে এই সংগ্রামেরই এক প্রধান ঘাঁটিরূপে।"[২]

রাজা হরিহর ও রাজা বুক্ক রায় ছিলেন বিদ্যারণ্যের হাতের তৈরী

২ এ হিষ্টরি অব সাউথ ইণ্ডিয়া—কে. এ. এন. শাস্ত্রী, পৃঃ ২২৬।

মানুষ। তাঁহাদের সব কিছু গুরুতর কাজের পিছনেই সদা সক্রিয় ছিল এই সন্ন্যাসীর কুশাগ্রবুদ্ধি, রাজনীতিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-চেতনা।

দিল্লীর সুলতানের অনুসরণে হরিহর বিজয়নগর রাজ্যকে প্রধানতঃ সামরিক ভিত্তিতে গড়িয়া তোলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনভার দেন রণনিপুণ শাসকদের উপর, আর এই সামরিক সংগঠন দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরকে অপরাজেয় করিয়া তোলে। হাম্পি-হস্তিনাবতীর ক্ষুদ্র রাজ্য ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক বৃহৎ সাম্রাজ্যে।

দক্ষিণ ভারতে মুসলমানশক্তি তখন দুর্ব্বার গতিতে আগাইয়া আসিতেছে। এই শক্তিকে ঠেকাইতে হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য-গুলিকে একত্র করা দরকার। এক রাজছত্রের তলে, সুসংগঠিত রাষ্ট্রশক্তি নিয়া না দাঁড়াইলে হিন্দুর ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা করার কোন উপায় নাই—বিদ্যারণ্য ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কিভাবে এ কাজ সফল করিয়া তোলা যায়? শুধু তাঁহার একার শক্তিতে তো একাজ হইবার নয়। এজন্য সর্ব্বাগ্রে শৃঙ্গেরী মঠের অসামান্য প্রভাব ও আত্মিক শক্তিকে কাজে লাগানো দরকার। তাই রাজা হরিহরের সহিত তিনি এ সময়ে মঠের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলেন।

বিজয়নগররাজ ও শৃঙ্গেরী মঠের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়া কে, এ, এন, শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে দেখিতে পাই, হরিহর রায় ও তাঁহার পাঁচ ভাই সপরিবারে, বিশিষ্ট আত্মীয় কুটুম্ব এবং সহকারীগণসহ শৃঙ্গেরীতে প্রধান ধর্ম্মনেতার মঠে বিজয় উৎসবের জন্য সমবেত হইয়াছেন। এক সাগর-উপকূল হইতে আর এক উপকূল অবধি সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন করা হইয়াছে তাই সেদিনকার উৎসব সমারোহ। এ উৎসবে হিন্দু সমাজের খ্যাতনামা বহু সাধক ও আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন।"[৩]

৩ এ হিষ্টরি অব সাউথ ইণ্ডিয়া—কে. এ. এন. শাস্ত্রী, পৃঃ ৩২২।

বিদ্যারণ্য স্বামী দূরদর্শী, রাজনীতিতে মহা বিচক্ষণ। মনে মনে চিন্তা করিলেন, হরিহর ও বুক্ক এককালে দিল্লীর সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শাসন কার্য্য চালাইয়াছেন, বিধর্ম্মীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন। স্বভাবতঃই এই অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁহাদের বেশী মানিতে চাহিবে না। বিদ্যারণ্য নিজে হরিহরকে সমর্থন দিয়াছেন। তারপর শৃঙ্গেরি মঠের মহাপ্রভাবশালী অধ্যক্ষ বিদ্যাতীর্থের দ্বারা দেওয়াইয়াছেন দীক্ষা। তবুও হয়তো লোকের মনের দ্বিধা এবং সন্দেহ ঘুচে নাই। বিদ্যারণ্য এ সম্পর্কে কোন রকমের ঝুঁকি নিতে রাজী নন। হরিহরকে নির্দ্দেশ দিলেন, "বৎস, তুমি ঘোষণা ক'রে দাও,—বিজয়নগরের অধীশ্বর হচ্ছেন স্বয়ং দেবাদিদেব শ্রীবিরূপাক্ষ। তুমি তাঁরই প্রতিনিধি হ'য়ে শাসন চালাচ্ছো। এখন থেকে রাজ্যের দলিল বা আদেশপত্রে রাজারা সই করবেন প্রভু বিরূপাক্ষেরই নামাঙ্কিত অভিজ্ঞান দিয়ে।"

বিদ্যারণ্যের নির্দ্দেশ শুধু হরিহরই নন, পরবর্ত্তী সকল রাজারাই মানিয়া নেন। এই নব ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতে শৈব মতের প্রসার সাধন করে, সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগর রাজ্যের মর্য্যাদা এবং শক্তিও বাড়াইয়া তোলে।

উত্তরকালে, বিজয়নগরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখা যায় রাজা বুক্ক রায়ের সময়ে। তাঁহার সাফল্যের মূলে সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। বুক্ক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ডক্টর বেঙ্কটরমনাইয়া লিখিতেছেন, "তিনি ছিলেন সে যুগের এক শ্রেষ্ঠ রাজা, বিজয়নগর রাজ্যের অন্যতম স্রষ্টা। এই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা সকল রণক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অসামান্য সাফল্য প্রদর্শন করেন। বুক্ক রায় নিজে বেদধর্ম্মের উজ্জীবনের জন্য তৎপরতা দেখান। 'বেদমার্গ প্রতিষ্ঠাপক'—এই উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি বেদপারঙ্গম পণ্ডিতদের তাঁহার রাজ্যে সাদরে আহ্বান

করিয়া আনেন। কুলগুরু মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য এবং তাঁহার কীর্ত্তিমান ভ্রাতা সায়নাচার্য্যের অধীনে এই সব পণ্ডিতদের তিনি নিয়োজিত করেন। নূতনতর বেদভাষ্য প্রণয়ন, বিভিন্ন বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থের তত্ত্ব নিরূপণের জন্য তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন। তেলেগু সাহিত্যের উন্নতির জন্যও বুক্ক রায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সমকালীন তেলেগু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি নচনসোম-এর তিনি ছিলেন বড় পৃষ্ঠপোষক।"[১]

বিজয়নগর ক্রমে হিন্দুর ধর্ম্মজীবন ও সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের এক মহান কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া উঠে। এই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ রোধ করিতেও এ রাজ্য তৎপর হয়। আর তাহা সম্ভব হয় দীর্ঘ সামরিক সম্প্রসারণের মধ্য দিয়া।

প্রায় তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া স্বামী বিদ্যারণ্যের সৃষ্ট এই সাম্রাজ্য সনাতনধর্ম্মকে রক্ষা করে। এ সময়ে এক দিকে মুসলমান শক্তি, আর এক দিকে পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদের নৌ-সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে বিজয়নগরকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রাম অনেকাংশে জয়যুক্তও হয়।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে, দক্ষিণভারতের উপকূলে পর্ত্তুগীজদের আধিপত্য ও অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে দুঃসাহস তাহাদের চরমে উঠে। সুযোগ পাইলেই হিন্দুর দেবমন্দির তাহারা লুণ্ঠন করিত। জোর করিয়া জেসুইটদের দিয়া হিন্দুদের খৃষ্টান করিতেও ছাড়িতনা। কিন্তু অচিরে বিজয়নগরের প্রতাপের কাছে এই দুর্দ্দান্ত খৃষ্টানেরা মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়। পর্ত্তুগীজদের দমনের ফলে ভারত এক নূতন উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পায়।

ভারত ইতিহাসে বিজয়নগরের আরও এক বড় অবদান আছে। দেশের সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে এই সাম্রাজ্য নবাগত ভাবধারা বা

১ দি দিল্লী সুলতানেট—মজুমদার, পুসলকার—পৃঃ ২৮০।

বিধর্ম্মীর শক্তি দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইতে দেয় নাই। নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্য দিয়া বাহমনী রাজ্যের সামরিক শক্তিকে ইহা দক্ষিণ ভারতের সীমায় নিবদ্ধ রাখে। পরোক্ষভাবে বিজয়নগর এই শক্তিমান মুসলমান রাজ্যের প্রভাবকে উত্তর ভারতে প্রসারিত হইতে দেয় নাই। বলা বাহুল্য, এ সময়ে দিল্লীর সুলতানের ক্রমিক শক্তি হ্রাসের ফলে বাহমনী রাজ্যের বিস্তৃতির সম্ভাবনা খুবই বেশী ছিল।”[২]

সমাজ ও ধর্ম্মের উজ্জীবনের জন্য ব্যগ্র হইয়া বিদ্যারণ্য বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মহান কর্ম্ম সফল করিয়া তুলিতে যে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহা শুরু হইতেও দেরী হয় নাই। বিদ্যারণ্য, সায়নাচার্য্য ও অন্যান্য পণ্ডিতদের শাস্ত্র রচনায় তাহার প্রমাণ মিলে। এই সঙ্গে দেখা দেয় ধর্ম্ম, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বিরাট আন্দোলন। রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে নির্ম্মিত হইতে থাকে অজস্র বিশালকায় মন্দির। সুদৃশ্য মণ্ডপ, বেদী ও নিখুঁত কারুকলা সমন্বিত স্তম্ভসারির জন্য মন্দিরগুলি আজো দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া গণ্য হইতেছে।

শিলালেখ ও তাম্রশাসন হইতে দেখা যায়, বিজয়নগরের রাজা ও অমাত্যেরা পুরুষানুক্রমে সাধু-মহাত্মা ও শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের জন্য অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। ফলে মঠ মন্দির এবং বিদ্যাস্থান-গুলি জাঁকিয়া উঠিয়াছে। জনজীবনেও ছড়াইয়াছে তাহাদের দূরপ্রসারী প্রভাব।

বিজয়নগর স্থাপনের পর হইতে প্রায় দশ বৎসর বিদ্যারণ্য স্বামী রাজ্যের মন্ত্রীত্বপদে সমাসীন থাকেন। রাজধানীতে অবস্থান করিয়া নিপুণ হস্তে করেন সর্ব্ব কর্ম্মের পরিচালনা। তাঁহার বড় সাধের ধর্ম্মরাজ্য সাক্ষাৎভাবে গড়িয়া উঠে তাঁহারই হস্তে।

২ অ্যান অ্যাডভান্‌সড্‌ হিষ্টরি অব্‌ ইণ্ডিয়া—মজুমদার, রায়চৌধুরী, দত্ত, পৃঃ ৩৬৬—৬৭।

পরবর্ত্তী বিশ বৎসরও এই রাজ্যের পরিচালনা তাঁহারই নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। কিন্তু সে সময়ে দূরে, শৃঙ্গেরী মঠে বসিয়াই তিনি কাজ চালাইতেন এবং যে কোন নীতি নির্দ্ধারণে বা গুরুতর কার্য্যে তাঁহার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। তবে এ সময়ে জরুরী প্রয়োজন না ঘটিলে বিজয়নগরে তিনি উপস্থিত হইতেন না।

বিদ্যারণ্যের উৎসাহ ও প্রেরণায় সঙ্গমরাজ বংশ দুর্ব্বার হইয়া উঠে, রাজ্যসীমা বিস্তারিত হইতে থাকে। ফেরিস্তার বর্ণনায় দেখিতে পাই, হরিহর রায় অন্যান্য হিন্দু রাজার সহায়তায় একবার দিল্লীর সুলতানের বিশাল বাহিনীকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। এই জয়লাভের ফলে ওয়ারেঙ্গল, দেওগিরি, হয়শাল প্রভৃতি রাজন্যদের শাসিত বহু অঞ্চল তাঁহার অধিকারে আসিয়া পড়ে। বিজয়নগর এক নূতন শক্তিকেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

রাজা হরিহর নিজে বহু গুণের অধিকারী। বুক্ক রায় প্রভৃতি তাঁহার অপর চার ভ্রাতাও যুদ্ধবিদ্যা ও প্রশাসনে নিপুণ। পঞ্চপাণ্ডবের মতই তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্য, সংহতি ও ভ্রাতৃপ্রেম। এই সঙ্গে মিলিত হয় বিদ্যারণ্য স্বামীর আত্মিক শক্তি ও অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রতিভা।

দেশ ও ধর্ম্মের জন্য স্বামী বিদ্যারণ্যকে এ সময়ে চরম ত্যাগ বরণ করিতে দেখা যায়। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী নিজের নিভৃত তপস্যা ছাড়িয়া, মোক্ষসাধনা স্থগিত রাখিয়া, জনকোলাহলের মধ্যে নামিয়া আসেন। কর্ম্মযজ্ঞ উদ্‌যাপনে ব্রতী হন। বিজয়নগরের রাজমন্ত্রীত্ব তিনি গ্রহণ করেন দশ বৎসরের জন্য।

মন্ত্রী হইলেও কার্য্যতঃ তিনিই সকল কিছুর নিয়ামক। রাজা হরিহর ও তাঁহার ভ্রাতারা এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। গুরুর মতই বিদ্যারণ্যের মানমর্য্যাদা। এই কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ ছাড়া কোন রাজকার্য্যই সম্পন্ন না, রাষ্ট্রজীবনের তিনিই সর্ব্বময় প্রভু।

বিদ্যানগর ছিল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী এক দুর্ভেদ্য দুর্গনগর। উত্তরে খরস্রোতা তুঙ্গভদ্রা শত্রুর সম্মুখে এক দুস্তর প্রাকৃতিক পরিখারূপে বর্ত্তমান। নগরের তিন দিকে হেমকূট, মতঙ্গ ও মলয় পাহাড়। প্রস্তর প্রাকার দ্বারা এই সব পাহাড়ের শ্রেণী সংযোজিত হয়, আর চারিদিকে থাকে সুগভীর খাদের বেষ্টনী।

এই গড়খাই ও প্রাচীরের ভিতরে থাকিয়া বিজয়নগর বাহিনী যতদিন যুদ্ধ করিয়াছে ততদিন তাহারা পরাজিত হয় নাই। কিন্তু নিজস্ব রক্ষাব্যূহ ছাড়িয়া যেদিন দূরে গিয়া লড়িয়াছে সেদিন আর পরাজয় এড়ানো সম্ভব হয় নাই। উত্তরকালে তেলিকোটার যুদ্ধে এই দুর্দ্দৈব ঘটিতে দেখা গিয়াছিল।

যে অঞ্চলে বিদ্যারণ্যের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয় তাহার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। রামায়ণযুগের কিষ্কিন্ধ্যা, কপিরাজ বালির রাজধানী, ছিল এই স্থানে। তুঙ্গভদ্রা সেকালে পরিচিত হইত পম্পা নামে। এই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীর তীরে ছিল মহামুনি মতঙ্গের আশ্রম।

শূরশ্রেষ্ঠ বালি সেবার এক দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে হত্যা করেন, তারপর শক্তিগর্ব্বে মত্ত হইয়া ঐ রাক্ষসদেহ ছুঁড়িয়া মারেন মতঙ্গ পর্ব্বতে মুনিবরের আশ্রমে।

মুনি তো ক্ষেপিয়া আগুন। পুতিগন্ধময় মৃতদেহ তাঁহার আশ্রমে নিক্ষেপ করে, এই দুঃসাহস কাহার? ধ্যানযোগে জানিলেন—একাজ আর কারুর নয়, বলদর্পী কপিরাজ বালির। সক্রোধে তখনি দিলেন অভিশাপ—বালি এই পর্ব্বতে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হইবে তাঁহার জীবনান্ত।

মতঙ্গ ঋষির শাপের ভয়ে বালি আর কখনো আশ্রমের সীমানায় প্রবেশ করেন নাই।

এই অভিশাপের কথা সুগ্রীবের জানা ছিল। তাই বালির সহিত যুদ্ধে হারিয়া তিনি মতঙ্গ আশ্রমের কাছে, ঋষ্যমুখ-এ আশ্রয় নেন এই স্থানেই রামচন্দ্র প্রাপ্ত হন সীতা দেবীর সন্ধান। তারপর সুগ্রী

এবং হনুমানের সহায়তায় প্রিয়তমার উদ্ধারে ব্রতী হন। রামলীলার এক পটপরিবর্ত্তন ঘটে এই অঞ্চলে।

মতঙ্গ ঋষির সাধনায় এই ভূমি জাগ্রত, প্রভু শ্রীরামের পাদস্পর্শে ইহার প্রতি ধূলিকণা পবিত্র। তাই এখানে রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় স্বামী বিদ্যারণ্যের আনন্দের সীমা নাই। এবার ইহাকে এক শক্তিমান ধর্ম্মরাজ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন।

সামরিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে বিজয়নগরের শক্তি সমৃদ্ধির বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়ে। বিধর্ম্মীদের নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার ভয়ে ভীত জনগণ দলে দলে এখানে আসিয়া আশ্রয় নিতে থাকে।

কিন্তু, শুধু আশ্রয় দান আর নিরাপত্তা সাধনই তো বড় কথা নয়। প্রধান লক্ষ্য—ধর্ম্ম ও সমাজের উজ্জীবন। এজন্য চাই নূতন মানসিকতা, নূতন ভাবপরিমণ্ডল। বিদ্যারণ্য স্থির করিলেন, বিজয়নগরকে অচিরে ধর্ম্ম সাংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবেন, সারা ভারতের সম্মুখে স্থাপন করিবেন এক আলোকস্তম্ভরূপে।

শুভলগ্ন আসিয়া গিয়াছে, আর দেরী করা নয়। একে একে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী, দার্শনিক ও ধর্ম্মসঙ্ঘের আচার্য্যদেব তিনি আমন্ত্রণ জানাইলেন।

মুসলমান রাজশক্তির দাপটে তখন সারা উত্তর ভারত কম্পমান, কাজেই বিজয়নগরের আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। বহু সংখ্যক বেদবিদ্ পণ্ডিত, মনীষী গ্রন্থকার ও ধর্ম্মগুরু সেখানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

বিদ্যারণ্য প্রখ্যাত জ্ঞানপন্থী আচার্য্য এবং অদ্বৈত বেদান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে এই তত্ত্ব ও দার্শনিকতা তিনি প্রচার করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্য্যতঃ সকল মতবাদ সম্পর্কেই সেদিন দেখান তিনি অপূর্ব্ব উদারতা।

বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন যে, জাতি বর্ণ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুর সমর্থন না পাইলে তাঁহার এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হইবে না। তাছাড়া, দার্শনিকতা ও ধর্ম্মসাধনার দিক দিয়া নিজে তিনি উদারপন্থী বৈদান্তিক। রাষ্ট্রের সংগঠনে উদারতা ও সর্ব্বজনীনতাকে তাই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিলেন।

বেদভিত্তিক ধর্ম্মের নব অভ্যুদয় বিদ্যারণ্য চাহিয়াছেন, চাহিয়াছেন ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সার্ব্বিক কল্যাণ। তবে প্রশাসন-কার্য্যে ও ধর্ম্ম সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দিলে চলিবে কেন? তাঁহার এ মহান ব্রত কি করিয়া সার্থক হইবে? তাই মহান্ সন্ন্যাসী সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া সকল মত ও পথের মানুষকে জানান আন্তরিক আহ্বান।

সেদিন দেখা যায়, স্বামী বিদ্যারণ্যের স্থাপিত বিরূপাক্ষ মন্দিরের আশেপাশে মাথা উঁচাইয়া রহিয়াছে যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণবীয় সাধক ও আচার্য্যদের অগণিত সাধনপীঠ আর মঠ-মন্দির।

বিজয়নগরের রাজানুগ্রহও বিতরিত হইতে থাকে ধর্ম্মীয় মতবাদ নির্ব্বিশেষে। মধ্যযুগের কোন রাজ্যের প্রশাসন বা রাজনৈতিক জীবনে এমন উদারতা কমই দেখা গিয়াছে।

রাজ্য প্রতিষ্ঠার অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যারণ্য স্বামী আমন্ত্রণ করেন আবাল্য বন্ধু, প্রাক্তন সহপাঠী বেঙ্কটনাথকে।[১] বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক প্রধান ব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিচিত। সারা দাক্ষিণাত্যের লোক তাঁহাকে জানে ভক্তিবাদের এক শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে। সবাই তাঁহার দার্শনিকতা ও কবিত্ব শক্তির করে অকুণ্ঠ প্রশংসা।

জীবনদর্শনের দিক দিয়া স্বামী বিদ্যারণ্য বেঙ্কটনাথের বিরুদ্ধবাদী।

১ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকুয়েরী, ভল্যু, ১২—পৃঃ ১২-১৬, প্রবন্ধকার: শ্রী আর, নরসিংহাচার।

তাঁহার ব্রত—অদ্বৈতবাদের প্রচার। চিরকাল এই মহান কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আজ কিন্তু দেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কল্যাণের কথা ভাবিয়া তিনি অসামান্য উদার মনোভাবের পরিচয় দিলেন।

ভক্ত বেঙ্কটনাথ পূর্ব্বে ছিলেন শ্রীরঙ্গম তীর্থে। প্রভু রঙ্গনাথের দীন সেবকরূপে, মনের আনন্দে এই পরম ভাগবত সেখানে দিনযাপন করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সেদিন দেখা দেয় মহা দুর্দ্দৈব। মালেক কাফুরের বাহিনী মাদুরা ও শ্রীরঙ্গম বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, এ সময়ে শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহকে তাড়াতাড়ি গোপনে অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া হয়। বেঙ্কটনাথের পক্ষে শ্রীরঙ্গমে থাকা আর সম্ভব হয় নাই। মনোদুঃখে মহীশূরের এক নগণ্য গ্রামে সরিয়া গিয়া তিনি নির্ম্মাণ করেন নিজের সাধন কুটির।

বহুদিন পরে, হঠাৎ সেদিন বিদ্যারণ্যের আহ্বানলিপি পাইয়া বেঙ্কটনাথ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রিয় বন্ধুর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা তো তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিদ্যারণ্যকে লিখিয়া জানান, "দীনহীন কাঙ্গাল সাধক আমি। প্রভু রঙ্গনাথজীর সভার কোণে দাঁড়িয়ে, প্রভুর নয়নভুলানো শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, এতকাল আমার দিন কেটেছে। কিন্তু কর্ম্মদোষে ভাগ্য বিরূপ। শ্রীরঙ্গমের সভা ভেঙ্গে দিয়ে লীলাময় প্রভু নিজেকে রেখেছেন লুকিয়ে। এখনো চল্‌ছে তাঁর লুকোচুরি খেলা, আর দীনভক্ত বেঙ্কটনাথের জীবনে জ্বল্‌ছে বিরহের সন্তাপ। দূর থেকে তাই রঙ্গনাথজীর অর্চ্চনা করি, আর করি তাঁর রূপরাশি ধ্যান। এ ভাবেই কেটে যায় আমার দিন। তোমার এ আমন্ত্রণে উদারতার সাথে রয়েছে প্রচুর আন্তরিকতা, তা জানি। কিন্তু ভাই, রঙ্গনাথজীর সভার দীন ভক্ত অপর কোন রাজার সভায় যেতে যে রাজী নয়। তাছাড়া, বিদ্যানগরের রাজসভা আর বৈভবের মধ্যে গিয়ে বাস ক'রতে আমার মন সরে না।"

বিদ্যারণ্য ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার বড় আশা ছিল, বেঙ্কটনাথেরা আগমনে বিদ্যাচর্চ্চায় জাগিবে নূতন প্রাণের জোয়ার, প্রতিযোগী দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের বিচার বিতর্কের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিবে ভারতধর্ম্মের মহনীয় রূপ।

উত্তরে বেঙ্কটনাথকে লিখিলেন,—"তোমার শ্রীরঙ্গনাথ তো আর পাষাণ বিগ্রহ নন, তিনি বিভু, সর্ব্বব্যাপী—অখণ্ড চৈতন্যময় সত্ত্বা। তবে শ্রীরঙ্গম বিধ্বস্ত হলেই বা তাঁর সভা ভাঙ্গে কি ক'রে? তাছাড়া, বন্ধু, বিজয়নগরের রাজসভা যে প্রভুরই কিঙ্করের সভা! যেখানে আমার মত কপর্দ্দকহীন কাঙাল সন্ন্যাসী রয়েছে, সেখানে তোমার আগমনে বাধা কোথায়, বলতো? আর একটা কথা। শ্রীরঙ্গনাথের যত কিছু রঙ্গ, বিশ্বময় তা ছড়ানো রয়েছে নাম রূপের মধ্য দিয়ে। আমাদের মত মানুষের জীবনেই তো ঘটে তাঁর লীলার প্রকাশ, এক ও অদ্বিতীয় প্রপঞ্চিত হন বহুতে। তিনি যে ভাই, নৈষ্কর্ম্ম্যের অবতার, ঠুঁটো জগন্নাথ। তাঁর হাত পা যে তুমি, আমি, সবাই। বিদ্যারণ্য স্বামী আর বিদ্যানগরের রাজা দীন সেবক হ'য়ে তাঁরই কাজ ক'রে যাচ্ছে। বন্ধু, আমার সেই সেবার অন্যতম লক্ষ্য রঙ্গনাথজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুনে রাখো, আমার ব্রতের উদ্‌যাপন হবে না, মাদুরা আর শ্রীরঙ্গমের পুনরুদ্ধার ছাড়া। আমার এই কর্ম্মযজ্ঞের ভীড় আর কলরবের মাঝে তুমি আসবে না, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার ব্রতকে যেন ভুল বুঝোনা।"

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০ বৎসর কাল বিদ্যারণ্য রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার নেতৃত্ব ও প্রেরণায় বিজয়নগর পরিণত হয় সারা দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র রাজ্যে।

স্বাধীন ও শক্তিমান এই রাষ্ট্রের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন থাকে প্রায় তিন শত বৎসর, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রধান রক্ষকরূপে সর্ব্বত্র লাভ করে বিপুল অভিনন্দন।

বিদ্যারণ্য স্বামীর সৃষ্ট এ সাম্রাজ্যের শক্তি, সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য্যের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। সমকালীন বিদেশীয় পর্য্যটকদের লেখায় এ সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য আমরা পাই।

এই সব বিদেশীরা দূর দূরান্ত হইতে বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও প্রতাপের কথা শুনিতেন, স্বচক্ষে তাহা দেখার জন্য এখানে উপনীত হইতেন। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতকে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ইটালীর নিকোলো, আফ্রিকার ইবন বাতুতা, পারস্যের রাজদূত আবদুল রজাক, রাশিয়ার নিকিতিন, পর্তুগালের ফারনাও নুঁয়েজ ও পীজ্। ডুয়ার্তে বারবোসা, সিজার ফ্রেড্রিক ও কাস্টেন হেডা প্রভৃতিও প্রত্যক্ষদর্শী পর্য্যটক হিসাবে বিজয়নগরের নানা তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন।[১]

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরিণত রূপ সম্বন্ধে রবার্ট সিউএল তাঁহার, 'এ ফরগটন্ এম্পায়ার' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এখানকার শাসকেরা তাঁহাদের সময়ে যে বিরাট সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাহার আয়তন ছিল ইউরোপের অষ্ট্রিয়ান্ সাম্রাজ্যের চাইতেও অনেক বেশী। আর বিজয়নগর রাজধানী সম্পর্কে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা একের পর এক লিখিয়া গিয়াছেন—এই নগরীর আয়তন ও সমৃদ্ধি নিতান্তই বিস্ময়কর! পশ্চিম গোলার্দ্ধের কোন রাজধানীই ঐশ্বর্য্য ও শিল্পসৌন্দর্য্যের দিক দিয়া ইহার সহিত তুলনীয় নয়। এই সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির বড় প্রমাণ মিলে ভারতে আগত তৎকালীন পর্তুগীজদের কার্য্যকলাপে। পশ্চিম উপকূলের প্রায় সমস্তগুলি সামরিক সংঘর্ষে তাহারা লিপ্ত হইয়াছে বিজয়নগরেরই সমৃদ্ধিশীল বাণিজ্য হস্তগত করার জন্য।

"তাই দেখা যায়, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটার

১ অ্যান অ্যাডভানস্‌ড হিষ্টরি অফ ইণ্ডিয়া—মজুমদার, রায়চৌধুরী, দত্ত—পৃঃ ৩৭৪-৭৮

সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ গোয়ারও পতন ঘটে, ভবিষ্যতে আর কখনো উহা মাথা তুলিতে পারে নাই।"[১]

শুধু ঐশ্বর্য্য ও সামরিক শক্তিবলে নয়—ধর্ম্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য, কলাশিল্পের উৎকর্ষের দিক দিয়াও বিজয়নগর ছিল সমকালীন ভারতে

য়।

সনাতন ধর্ম্মের উজ্জীবন প্রধান লক্ষ্য হইলেও, উত্তরকালে সর্ব্ব ধর্ম্ম ও সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতিই এখানকার রাজারা উদার মনোভাব পোষণ করিতেন।

পরবর্ত্তী কালে দেখা যায়, রাজা দেবরায়ের সেনা বাহিনীতে বহু মুসলমান যোদ্ধা নিয়োজিত রহিয়াছে। ইহারা যাহাতে নিজ নিজ বিশ্বাস ও ধর্ম্মবোধ অনুসারে উপাসনা করিতে পারে, এজন্য রাজা নগর মধ্যে মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কোন কোন মসজিদ ও দরগার চিহ্ন আজো হাম্পির ধ্বংসাবশেষে দেখা যায়। দেবরায় ও অন্যান্য রাজারা যে কোন ধর্ম্মেরই সম্মান করিতেন, মর্য্যাদা দিতেন। এজন্য রাজ্যে বহু বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান আশ্রয় নিয়াছিল।

বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও গৌরব চরমে উঠে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে। তিনি ছিলেন বিষ্ণু উপাসক, পরম ধার্ম্মিক নৃপতি। তাঁহার ভুজবলে সারা দাক্ষিণাত্য কম্পিত হইত। উড়িষ্যার সীমান্ত অবধি কৃষ্ণদেব রায় স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারিত করেন এবং এক যুদ্ধে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রকে তিনি পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। কতকটা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, কতকটা কৃষ্ণদেবের বীরত্ব ও ধর্ম্মপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া, প্রতাপরুদ্র নিজ কন্যা চিন্না দেবীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন।

ইতিহাস ও সমাজজীবনের তথ্যোপকরণ হইতে দেখা যায়,

১ রবার্ট সিউএল—ফরগটন্ এম্পায়ার, ভিজিটারস্ অব ইণ্ডিয়া ইন্ ফোর্‌টীনথ এণ্ড ফিফ্‌টীনথ্ সেঞ্চুরী—পৃঃ ৫৮৪-৫৮৫।

বিজয়নগরের এ বিরাট সাম্রাজ্য ও সকল কিছু কল্যাণকর প্রয়াসের মূলে ছিল স্বামী বিদ্যারণ্যের সঙ্কল্প আর কর্ম্মপ্রেরণা। যে বীজ এই শক্তিধর সন্ন্যাসী সেদিন হাম্পির জনমানবহীন অরণ্যে রোপণ করেন, কালে তাহাই পরিণত হয় এক বিরাট বনস্পতিতে। অগণিত নরনারী তাহার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে।

তীক্ষ্ণধী বিদ্যারণ্য বুঝিয়া নিয়াছিলেন, ধর্ম্মের ভিত্তির উপর এ রাজ্যকে দাঁড় করাইতে না পারিলে ইহা স্থায়ী হইবে না, আরব্ধ ব্রত রহিবে অসমাপ্ত। তাই গোড়া হইতেই শাস্ত্র প্রচারের উপর তিনি জোর দেন। পরমোৎসাহে শুরু করা হয় বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি পুরাণের অনুলিখন, সম্পাদনা ও ভাষ্য-টীকা প্রণয়ন। নিজে তিনি ইতিমধ্যেই বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এবার ব্রতী হইলেন শাস্ত্রোদ্ধারের বৃহত্তম পরিকল্পনায়।

ভ্রাতা সায়নাচার্য্য বেদশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। স্বামী বিদ্যারণ্য তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই, আমার সঙ্কল্পিত কর্ম্মে, রাজা হরিহরের মত, তুমিও আমার সহায় হও। আমার পাশে এসে দাঁড়াও। বেদের ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠেছে সমগ্র হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু সমাজ—এই বেদশাস্ত্রের মহাভাষ্য তুমি রচনা কর।"

কিন্তু এ যে এক বিরাট দায়িত্ব। যত বড় মনীষীই হোন না কেন, একজনের পক্ষে তো এ কাজ কোনমতে সম্ভব নয়!

সায়ন উত্তর দিলেন, "এ যে আমার জীবনের এক বড় স্বপ্ন। কিন্তু একার চেষ্টায় কি তা সফল হয়ে উঠবে?"

"ভয় নেই তোমার, আমি নিজেই থাকবো তোমার এই মহান কর্ম্মের পেছনে। শুধু তাই নয়, সারা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত হবে একাজ সার্থক ক'রে তোলবার জন্য। দেশের খ্যাতনামা বেদবিদ্ আচার্য্যদের সাহায্যও তুমি পাবে। আজ থেকে অনন্তকর্ম্মা হয়ে এতে ব্রতী হও, স্বপ্ন তোমার রূপায়িত কর।"

যথাযোগ্যভাবে সায়নাচার্য্য এই গুরু দায়িত্ব পালন করেন।

ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে বহুবিশ্রুত 'বেদার্থপ্রকাশ'। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদের যে মহাভাষ্য তিনি প্রণয়ন করেন, বিশ্বের ধর্ম্মসাহিত্যের ইতিহাসে আজও তাহা চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এই মহাভাষ্য রচনায় মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের প্রতিভার স্বাক্ষরও যে ছিল, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ, আচার্য্য সায়ন নিজেই এ নাম ইহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।[১]

এ রাজ্যের প্রশাসন যে বিদ্যারণ্যের ধর্ম্মীয় কাজ, জীবন-ব্রত। বাছিয়া বাছিয়া তাই যোগাড় করেন তেমনি সব আদর্শ কর্ম্মী যাঁহারা মনীষা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শৌর্য্যের দিক দিয়া অগ্রগণ্য। অমাত্য মাধবাঙ্ক ছিলেন এমনি একজন কর্ম্মী পুরুষ। সায়নের মত ইনিও বিদ্যারণ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক হইয়া উঠেন। মাধবাঙ্ক কুশলী-যোদ্ধা, আবার

---

১ এ বিষয়ে পুরাতত্ত্বের বিশিষ্ট গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। 'বেদার্থপ্রকাশ'-এর রচনায় যে স্বামী বিদ্যারণ্যের অংশ আছে, তাহা অনেকে মানিতে চাহেন না। এই বিতর্কের নিরসন করিয়া সুধী দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন, মাধবাচার্য্য রাজকার্য্যে নিমগ্ন থাকিতেন, বেদভাষ্য রচনারূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর তাঁহার ছিল না; সায়নাচার্য্য উহা রচনা করিয়া অগ্রজের নামে ও স্বনামে প্রচারিত করেন: কিন্তু ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দের এক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐ সময়ে 'বিদ্যারণ্য শ্রীপাদ' রাজা দ্বিতীয় হরিহরের সভায় উপস্থিত থাকিয়া বেদভাষ্যের প্রবর্ত্তক নারায়ণ বাজপেয়যাজী, নরহরি সোমযাজী এবং পনঢরী দীক্ষিতকে উক্ত নরপতি দ্বারা ভূমিদানের তাম্রশাসন প্রদান করেন। সম্ভবতঃ, উক্ত পণ্ডিতত্রয় মাধবাচার্য্য ও সায়নাচার্য্যকে বেদভাষ্য রচনায় সাহায্য করেন। তৎপূর্ব্বে ১৩৮১ খৃষ্টাব্দেও উক্ত তিন পণ্ডিত দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র ও আরগ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা চিক্ক রায়ের নিকট হইতে যথাক্রমে বার্ষিক ৬০, ৪০ এবং ৬০ বরহা (মুদ্রা বিশেষ) পরিমাণ আয়ের ভূসম্পত্তি অগ্রহাররূপে প্রাপ্ত হন।" (জীবন্মুক্তি বিবেক—ভূমিকা; অনুবাদ: দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

তেমনি বেদবিদ্যায়ও মহা পারঙ্গম। তাই দাক্ষিণাত্যের সুধীসমাজ তাঁহাকে উপাধি দেন 'উপনিষদ্‌মার্গ-প্রবর্ত্তকাচার্য্য'। বিশ্বের যে কোন কল্যাণরাষ্ট্র এমন একজন কৃতী, ধর্ম্মপ্রাণ সচিব পাইয়া প্রকৃত গৌরব বোধ করিতে পারে।

মাধবাঙ্কের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া বিজয়নগরের রাজা তাঁহাকে আঞ্চলিক শাসকের পদে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের পশ্চিম উপকূল এবং জয়ন্তীপুরের ভার তাঁহাকে দেওয়া হয়। বিধর্ম্মী বাহিনীর বিরুদ্ধে অপূর্ব্ব শৌর্য্য ও রণদক্ষতা তিনি দেখান এবং কোঙ্কনের রাজধানী গোয়া অবধি সমগ্র ভূখণ্ড ক্রমে তাঁহার অধিকারে আসিয়া পড়ে।

মাধবাঙ্কের পিতা আচার্য্য চাবুণ্ড। তাঁহার গুরুর নাম কাশীবিলাস। এই শক্তিধর গুরুর আশীর্ব্বাদে মাধবাঙ্ক উত্তরকালে এক বিশিষ্ট আচার্য্যরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। সুপ্রসিদ্ধ ত্র্যম্বকনাথ শিবলিঙ্গ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সূতসংহিতার টীকা ও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক জ্ঞানবাদী গ্রন্থ দুইটি এই অমাত্য মাধবাঙ্কই রচনা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বিদ্যারণ্য স্বামীকে যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক গবেষকদের মতে, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। আসলে তৎকালীন বিদ্যানগরে একাধিক মাধবাচার্য্য থাকাতেই এই ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে, একের কথা অপরের উপর আরোপিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী মাধবাচার্য্য-বিদ্যারণ্য নিজে কোনদিনই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, যদিও প্রেরণা যোগাইয়া আসিয়াছেন চিরদিন।[১]

১ পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত রুদ্রাধ্যায়ের ভূমিকায় পণ্ডিত বামনশাস্ত্রী মাধবাচার্য্যের জীবনতথ্য কিছুটা আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে যে তাম্রলেখের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের কোন সম্পর্ক নাই। আসলে অমাত্য মাধবাঙ্ক সম্বন্ধেই শাস্ত্রীজীর মন্তব্য প্রযোজ্য।

রাজ্য-শাসনের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে। এবার বিদ্যারণ্য অদ্বৈতবাদের প্রচারে প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন।

বিজয়নগরের রাজা সকল সম্প্রদায়েরই রক্ষাকর্ত্তা, তাহা ঠিক, কিন্তু স্বামী বিদ্যারণ্যের প্রভাবে পড়িয়া তিনি বেদান্তধর্ম্মের কিছুটা বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করিতে থাকেন। কাজেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুখপাত্রেরা মাঝে মাঝে এই মহাবেদান্তীকে পরাস্ত করিবার জন্য আগাইয়া আসিতেন।

এই সব বিচার-দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বিদ্যারণ্য ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ও তর্কের শরসন্ধানে প্রতিপক্ষকে প্রায়ই তিনি ধরাশায়ী করিতেন। নূতন করিয়া উড্ডীন হইত অদ্বৈতবাদের জয়পতাকা।

মধ্ব-মতের অন্যতম নেতা, আচার্য্য অক্ষোভ্য সেবার বিদ্যারণ্যকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানাইলেন। দাক্ষিণাত্যের এক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ ও বৈষ্ণব সাধকরূপে অক্ষোভ্য সুপরিচিত। তাঁহার সঙ্কল্প, বিদ্যারণ্যকে পরাজিত করিয়া অদ্বৈতবাদের প্রভাব চিরতরে খর্ব্ব করিবেন। তারপর বিজয়নগরের নৃপতিকে মাধবাচার্য্যের ভক্তিবাদ গ্রহণ করানো বেশী কঠিন হইবে না।

দুই দিকপাল আচার্য্যের এই বিচারসভা। কিন্তু সভাপতি কে হইবেন? ইহাদের মধ্যস্থ হওয়ার মত যোগ্যতাই বা কাহার? আরও এক প্রশ্ন—কোন্ মতাবলম্বী আচার্য্যকে এ কার্য্যের জন্য ডাকা যায়? কোন ভক্তিবাদীর উপর ভার দিলে জ্ঞানপন্থীরা চটিবে। আবার জ্ঞানবাদীকে বিচার-আসনে বসাইলে ভক্ত বৈষ্ণবেরা পছন্দ করিবে না। মনের মত সিদ্ধান্ত না হইলেই সম্প্রদায়ের লোকেরা দোষারোপ করিবে মধ্যস্থের উপর।

উদারচেতা বিদ্যারণ্য স্বামী নিজেই এ সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, "আপনারা এজন্য ভাব্‌বেন না, এ বিতর্কসভার বিচারক হোন্ বেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ!"

অনুগামীরা সবাই কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন। একি অদ্ভুত প্রস্তাব আচার্য্যের? দক্ষিণ ভারতের সবাই জানে যে, বেঙ্কটনাথ রামানুজীয় ভক্তিবাদের এক স্তম্ভ। দ্বৈতবাদের তিনি প্রধান বৈরী। শাঙ্কর বেদান্তের সিদ্ধান্ত খণ্ডনে তাঁহার প্রচণ্ড উৎসাহ। এ হেন আচার্য্যকে মধ্যস্থ মানা? এ যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা।

অক্ষোভ্য স্মিতহাস্যে বিদ্যারণ্যকে কহিলেন, 'আচার্য্য, আপনার এ প্রস্তাব আর একবার ভেবে দেখুন। বেঙ্কটনাথ হচ্ছেন দ্বৈতবাদী দার্শনিক, ভক্তি-আন্দোলনের স্বনামধন্য নেতা। তাছাড়া, তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা ক'রে থাকেন, আমাদের মধ্ব-মত তাঁর মতেরই কাছাকাছি। তাঁকে মধ্যস্থ মানতে কি আপনার ভয় হচ্ছেনা?"

"সে ভয় থাকলে কি এ প্রস্তাব ক'রতে সাহসী হতাম? আমি যে জানি, তিনি ভক্তিবাদের যত বড় সমর্থক হোন না কেন, বিচারাসনে বসে কখনো সত্যের অপলাপ করবেন না। দার্শনিক ও তার্কিক বেঙ্কটনাথ থেকে সাধক বেঙ্কটনাথ অনেক বড়, আর সে বেঙ্কটনাথকে আমি মনে প্রাণে জানি। বালককাল থেকেই যে তাঁর সে স্বরূপ আমার চেনা হয়ে আছে।"

বেঙ্কটনাথকে আমন্ত্রণ করা হইল, কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। বক্তব্যের ভাব ও ভাষা আগেরই মত। প্রভু রঙ্গনাথজীর একান্ত সেবক তিনি, কোন রাজসভায় যাওয়ার তাঁহার ইচ্ছা নাই।

সকলে প্রমাদ গণিলেন। তিনি ছাড়া তো আর কেহ এ সভার বিচারক হওয়ার যোগ্য নয়। তবে উপায়?

এ সমস্যার সমাধানও বিদ্যারণ্য করিয়া দিলেন। কহিলেন, "বেশ তো, আমাদের বিতর্ক এখানে এ রাজসভাতে শুরু হয়ে যাক্ বিশিষ্ট আচার্য্য ও সাধু সন্ন্যাসীর সামনে। আর বেঙ্কটনাথ দূরে বসেই করুন তার বিচার। দুই পক্ষের ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর লিখে পাঠানো হোক তাঁর কাছে। সেই লিখিত কাগজপত্র থেকেই তিনি জানিয়ে দেবেন তাঁর সিদ্ধান্ত।"

একবাক্যে সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। এবার মধ্যস্থ হইতে বেঙ্কটনাথের আর আপত্তি রহিল না।

একদিকে অদ্বৈতবেদান্তী বিদ্যারণ্য স্বামী, আর একদিকে দ্বৈতবাদী অক্ষোভ্য। দুই মনীষীর প্রবল যুক্তি তর্কের সংঘাত সারা দক্ষিণ দেশে আলোড়ন জাগাইয়া তোলে। বেশ কিছুদিন ধরিয়া তাঁহাদের এ তর্ক-যুদ্ধ চলিতে থাকে।

মধ্যস্থ বেঙ্কটনাথ কিন্তু উভয়ের বক্তব্য শুনিয়া জয়ী সাব্যস্ত করেন বিদ্যারণ্য স্বামীকেই। কাঞ্চী, মাদুরা ও বিজয়নগরের অদ্বৈতপন্থীদের মধ্যে সেদিন আনন্দ কলরব পড়িয়া যায়।[১]

বিদ্যারণ্যের এই সাফল্যের মধ্য দিয়া সারা দাক্ষিণাত্যের শাঙ্কর মতের জয় নূতন করিয়া ঘোষিত হয়।

বিজয়নগরের প্রতাপ দিন দিন বাড়িতেছে, দিকে দিকে উড়িতেছে প্রভু বিরূপাক্ষের নামাঙ্কিত জয়পতাকা। কিন্তু বিদ্যারণ্যের মনে শান্তি নাই, এখনো কাঁটার খোঁচার মত বিঁধিতেছে শ্রীরঙ্গনাথজীর উদ্ধারের কথা।

মাদুরার পতনের পর হইতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণপ্রিয় এই বিগ্রহকে পূজারীরা কোথায় লুকাইয়া ফেলিয়াছে। আবার তাঁহাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে কোন ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের মনেই শান্তি আসিবে না। তাছাড়া, রঙ্গনাথজীর ধাম শ্রীরঙ্গম দক্ষিণ ভারতের অধ্যাত্ম-জীবনের মর্ম্মকেন্দ্র। এখনো তাহা রহিয়াছে বিধর্ম্মীর

১ এই জয়ের সমর্থনে অদ্বৈতবাদীরা বেঙ্কটনাথের শ্লোকের উল্লেখ করেন—'অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্যারণ্যো মহামুনিঃ।' কিন্তু মাধ্ব-মতের অনুগামীরা এ শ্লোকের প্রমাণিকতা মানিতে চান না। তাঁহাদের মতে বেঙ্কটনাথের সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্যারণ্যের বিরুদ্ধে। তিনি বরং বলিয়াছেন—

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীব প্রভেদিনা
বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ

কবলে। নির্য্যাতন আর নিষ্পেষণে মানুষ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। এ দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে, আবার প্রবাহিত করিতে হইবে মুক্তির প্রাণস্রোত।

মাদুরার সুলতানের অপকীর্ত্তির সংবাদ শৃঙ্গেরীতে বিদ্যারণ্যের কাণে আসিতেছে। নিয়ত শুনিতেছেন বিগ্রহ ও দেবস্থান কলুষিত করার কথা। অধিকাংশ মঠ মন্দির ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত হইয়াছে। কত নিরীহ নরনারী আজ সর্ব্বস্বান্ত। কত লোককে যে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে তাহা কে বলিবে? এ ঘোর বিপদে বিজয়নগরের রাজা কি নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকিবেন? অত্যাচারিত যদি আশ্রয় না পায়, ধর্ম্মের রক্ষণ যদি সম্ভব না হয়, তবে কেন এই রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? বৃথা তবে বুক্ক রায়ের সামরিক প্রতাপ! বৃথা প্রভু বিরূপাক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব।

শৃঙ্গেরী মঠে বসিয়া বিদ্যারণ্য স্বামী শান্তি পান না, বার বার ছুটিয়া যান বিজয়নগরে। রাজাকে মাদুরা অধিকার করার জন্য উৎসাহিত করিতে থাকেন।

অবশেষে বুক্ক রায়ের সম্মতি মিলে। অভিযানের ভার পড়ে সমরকুশলী যুবরাজ কম্পনের উপর।

কুমার কম্পন তখন তামিল দেশের শাসনকর্ত্তা। নিজে তিনি মহাবীর, তদুপরি তাঁহার সাহায্যের জন্য রাজ্যের দুই শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ, গোপ্পন ও সালুভকে নিয়োগ করা হইয়াছে। মাদুরা আক্রমণের জন্য এক বিরাট বাহিনী তিনি প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু মনে মনে দুশ্চিন্তাও বেশ কিছুটা হইয়াছে। কারণ, মাদুরার সুলতানের সেনাবাহিনী দুর্দ্ধর্ষ, পাণ্ড্যরাজারা বার বার চেষ্টা করিয়াও এযাবৎ তাহাদের পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

কুমার কম্পনকে উদ্দীপিত করিয়া বিদ্যারণ্য লিখিলেন "বৎস, মাদুরা ও শ্রীরঙ্গম অধিকার তোমায় শুধু জয়গৌরবই এনে দেবেনা, সেই সঙ্গে দেবে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত নরনারীর আশীর্ব্বাদ। মুক্তির

নিঃশ্বাস ফেলে তারা বাঁচবে, পূতিগন্ধময় গহ্বর থেকে এগিয়ে আসবে অরুণোদয়ের পথে। ধর্ম্ম ও দেশের রক্ষায় জীবনপণ ক'রে তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা লাভ ক'রেছেন প্রভু বিরূপাক্ষের আশীর্ব্বাদ। ধর্ম্মরক্ষার জন্য মাদুরা ও শ্রীরঙ্গম জয় করে তুমিও সেই পরম ধন লাভ কারো। ভয় নেই, এগিয়ে যাও। ঐশী শক্তিই দেবে তোমায় সব কিছু সাহায্য।"

এই বৎসরেই, ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে, শ্রীরঙ্গমের কাছে সময়ভরম নামক স্থানে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া কুমার কম্পন মাদুরার বাহিনী বিধ্বস্ত করেন।

দক্ষিণ ভারতে জনশ্রুতি আছে, কুমার কম্পন এই যুদ্ধে দৈবী শক্তি লাভ করিয়া বিজয়ী হন।

মাদুরা সমরের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায় 'মধুরা বিজয়ম' কাব্যে। কুমার কম্পনের বিদুষী ও সুকবি পত্নী গঙ্গাদেবী সুললিত সংস্কৃত ভাষায় ইহা রচনা করিয়াছেন। সমকালীন ঐতিহাসিক তাথ্যর সাথে এ কাব্যে ভাবকল্পনাময় নানা কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে:

কুমার কম্পন তখন কাঞ্চীনগরে অবস্থান করিতেছেন। মাদুরার যুদ্ধ আসন্ন। তাই বিশিষ্ট সমরনায়কদের সহিত দিনের পর দিন চলিতেছে শলাপরামর্শ ও প্রস্তুতি। চিন্তা-ভাবনা ও কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে সবার দিন কাটিতেছে।

সেদিন গভীর রাতে কুমার পালঙ্কের উপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছেন। এসময়ে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন।

সারা কক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, আর এই দিব্য আলোকপুঞ্জের মধ্যে দণ্ডায়মানা এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি। কম্পন অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, কোন্ দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা? কি তাঁহার বক্তব্য?

ধীর পদে তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিলেন। স্মিত হাস্তে

কহিলেন, "বৎস কম্পন, আমায় দর্শন ক'রে হয়তো তুমি বিস্মিত হয়েছো। হবারই কথা। তুমি যে আমায় চেননা। তবে শোন বলছি আমার পরিচয়। আমি পাণ্ড্য রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বৎস, আমি এসেছি তোমারই কাছে। তোমায় দিয়ে সম্পন্ন করাতে হবে এক ঈশ্বরীয় কর্ম্ম।"

যুবরাজ কম্পনের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নাই। নিবেদন করিলেন, "মা, কৃপা ক'রে বল, কি তোমার আদেশ। এ দাস সাধ্যমত তা পালন ক'রবে।"

"বৎস, আমার আশ্রিত পাণ্ড্য রাজ্যের এক বড় অংশ কেড়ে নিয়েছে মাদুরার সুলতান। অবাধে চলছে সেখানে নির্ম্মম, বীভৎস অত্যাচার। ধর্ম্ম হতে যাচ্ছে দেশান্তরী। এ রাজ্যে মানুষকে টেনে আনা হয়েছে পশুত্বের গণ্ডীতে। মানবাত্মার করুণ আর্ত্তনাদ আর আমি সইতে পারছিনে, বৎস। তুমি আমার এ অঞ্চলকে মুক্ত কর, কাঞ্চীনগরে বসে আর কালহরণ ক'রোনা।"

"মা তোমার তো কিছুই অজানা নেই। বৃথা সময় আমি একটুও নষ্ট করছিনে। এতদিন আমার কেটেছে দক্ষিণের বিজয়নগর বিরোধী সাম্বুভরায়কে দমন করতে। সে কাজ সিদ্ধ হয়েছে। আমার প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ। এবার মাদুরা অভিযানের পথ হয়েছে প্রশস্ত। সর্ব্বোপরি আজ তোমার আদেশ পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

এক শাণিত খড়্গ সম্মুখে আগাইয়া দিয়া দেবী কহিলেন, "বৎস, তবে এই নাও মহামুনি অগস্তের দেওয়া দিব্যশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র। এর বলে অজেয় হবে তুমি।"

"জনশ্রুতি মতে, কুমার কম্পন মাদুরা আক্রমণে আর দেরী করেন নাই। স্বামী বিদ্যারণ্যের আশীষ এবং সদ্যলব্ধ দিব্য শক্তি এই বীর যোদ্ধাকে উদ্দীপিত করে। জয়লাভ হয় ত্বরান্বিত।

সময়ভরমের যুদ্ধে কম্পন মাদুরা বাহিনী বিধ্বস্ত করেন, তারপর অপর এক রণক্ষেত্রে সুলতানও নিহত হন। এভাবে মাদুরার চল্লিশ

বৎসরের অপশাসনের অবসান ঘটে। রামেশ্বর সেতুবন্ধ অবধি সারা দাক্ষিণাত্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে।

এবার রঙ্গনাথজীকে শ্রীরঙ্গমে আনিয়া মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করা হয়। হয়সালেশ্বর বিগ্রহও এতদিন ছিলেন স্থানচ্যুত, তাঁহারও নূতন অভিষেক সম্পন্ন হয় কন্নানুর-কুপ্পমের মন্দিরে।

বিদ্যারণ্যের অন্তর অপার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে প্রথমেই মনে পড়িল বন্ধুবর বেঙ্কটনাথের কথা। শ্রীরঙ্গনাথজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন হইতেই ভক্তপ্রবর বেঙ্কটনাথ শ্রীরঙ্গমে রহিয়াছেন। সানন্দে করিতেছেন তাঁহার ভজন সাধন ও ভক্তিশাস্ত্রের চর্চ্চা।

বিদ্যারণ্য তাঁহার কাছে দূত পাঠাইলেন। লিখিলেন, "বন্ধু, তোমার এতদিনের কাতর প্রার্থনা আর অশ্রুজল সার্থক হোল। প্রভু তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। আবার ফিরে পেয়েছ রঙ্গনাথকে। এ কিন্তু সম্ভব হয়েছে বিজয়নগরের রাজশক্তির সাহায্যে। এবার বোধ হয় তুমি স্বীকার করবে, আমার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের ব্রত বিফল হয়নি। আরো বোধহয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে, রঙ্গনাথজীর আশীর্ব্বাদ এ ব্রতের ওপর রয়েছে। এবার আবার নূতন ক'রে তোমায় আমন্ত্রণ জানাই বিদ্যানগরে এসে বসবাস করতে। আমি কিন্তু রাজসভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য মহাপণ্ডিত বেঙ্কটনাথকে চাইনে, তাঁকে চাই এ ধর্ম্মরাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। আমি নিজে অদ্বৈত বেদান্ত নিয়ে বসে আছি, তুমি এসে পড় তোমার দ্বৈত বেদান্ত নিয়ে। দ্বৈত আর অদ্বৈতবাদ দুই-ই প্রতিষ্ঠিত হোক দাক্ষিণাত্যের এই প্রাণকেন্দ্রে। হরি ও হরের মহামিলন দুচোখ ভরে লোকে দেখুক। ধর্ম্মরাজ্য বিজয়নগর হয়ে উঠুক সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের উৎসস্থল।"

বেঙ্কটাচার্য্য কিন্তু এবারও বিজয়নগরে যাইতে রাজী হন নাই। বৈরাগ্যবান মহাবৈষ্ণব উত্তরে জানান, "প্রভু রঙ্গনাথকে তাঁর ভক্তেরা আবার নিজেদের ভেতর ফিরে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন। এজন্য বারবার

আশীর্ব্বাদ জানাই বিজয়নগরের নৃপতিকে। শ্রীরঙ্গনাথের পাদোদক পান ক'রে, আর উঞ্ছবৃত্তি ক'রে এ দীন ব্রাহ্মণের বাকী জীবন কেটে যাক্, তবেই সে কৃতার্থ হবে। তোমার সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না, ভাই। নিজগুণে আমায় ক্ষমা ক'রো।"

স্বামী বিদ্যারণ্য ও রাজা বুক্ক রায় নিজেরা শৈব উপাসক হইলেও বিদ্যানগর রাজ্যে এসময়ে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন সঙ্কীর্ণতারই প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। ধর্ম্মান্ধতা ও গোঁড়ামি এ যুগে সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল, কিন্তু বিজয়নগরের শাসন কার্য্যে বুক্ক রায় দেখাইয়া গিয়াছেন অপূর্ব্ব উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা।[১]

শিলালেখ, ভাস্কর্য্য, মুদ্রা এবং সাহিত্যের তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায়, বিজয়নগরের পরবর্ত্তী শাসকেরাও ছিলেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, অথচ ধর্ম্মান্ধতা বা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁহাদের ছিল না। যে কোন ধর্ম্ম—তা সে এই দেশের শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব বা জৈনই হোক অথবা বিদেশাগত খৃষ্টান, ইহুদী ও ইসলামই হোক, তাঁহাদের কাছে প্রাপ্ত হইত নিরপেক্ষ ও উদার আচরণ। পর্য্যটক বারবোসা বিজয়নগর সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন, "রাজা সকলকেই সমান অধিকার দেন। এ রাজ্যে যে কোন ব্যক্তি, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান বা হিন্দু অবাধে গমনাগমন ও বসবাস করিতে পারে, এ জন্য কখনো কাহাকেও কোন তদন্ত বা হয়রানির সম্মুখীন হইতে হয় না।"

শৃঙ্গেরী মঠের পট্টাধিকারে দেখা যায়, স্বামী বিদ্যারণ্য সেখানকার ষড়্বিংশতি মঠাধীশ বা জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যরূপে বৃত হন। তিনি মঠাধ্যক্ষের এই কর্ম্মভার গ্রহণ করেন আচার্য্য বিদ্যাশঙ্কর ও ভারতী তীর্থের পরে।

বিদ্যারণ্যস্বামীর গুরুপরম্পরা সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়া গিয়াছে

১ দি হিষ্টরি এণ্ড কাল্চার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপল্—দিল্লী সুলতানেট: মজুমদার; পুসলকর—পৃ: ২৮০।

বটে, কিন্তু তাহা নিয়া গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক কম উঠে নাই। স্বরচিত জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর-এ তিনি ভারতীতীর্থকে গুরুরূপে নমস্কার করিয়াছেন। লিখিয়াছেন—

স ভব্যাদ্ ভারতীতীর্থযতীন্দ্রচতুরাননাৎ।
কৃপামব্যাহতাং লব্ধ্বা পরার্ধ্যং প্রতিমোহভবৎ ॥"

কিন্তু অপর গ্রন্থ, অনুভূতিপ্রকাশ-এ বিদ্যারণ্য স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছেন, বিদ্যাশঙ্কর তীর্থই তাঁহার গুরু—'সোহস্মান্ মুখ্যগুরুঃ পাতু বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ'।[১]

অনুমিত হয়, বিদ্যারণ্যস্বামী প্রথমে বিদ্যাতীর্থকেই গুরুরূপে বরণ করেন। তারপর গুরুর তিরোধান ঘটিলে গ্রহণ করেন ভারতীতীর্থের শিষ্যত্ব।

শৃঙ্গেরীর মঠাধীশ এবং অদ্বৈতবাদী দক্ষিণী সন্ন্যাসীদের নেতারূপে বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। বিদ্যারণ্যের অনুরোধে এই মহাবেদান্তী রাজা হরিহর ও বুক্ক রায়কে শৈবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। দুই ভ্রাতার জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার কল্যাণের জন্যই বিদ্যাতীর্থ নানারূপে সাহায্য করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

১৩৭৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে রাজা বুক্ক রায় সানন্দে উৎকীর্ণ করেন যে, এই মহাত্মার কৃপা প্রসাদেই অধিকৃত রাজ্য তিনি স্ববশে আনিতে পারিয়াছেন—

ক্ষৌণীং সাগরমেখলাং স কলয়ন্ ভ্রূক্ষেপমাত্রে স্থিতাম
বিদ্যাতীর্থ মুনেঃ কৃপাম্বুধিশশী ভোগাবতারোহভবৎ ॥

বিদ্যাতীর্থ ও ভারতীতীর্থের কাছে দীক্ষা ও সন্ন্যাস নিয়া স্বামী

১ বিদ্যাতীর্থ নিজে ছিলেন আচার্য্য পরমাত্মতীর্থের দীক্ষিত শিষ্য। নিজের রচিত রুদ্রপ্রশ্নভাষ্য গ্রন্থের পুষ্পিকায় গুরুদেবের কথা তিনি শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন

বিদ্যারণ্য শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া নেন শৃঙ্গেরী মঠের প্রবীণ বৈদান্তিক আচার্য্য শঙ্করানন্দকে।[১]

বিদ্যারণ্যের প্রতিভা ছিল বিস্ময়করূপে বহুমুখী। রাজনীতিতে তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। প্রশাসন কার্য্যেও তাঁহার দক্ষতা ছিল অসামান্য! আবার শাস্ত্রবিদ্ ও গ্রন্থকার হিসাবেও খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিল না।

সর্ব্বতোমুখী এই প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতার সঙ্গে তাঁহার জীবনে সমন্বিত হয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই ব্যক্তিত্বের ছাপ তিনি রাখিয়া যান।

তাই দেখি, যিনি সর্ব্বত্যাগী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, শৃঙ্গেরী মঠের কর্ণধার, শত শত ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর নেতা—তিনিই আবার বিজয়-নগরের স্থাপয়িতা, বিরাট সাম্রাজ্যের নিয়ামক, কূটনীতি ও সমরনীতিতে

একাধারে এমন উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদ্, সাধক দার্শনিক, কবি, বৈয়াকরণ, স্মৃতিসংগ্রহকার ও সর্ব্বদর্শনবেত্তা আর কোন ঐতিহাসিক পুরুষ এ দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়না।

বিদ্যারণ্য স্বামীর রচিত গ্রন্থের তালিকায় তাঁহার এই অমানুষী প্রতিভার পরিচয় মিলে।

বেদার্থ-প্রকাশ নামে চারি বেদের মহাভাষ্য তিনি সুপণ্ডিত ভ্রাতা

---

১ শাঙ্কর মতের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা হিসাবে শৃঙ্গেরী মঠের আচায্য শঙ্করানন্দ সে সময়ে প্রচুর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ অবধি এই মহাত্মা জীবিত ছিলেন। এই শিক্ষাগুরুকে বন্দনা করিয়া মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য লিখিয়াছেন—

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে
সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে।

(পঞ্চদশী)

স্বমাত্রয়ানন্দয়দত্র জন্তুন্ সর্বাত্মভাবেন তথা পরত্র।
যচ্ছঙ্করানন্দ পদং হৃদব্জে বিভ্রাজতে তদ্যতয়ো বিশন্তি।

(বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ)

সায়নাচার্যের সঙ্গে যুক্তভাবে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব অন্যান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের দীপিকা, বৃহদারণ্য বার্ত্তিক-সার, পরাশর মাধব (পরাশর স্মৃতির ভাষ্য), জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তর (পূর্ব্ব মীমাংসার টীকা), বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, অনুভূতি-প্রকাশ (শ্লোকাকারে রচিত বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ) অপরোক্ষানুভূতির (আচার্য্য শঙ্করের) টীকা, জীবন্মুক্তিবিবেক (সন্ন্যাসীর কর্ম্মাদি ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে) পঞ্চদশী (বেদান্তের বহুখ্যাত প্রকরণগ্রন্থ), কালমাধব (স্মৃতি শাস্ত্রের সংগ্রহ), ধাতুবৃত্তি ইত্যাদি।[১]

বিদ্যারণ্যের অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহার বেদান্ত প্রকরণগ্রন্থ 'পং আচার্য্য শঙ্কর ও সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির পরে এমন রসোত্তীর্ণ পদ্যে রচিত তাত্ত্বিক গ্রন্থ আর আত্মপ্রকাশ করে নাই। যতদিন মানব সভ্যতা থাকিবে, ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন মানবকে মুক্তির পথসন্ধান দিবে, পঞ্চদশীর আত্মজ্ঞানের তত্ত্ব ফুটিয়া রহিবে ধ্রুবনক্ষত্রের মত।

এই মহান গ্রন্থে বিদ্যারণ্য স্বামী শাঙ্করমত নানারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন অদ্বৈতবেদান্তের পরম তত্ত্ব। যে প্রতিভা ও মৌলিকতা ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, চিন্তাশীল মানুষমাত্রকেই তাহা বিস্মিত করে।

পঞ্চদশী গ্রন্থের গোড়াতেই 'তত্ত্ব বিবেক' পরিচ্ছেদে স্বামীজী ব্রহ্ম-সংবিদের স্বরূপ ঘোষণা করিতেছেন—

নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা

১ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ, সূতসংহিতার টীকা এবং শঙ্করবিজয় বিদ্যারণ্যের রচিত বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও আধুনিক গবেষকেরা ইহা স্বীকার করেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রী আর, নরসিংহাচার প্রমাণ করিয়াছেন, প্রথমোক্ত গ্রন্থ দুইটি মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের লেখনীপ্রসূত নয়। শঙ্করবিজয়ের ভাব ও ভাষা যেরূপ, তাহাতে ইহা বিদ্যারণ্যের মত মনীষীর রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন।

—এই জ্ঞান স্বপ্রকাশ। ইহার উদয় নাই, অস্ত নাই। ইহাই শাশ্বত চৈতন্য, ইহাই আত্মা। ইহার ভেদ নাই, তারতম্য নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি জ্ঞেয় জড়াংশই শাশ্বত জ্ঞানের ভেদ জন্মায়।

তাঁহার মতে, মায়া ও অবিদ্যা বিভিন্ন। ঈশ্বর এবং জীব দুই-ই প্রতিবিম্ব—আর ব্রহ্ম হইতেছেন বিম্ব।

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব দুই-ই উপাধিযুক্ত, কাজেই জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব— এই মতই শোভন ও যুক্তিসিদ্ধ।

শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মের চার প্রকার অভিব্যক্তির কথা বিদ্যারণ্য স্বামী উল্লেখ করিয়াছেন—কূটস্থচৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য। এক আকাশই যেমন উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, নীলাকাশ, জলাকাশ, মহাকাশ এবং মেঘাকাশরূপে প্রকাশিত, ইহাও তেমনি।

সর্ব্ব আধারভূত যে শুদ্ধচৈতন্য পর্ব্বতকূট বা পর্ব্বতশৃঙ্গের মত নির্ব্বিকার, তাহাই কূটস্থ চৈতন্য বা সাক্ষীচৈতন্য। এই সাক্ষী অথবা উদাসীন সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই কাম ক্রোধ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আবার সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা বা সমাধিতে এগুলি বিলীন হইয়া যায়।

সাক্ষীচৈতন্যের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া বিদ্যারণ্য স্বামী নৃত্য-শালার দীপের এক মনোজ্ঞ উপমা দিয়াছেন। গৃহস্বামী, অভ্যাগতগণ এবং নর্ত্তকী, সকলেরই রূপ ও সাজসজ্জা প্রকাশিত হয় দীপের আলোকে। সকলে নৃত্যসভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও দীপ আগেরই মত করিতে থাকে আলোক বিকিরণ। কূটস্থ চৈতন্য বা সাক্ষী-চৈতন্য যেন এই আলোক-উৎসারী দীপ। এখানে অহঙ্কার হইতেছে গৃহস্বামী, বিষয় সভ্যবৃন্দ, ইন্দ্রিয় সকল বাদ্যকর, বুদ্ধি লীলায়িত ভঙ্গিমাযুক্ত নর্ত্তকী। আর সাক্ষীচৈতন্যের উপমা দেওয়া হইয়াছে সেই দীপের সাথে—যাহার আলোকে সারা সভাগৃহ থাকে উদ্ভাসিত।

বিদ্যারণ্যের মতে, জীব যেমন সাক্ষী নয়, তেমনি ঈশ্বরেরও সাক্ষীত্ব নাই। কারণ, জীবের সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহ নির্বিকার নয়। আর ঈশ্বরও জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা। এই কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়া তাঁহাকে উদাসীন

বলা যায় না। কাজেই জীবত্ব ঈশ্বরত্ব রহিত যে পরম উদাসীন শুদ্ধ চৈতন্য নিত্য বিরাজমান, তাহাই হইতেছে প্রকৃত সাক্ষী।

অদ্বৈত বেদান্তীরা শ্রবণ মননাদি সাধনার উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁহাদের মতে, মোক্ষলাভের প্রধান পন্থা হইতেছে সাংখ্য বা বিচার। কিন্তু এপন্থা শুধু উত্তম অধিকারীরাই অনুসরণ করিতে পারে। বিদ্যারণ্য তাই অন্য উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভের কথাও বলিয়াছেন। এ উপায়—নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, নির্গুণ ব্রহ্ম—অবাঙ মনসোগোচর, মানুষের ধ্যান কল্পনায় তাহা কি করিয়া আসিবে? উপাসনাই বা কি করিয়া সম্ভব হইবে?

উত্তরে বিদ্যারণ্য বলেন—এ যুক্তি টিঁকে না। কারণ, তাহা হইলে বাক্যমনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভই বা কি করিয়া সম্ভব হয়? বাক্যমনের অতীত সেই পরম বস্তুকে যদি জানা যায়, তবে তাঁহার পরোক্ষ উপাসনা কেন করা যাইবে না? পরম ব্রহ্মকে লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত করিয়া মোক্ষার্থীরা পরোক্ষভাবে অবশ্যই উপাসনা করিতে পারে। ধ্যানদীপ-এ তাই তিনি বলিয়াছেন—

নির্গুণোপাসনং পক্বং সমাধি স্যাচ্ছনৈস্ততঃ।
যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥ (১২৬)

—অর্থাৎ নির্গুণ উপাসনাই পরিপক্ব হইয়া পরে সমাধিতে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব এই নির্গুণ উপাসনা হইতেই লাভ হয় নির্বিকল্প সমাধি।

চতুর্দ্দশ শতকের দক্ষিণ ভারত রাজনৈতিক সংঘাতে যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমনি আলোড়ন দেখা দেয় তাহার দার্শনিকতার ক্ষেত্রে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে মহাপ্রতিভাধর দুই আচার্য্য, রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ঘটে। দ্বৈতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্করমতের উপর পড়িতে থাকে প্রচণ্ড আঘাত। তারপর আসেন

সুদর্শনাচার্য্য ও বেঙ্কটনাথ। ইঁহাদের আবির্ভাবে রামানুজীয় বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ সারা দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠে। ভাস্করাচার্য্যের ভেদাভেদবাদও বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ কম করে নাই। তদুপরি প্রতিপক্ষরূপে আগাইয়া আসেন অক্ষোভ্য প্রভৃতি মধ্বাচার্য্যের অনুগামী আচার্য্যেরা। সকলে মিলিয়া বেদান্তীদের যখন কোণঠাসা করিতে চাহিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই আবির্ভূত হন বিদ্যারণ্য স্বামী। দৃঢ়হস্তে সাধননিষ্ঠা ও প্রতিভার বলে শাঙ্কর মতের পতাকা তিনি তুলিয়া ধরেন।

বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের বিচার বিশ্লেষণে বিদ্যারণ্য ভাস্করীয় মত পর্য্যুদস্ত করেন। পঞ্চদশীর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়াও পূর্ব্ব মীমাংসা, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদকে তিনি আরো তীব্রভাবে আক্রমণ করেন।

পঞ্চদশীর আলোকচ্ছটায় বেদান্তের ব্রহ্মাত্মবাদ নূতন করিয়া জন-মানসের সম্মুখে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরূপে বিদ্যারণ্য স্বীকৃতি লাভ করেন এবং এ স্বীকৃতি তাঁহাকে আনিয়া দেয় অতুলনীয় গৌরব ও অমরত্ব।

শৃঙ্গেরী মঠের পট্টাধিকারে দেখা যায়, স্বামী বিদ্যারণ্য ছিলেন সেখানকার ২৬তম মঠাধীশ—জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য। শুধু দাক্ষিণাত্য নয়, সারা ভারতের অদ্বৈত বেদান্তীরা এই শিবকল্প মহাপুরুষের নির্দ্দেশে পরিচালিত হইতেন। জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইত আচার্য্য শঙ্করের অবতারজ্ঞানে।

উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের সহিত কর্ম্মব্রতের অপরূপ মিলন দেখি বিদ্যারণ্যের মধ্যে। এই মহাজীবনের মূল্যায়ন করিতে গিয়া দার্শনিক-সাধক প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীজী লিখিয়াছেন—

"বিদ্যারণ্য একাধারে কর্ম্মী, ভক্ত ও জ্ঞানী। এরূপ সমন্বয় অতি বিরল। বিদ্যারণ্য জার্মান দার্শনিক হেগেলের মত ভাবোন্মত্ত হইয়া দেশ, জাতি, ভুলিয়া যান নাই। হেগেল জেনা যুদ্ধক্ষেত্রের অতি

নিকটে থাকিয়াও দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন। অপর দার্শনিক ফিক্‌টের মত দেশের চিন্তা বিদ্যারণ্যের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। ফিক্‌টে শিক্ষকরূপে 'অ্যান অ্যাড্রেস টু জার্মান নেশন'—জার্মান জাতির প্রতি আবেদন—লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত। কিন্তু বিদ্যারণ্য স্বামী মুসলমান শাসন বিধ্বস্ত করিয়া, দেশের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অক্লান্ত কর্ম্মী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ত্যাগের অপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন করেন। বিদ্যারণ্যের দার্শনিক মত কেবল তাঁহার গ্রন্থেই সংবদ্ধ ছিল না, পরন্তু তাঁহার জীবনেও প্রতিফলিত হইয়াছিল।"[১]

চতুর্দ্দশ শতকের শেষ পাদ। মাতুরা যুদ্ধের পর হইতে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর অজেয় হইয়া উঠিয়াছে। শুধু শক্তি ও সমৃদ্ধিতেই নয়, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিকাশেও বিদ্যারণ্যের স্থাপিত এই রাষ্ট্র সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের মূলে কাজ করিয়াছে প্রধানতঃ এই মহাসন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব, কর্ম্মশক্তি ও আত্মিক প্রেরণা।

বিদ্যারণ্য স্বামী এ সময়ে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ। শৃঙ্গেরী মঠে বসিয়া এতকাল ধরিয়া তাঁহার বড় সাধের ধর্ম্মরাজ্য তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। সযত্নে ঢালিয়াছেন তাহাতে অধ্যাত্মজীবনের প্রাণরস। এবার তাঁহার চমকপ্রদ জীবননাট্যে বিরতির পালা। কর্ম্মজীবন হইতে চিরতরে তিনি অবসর নিলেন, একান্তভাবে ডুবিয়া গেলেন আত্মজ্ঞানের চরম সাধনায়।

ভারতের শ্রেষ্ঠ বেদান্তপীঠ, শৃঙ্গেরী মঠের তিনি অধ্যক্ষ—সারা ভারতের বেদান্তী সমাজের মধ্যমণি। তাই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, জ্ঞানপন্থী সাধকেরা দলে দলে এখানে আসিয়া উপনীত হন, চাহেন মুমুক্ষার পথনির্দ্দেশ। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য, বিদ্যারণ্য স্বামীর

১ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী : বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

লোকোত্তর জীবনের ছায়ায় বসিয়া তাঁহারা হন কৃতার্থ। অনেকেরই জীবনে ঘটে বহুবাঞ্ছিত রূপান্তর।

শৃঙ্গেরী আর বিজয়নগরের মধ্যে রহিয়াছে দীর্ঘদিনের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ। তাই স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য নিয়া রাজা ও আমাত্যেরা মাঝে মাঝে মঠে উপস্থিত হন। কখনো বা এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের কাছে নির্দ্দেশ চাহিয়া পাঠান। কিন্তু আজকাল আর এসব দিকে বিদ্যারণ্যের ভ্রূক্ষেপ নাই। সহাস্যে এক এক দিন জিজ্ঞাসু রাজা ও মন্ত্রীদের স্মরণ করাইয়া দেন রাজর্ষি জনকের উক্তি—

কোটয়ো ব্রহ্মণো যাতা গতাঃ সর্গপরম্পরা।
প্রযাতাঃ পাংসুবদ্ভূপাঃ কা ধৃতি মম জীবিতে।

(যোগবাশিষ্ঠ)

—কোটি কোটি ব্রহ্মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কত সৃষ্টিরাজি হইয়াছে ধ্বংস, কত মহীপতি উড়িয়া গিয়াছে ধূলির মতো! আমার এ জীবনের উপর আস্থা তবে আর কেন?

মরলীলার শেষ দিনটি অবশেষে আসিয়া পড়ে। শুধু শৃঙ্গেরীর সাধনপীঠেই নয়, সারা দক্ষিণ ভারতে ঘনাইয়া আসে শোকের করুণ ছায়া। লক্ষ লক্ষ নরনারীর নয়ন হয় অশ্রুসজল।

ধর্ম্মধৃত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের যে পবিত্র ব্রত আচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যে এখনো পূর্ণরূপে উদ্‌যাপিত হয় নাই। আরব্ধ কর্ম্মযজ্ঞকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কোথায় তিনি আজ চলিয়াছেন?

শিষ্য ও সেবকের দল অন্তিম শয্যা ঘিরিয়া দাঁড়ান। একান্ত-সেবকটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "প্রভু, বেদান্তের মহাপীঠ এই শৃঙ্গেরীর জন্য, আপনার সৃষ্ট ধর্ম্মরাজ্য বিজয়নগরের জন্য, কি রইলো আপনার শেষ নির্দ্দেশ? এ দুটি সম্পর্কে অন্তরের কোন্ ইচ্ছা আপনি জানিয়ে যাচ্ছেন?"

আত্মজ্ঞানী মহাবৈদান্তিকের আননে ফুটিয়া উঠে স্মিতহাস্য। অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করেন—

ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্ময়ি।
কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সর্বং সংবিন্ময়ং ততম॥

—সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহাতে আমি নাই; এমন কিছুই নাই যাহা আমাতে নাই। সেই আমি অন্য কোন্ বস্তু আর কামনা করিব? আমার চতুর্দিকে ছড়ানো যত কিছু বস্তু, সবই যে পরম আমারই চেতনার ওতপ্রোত।

বেদান্তকেশরী বিদ্যারণ্যের কণ্ঠ নীরব হয়, আননে ফুটিয়া উঠে নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের প্রশান্তি। ধীরে ধীরে নয়ন নিমীলিত করিয়া আত্মজ্ঞানী মহাসাধক নিমজ্জিত হন চিরসমাধিতে, লাভ করেন তাঁহার বহুবাঞ্ছিত চিরনির্বাণ।

ভক্ত নামদেব

চতুর্দ্দশীর রাত্রি। আম্বোধিয়ার দেবী মন্দিরের চারিপাশ ঘিরিয়া নামিয়াছে থম্‌থমে ঘন অন্ধকার। এ অন্ধকারে কাহাকেও চিনিয়া নিবার উপায় নাই। শুধু প্রদীপের স্বল্প আলোকে চোখে পড়ে, একদল ভক্ত নরনারী নীরবে মণ্ডপতলে বসিয়া রহিয়াছে।

গহন অরণ্যের এক প্রান্তে এই মন্দির। তাই জনসমাগম প্রায়ই এখানে তেমন দেখা যায় না। কিন্তু আজ রহিয়াছে বিশেষ পুণ্যতিথি। এমনি তিথিতে পুণ্যার্থীরা দলে দলে আসিয়া জুটে, ভক্তিভরে বিগ্রহের পূজা দিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যায়।

অদূরে হঠাৎ শোনা যায় অশ্ব-ক্ষুরের খটাখট্ শব্দ। এ আবার কি? সবাই উৎকর্ণ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে এক তেজস্বী ঘোড়সওয়ার।

বড় রহস্যময় এই যোদ্ধৃবেশী পুরুষ! মাঝে মাঝেই তাহার দর্শন মিলে। মন্দিরে সে ঘোড়া ছুটাইয়া আসে, ভক্তি-ভরে পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন করে। দীনদুঃখীদের দু'হাতে বিলায় টাকাকড়ি। তারপর আবার হঠাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া মিলাইয়া যায় বনমধ্যে।

পরিচয় তাহার কাহারো জানা নাই। ভাবভঙ্গী দেখিয়া সাহস করিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। যেমনি আকস্মিকভাবে সে উপস্থিত হয়, তেমনি হয় অন্তর্হিত।

পাশের বটগাছের শাখায়, ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া লোকটি মন্দিরের সিঁড়িতে উঠিতে যাইবে, হঠাৎ কাণে পশে এক ভিখারী বালকের করুণ কান্না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে অধীর! জননী কত করিয়া বুঝান, কিন্তু ছেলেকে শান্ত করানো যায় কই?

যোদ্ধৃবেশী আগন্তুক থমকিয়া দাঁড়ায়। দেবদর্শনের শুরুতেই এ আবার কোন্ অলক্ষুণে বাধা!

আগাইয়া গিয়া রোষকষায়িতনেত্রে বালকের মাতাকে বলে, "এই রাত্তিরে কাঁদুনে ছেলেটাকে কেন এখানে টেনে এনেছো? যদি নিয়েই এসেছো, তো চুপ করিয়ে রাখতে পারোনা? এটা তোমার ঘর বাড়ী নয়, মন্দির। লোকে দেবতার পূজো দেবে, না বসে বসে ঐ অসভ্য ছোঁড়াটার নাকী কান্না শুন্‌বে?"

নারীর কণ্ঠ বেদনায় ভরা। উত্তর দেয়, "বাবা, ছেলেটাকে চুপ করিয়েই তো রাখতে চাই। কিন্তু তা পারছি কই? আর ওরই বা দোষ কি বল? আজ ছুদিন পেটে একটা দানাও পড়েনি। মন্দিরে এসে, প্রসাদ পাবার আশায় বসে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এবার আর ধৈর্য্য রাখতে পারছে না।"

"ছুদিন খাওয়া হয়নি! কেন? তোমরা কোথা থেকে আসছো, বলতো?"—লোকটির স্বুর এবার অনেকটা নরম।

"পোধ্‌না থেকে।"

"সে কি! সে যে অনেক দূরের পথ। নিজের গাঁ থেকে এতদূরে কেন চলে এসেছো?"

"সাধে কি আসতে হয়েছে বাবা? ছেলেটার কপাল মন্দ, তাই। দশখানা গাঁয়ের লোক জানে, আমাদের গোলা ভরা ধান ছিল, গোয়ালে ছিল গরু মোষ।"

"তবে সে সব ছেড়ে, কেন মরতে এলে এখানে?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নারী উত্তর দেয়, "বাবা, কি আর তোমায় বলবো, সে এক চরম দুঃখের কাহিনী। প্রায় একমাস আগে, এই ছেলের বাবা মারা যায়। সেদিন থেকে, আমার কপাল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতি বৈরীরা ষড়যন্ত্র শুরু ক'রে দিলো। জোর ক'রে করলো ভিটেমাটি ছাড়া। সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ্রয় হয়ে শেষটায় এ বালককে নিয়ে হলাম দেশান্তরী।"

"আহা! সব কথা আমায় খুলে বলতো। আগে বল, কি ক'রে তোমার স্বামীর মৃত্যু হলো?"

"রাজসরকারের সেনাদলে সে কাজ করতো। সেদিনকার রাতে সঙ্গে ছিল আরো চুরাশী জন সওয়ার। পোধ্‌নার জঙ্গলে এসে খাওয়া দাওয়ার শেষে কেউ বিশ্রাম করছে, কেউ ঘুমুচ্ছে, এমন সময় তাদের ওপর ডাকাত পড়লো। অতর্কিত আক্রমণে নিহত হ'ল সবাই। আমার স্বামীও প্রাণ হারালো।"

অভাগিনী রুদ্ধ কান্নায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তারপর নিজেকে কিছুটা সামলাইয়া নিয়া, আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিতে থাকে, "জ্ঞাতিরা আমাদের দূর ক'রে দিয়েছে ঘর থেকে। তাই আজ দুমুঠো অন্নের কাঙাল হয়ে এ ছেলেকে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরছি। আচ্ছা বাবা, বিনা অপরাধে পঁচাশী জন মানুষকে এক দিনে হত্যা ক'রে ফেলে, এমন দানবকে ভগবান কেন সৃষ্টি করেছেন? একথাটা কি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো? কত নারী বিধবা হলো, কত শিশু হলো সেদিন পিতৃহারা! এদের সবার দীর্ঘশ্বাসে সে নরপশু কি জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে না?"

দুঃখিনীর দীর্ঘশ্বাসে ভরা এই অভিশাপ আগন্তুকের উপর হানে তীব্র কষাঘাত।

মুহূর্ত্তমধ্যে মুখ তাহার পাণ্ডুর হইয়া উঠে, হাত পা থরথর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। সর্ব্বনাশ! এতো শুধু এ রমণীরই দুঃখের কাহিনী নয়, এ যে তাহার নিজেরই পৈশাচিক দুষ্কৃতির ইতিহাস!

সেদিনকার নরমেধ যজ্ঞের হোতা যে সে নিজেই। তাহারই চালিত দস্যুদল করিয়াছে এ হত্যাকাণ্ড। রক্তাক্ত, বীভৎস সেদিনকার সে দৃশ্য! মনে পড়িলে আজো শরীর শিহরিয়া উঠে।

বিধবার আকুল ক্রন্দন আর থামিতে চায়না। বক্ষে তাহার আজ তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে দুঃখের পাথার।

দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর পক্ষেও এই আর্ত্তি সহ্য করা কঠিন। হৃদয়ে কেবলি

জ্বলিতে থাকে অনুতাপের জ্বালা। সাপের মত কিল্‌বিল্‌ করিয়া উঠে চিন্তারাশি। কে জানে, তাহার পাপাচারের ফলে এই নারীর মত কত অভাগিনী হইয়াছে নিরাশ্রয়, কত সুখনীড় হইয়াছে বিনষ্ট।

নাঃ আর নয়। এই দুষ্কৃতিভরা জীবনের বোঝা আর সে বহিয়া বেড়াইবে না। লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যা, একটির পর একটি কত অপরাধই না সে করিয়াছে। ঝরিয়াছে অসহায় মানুষের অশ্রুজল। তারি সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে দীর্ঘশ্বাস আর অভিশাপ। তাই তো মাঝে মাঝে পাপ স্খালনের জন্য সে ছুটিয়া আসে আম্বোধিয়ার এই মন্দিরে।

কিন্তু দেবীর কৃপা কি মিলিয়াছে? পাপবাসনা কি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে? কই, তাহাতো হয় নাই? অর্থের লালসা, হত্যার উন্মাদনা তেমনি রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার থামিবার পালা। এই ঘৃণ্য জীবনের উপর টানিয়া দিতে হইবে বিরতির যবনিকা।

কাছেই দেয়ালের গায়ে ঝুলানো রহিয়াছে মন্দিরের সেবকদের শস্য কর্ত্তনের তীক্ষ্ণ কাটারি। ইহার একটি টানিয়া নিয়া মন্দিরের ভিতর সে ঢুকিয়া পড়ে। মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ কাটারি বসাইয়া দেয় নিজের গলায়। ফিন্‌কি দিয়া ছোটে রক্তধারা, ছড়াইয়া পড়ে বিগ্রহের অঙ্গে আর পূজার বেদীতে।

একি উন্মাদের কাণ্ড! মন্দিরের পুরোহিত ও সেবকেরা হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসে। শুরু হয় প্রবল ধস্তাধস্তি।

ক্ষত তেমন গভীর হইতে পারে নাই, লোকটি তাই এবারকার মত বাঁচিয়া গেল। কিন্তু আত্মহত্যার এই অপচেষ্টার মধ্য দিয়া বিগ্রহকেও যে সে অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছে!

সবাই মিলিয়া জোর করিয়া তাহাকে দেবীর মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

অনুশোচনার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে দস্যুর জীবনে। আসিয়াছে

রূপান্তরের মহালগ্ন। আম্বোধিয়া ছাড়িয়া তখনি সে বাহির হইয়া পড়ে পন্ধারপুরের পথে।

অন্তরে জাগে তীব্র বেদনা ও আর্ত্তি। কোথায় তুমি কলুষহারী প্রভু? কোথায় তোমার চির অমৃতলোক? দুই নয়নে অশ্রু ঝরার আর বিরাম নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু বিঠ্ঠলজীর চরণতলে সে গ্রহণ করে পরমাশ্রয়।

দুর্দ্ধর্ষ নরহত্যা পরিণত হয় নাম-প্রেমের মহাচরণে। নামকরণ হয়—নামদেব। অর্দ্ধ শতকেরও উপর, মারাঠার জনজীবনে এই মহাসাধক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করেন।

অনাথিনী বিধবার আকুল ক্রন্দন সেদিন উন্মোচিত করে ঐশী লীলার এক নূতনতর দৃশ্যপট। দস্যুর ঊষর জীবনে উৎসারিত করে ভক্তির ভাবগঙ্গা। এ গঙ্গায় অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হয় লক্ষ লক্ষ নরনারী।

জ্ঞানদেব ছিলেন মারাঠার ভক্তি-আন্দোলনের পথিকৃৎ, পন্ধার-পুরের বিঠ্ঠল সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা। বিরাট প্রতিভা ও ভক্তি ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তিনি। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনকে জনজীবনের সর্ব্বস্তরে বিস্তারিত করার সুযোগ তেমন পান নাই, কারণ, স্বল্লায়ু হইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন। উত্তর কালে তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনের ভার পড়ে নামদেব আর তুকারামের উপর।

জ্ঞানদেব গড়িয়া তোলেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আন্দোলন, আর নামদেব আনয়ন করেন শুদ্ধা ভক্তি। উভয় সাধকেরই এ ভক্তিধারার সিঞ্চনে সারা মহারাষ্ট্র তৃপ্ত হয়।

নামদেব বয়সে জ্ঞানদেব হইতে কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন। জ্ঞানদেবের অকাল মৃত্যুর পর তিনিই হন দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্ম্মের উৎস, আর এই ধর্ম্ম প্রায় চুয়ান্ন বৎসর তিনি প্রচার করিয়া যান। পন্ধারপুরের বিঠ্ঠল সম্প্রদায়কে দাঁড় করান দৃঢ় ভিত্তিতে।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই বৈষ্ণব-তীর্থরূপে পন্ধারপুর প্রসিদ্ধ হয়। জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ ও তুকরামের প্রচারের মধ্য দিয়া ছাড়াইয়া পড়ে প্রভু বিঠ্ঠলজীর মাহাত্ম্য। ইহার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। মহারাষ্ট্রে অধ্যাত্মজীবনে এমন এক ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করে যাহা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে বৈষ্ণবীয় ভক্তির অধিকার দেয়।

পন্ধারপুরে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন হইতে কিন্তু প্রমাণিত হয়, প্রাচীনকালে এখানে শৈব উপাসকদের প্রভাবই ছিল বেশী। অনেকের মতে, এখানকার তীর্থাধিপতি বিগ্রহও আদিতে ছিলেন শিব।

প্রাচীন মন্দিরের প্রধান পূজারী ছিলেন আচার্য পুণ্ডলিক। কর্ণাট হইতে তিনি এস্থানে আসেন এবং অসাধারণ যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া চারিদিকে খ্যাত হইয়া উঠেন।

আচার্য্য পুণ্ডলিক কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই উপাসক ছিলেন। তবে উত্তরকালে বিশেষ করিয়া পন্ধারপুরের কৃষ্ণবিগ্রহ বিঠ্ঠলজীর মাহাত্ম্যই তিনি প্রচার করিতে থাকেন। ভক্তিবাদী বিঠ্ঠল সম্প্রদায় ইঁহারই নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া উঠে এবং ভক্তিবাদের প্রচার ও নামকীর্ত্তনে ব্রতী হয়।[১]

পরবর্ত্তীকালে ভক্ত নামদেবের সময়েই পন্ধারপুরের এই কীর্ত্তন-সমাজের মর্য্যাদা ও প্রভাব বাড়িয়া যায়। এখানকার সাধকদের কেন্দ্র করিয়া ভক্তির প্রবাহ দিকে দিকে ছড়াইতে থাকে।

১২৭০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র গ্রাম নরসিংহপুরে নামদেব

---

১ এই প্রসঙ্গে পন্ধারপুর বিগ্রহ বিঠ্ঠলজী সম্পর্কে ডক্টর পি, আর ভাণ্ডারকরের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, কৃষ্ণবিগ্রহ বিঠ্ঠলজীর নামের অন্যতম বিশেষণ পাণ্ডুরঙ্গ বা শুভ্রবরণ। এই বিশেষণের মধ্য দিয়া বিঠ্ঠল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ প্রচার করিয়াছেন যে, শিব ও কৃষ্ণ একই পরমতত্ত্বরূপে বিরাজমান। দ্রঃ মিষ্টিসিজম্ ইন মহারাষ্ট্র—আর, ডি, রানাড়ে: পৃঃ ১৮৩

হন। কোন অভিজাত বা বিত্তবান পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। পিতা দামাশেট নিম্নবর্ণের এক নগণ্য দরজি। হাটে বাজারে নিজের সেলাই করা জামাকাপড় বিক্রয় করিয়া কোনমতে তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র দরজি দামাশেট ছুটিয়া যান ব্রাহ্মণ পাড়ায়।

বাবাজী এখানকার এক প্রসিদ্ধ গণৎকার। গ্রামে কোন শিশু জন্মিলেই লোকে তাঁহার কাছে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খড়িপাতি নিয়া বসেন, বলিয়া দেন শিশুর ভবিষ্যৎ।

দামাশেট প্রণাম করিয়া কহিলেন, "বাবাজী, দয়া ক'রে এ দাসকে বলে দিন, ছেলেটি আমার প্রকৃত মানুষ হবে তো? দীর্ঘজীবী হবে তো? দুঃখে দারিদ্র্যে এমনিতেই তো দিন চলছেনা, তার ওপর ছেলে যদি সৎপথে না থাকে, দুটো পয়সা রোজগার না করে, তা হলে বুড়ো বয়সে দাঁড়াবো কোথায়? আর স্বল্পায়ু যদি হয়, সে আঘাতই বা সহ্য করবো কি ক'রে?"

গণনা শুরু হয়। কিছুক্ষণ বাদে বাবাজী স্মিতহাস্যে কহেন, "দামাশেট, তুমি দেখ্‌ছি মহা ভাগ্যবান। তোমার এ ছেলে হবে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। ভেবোনা, দীর্ঘজীবনও সে পাবে।"

"কাঙালের ঘরে আসবে এতো ধন দৌলৎ? বাবাজী, এ আপনি কি বলছেন? ভালো ক'রে দেখুন। ভুল হয়নি তো?"

"না বাবা, গুরুকৃপায় গণনায় কখনো আমার ভুল হয় না। তবে কি জানো, তোমার ছেলে যে ধরণের ধনরত্ন আনবে, তা দিয়ে তোমার বৈষয়িক দুঃখকষ্ট কখনো ঘুচবে না। এ জাতক অধিকারী হবে অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্য্যের। অতুল ভক্তিধন সে অর্জ্জন করবে। ভক্তিচন্দনে চর্চ্চিত ক'রে গাথবে অগণিত অভঙ-পদের মালা। এ পবিত্র মালা কণ্ঠে প'রে তৃপ্ত হবে দেশের জনগণ।"

পুত্র বিত্তবিষয়ের মধ্যে জড়িত হইবে না, ধন উপার্জ্জনে থাকিবে

তাহার বিতৃষ্ণা। বেশ তো, তাহাই যদি বিধিলিপি হইয়া থাকে তো দামাশেট মনে কোন খেদ রাখিবেন্ না।

দামাশেট দরিদ্র গৃহস্থ বটে, কিন্তু টাকা কড়ির লোভ তাঁহার নাই। সৎপথ হইতে একটি দিনের তরেও তাঁহাকে কেহ বিচ্যুত হইতে দেখে নাই। উত্থানে পতনে, সুখে দুঃখে ভগবানের চরণেই চিরদিন আত্মসমর্পণ করিয়া আছেন। পুত্র বিত্তের অধিকারী নাই-বা হইল? সে সৎ হোক, ধর্ম্মপথে থাকুক, তবেই হইবে দামাশেটের তৃপ্তি।

গণৎকারের এই ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু ফলিতে দেখা যায় নাই। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বালক মহা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। তারপর সংসর্গ-দোষে পরিণত হয় এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুতে। নরঘাতকরূপে এ অঞ্চলে কুখ্যাত হইয়া উঠে।

পুত্রের কুকীর্ত্তির কথা প্রায়ই বৃদ্ধ দামাশেটের কাণে আসে। সারা অন্তর ব্যথায় ভরিয়া উঠে। ভগবানের চরণে আর্ত্তি জানানো ছাড়া আর যে তাঁহার করার কিছু নাই।

আম্বোধিয়া মন্দিরের সেদিনকার ঐ অশ্বারোহীই দরজী দামাশেটর পুত্র সেই দস্যু। আর্ত্ত বিধবা আর তাহার স্বামীহন্তার সেদিনকার ঐ নাটকীয় সাক্ষাৎ ঘটায় এক অঘটন। দস্যুজীবন হইতে বাহির হইয়া আসে এক পরম বৈষ্ণব।

পন্ধারপুর বিঠোবা-মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এ সময়ে ভক্তিসাধকদের যে মধুচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, নামদেব আত্মপ্রকাশ করেন তাহারই মধ্যমণিরূপে।

জ্ঞানদেবের অপুর্ব্ব ভক্তিরসাশ্রিত রচনা 'জ্ঞানেশ্বরী' এ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, বিঠ্ঠল সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপেও তিনি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। ভক্তি-আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পন্ধারপুরে সমাগত হইতেছে বিশিষ্ট সাধকের দল। নামদেবও আসিয়া এই সঙ্গে যোগ দিলেন।

পাপ,কলুষময় যে জীবন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এজন্য তরুণ ভক্ত নামদেবের চেষ্টার অবধি নাই।

দিনের পর দিন অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয় তাঁহার সংস্কারের বীজ। প্রভু বিঠ্ঠলজীর রূপামৃত পানে, আর নাম সঙ্গীতে থাকেন তিনি সদা বিভোর। কৃচ্ছ্র ব্রত, ধ্যানজপ ও স্তুতি কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন আগাইয়া চলে দুশ্চর সাধনা।

মনপ্রাণ দিয়া নামদেব ভজন পূজন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু প্রভুর কৃপা লাভের সৌভাগ্য হয় কই? বারবার মনে জাগে আলোড়ন, চিন্ময়ধামের দুয়ার আজো তো নয়ন সমক্ষে উন্মুক্ত হইতেছে না।

সেদিন আরতি ও নৃত্য-কীর্ত্তন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, মন্দিরের অলিন্দে বসিয়া গিয়াছে আনন্দের হাট।

পরমভাগবত জ্ঞানদেব ভাবাবিষ্ট। অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে গোরা কুম্হার, সম্বৎ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্ত সাধকের দল। সাধনা ও সিদ্ধির নানা তথ্য এবং তত্ত্ব এই আসরে আলোচিত হইতেছে।

গোরা কুম্হার পন্ধারপুর সমাজের এক সর্ব্বজনমান্য ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ। এ অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এই প্রবীণ সাধকের সিদ্ধাইরও খ্যাতি আছে প্রচুর। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক ভক্ত আব্দারের সুরে তাঁহাকে কহিলেন, "গোরা চাচা, একটা প্রশ্ন আমার রয়েছে। কৃপা ক'রে যদি উত্তর দেন, তবে নিবেদন করি।"

"সে কি কথা বাবা, যে দুটো দিন বেঁচে আছি, তোমাদের কল্যাণ ক'রেই যে যেতে চাই। বল বল, কি তোমার প্রশ্ন," সস্নেহে ভক্তটির দিকে তাকাইয়া গোরা উত্তর দেন।

লোকটি চতুর। হাসিয়া বলে, "নগণ্য লোকের এ এক অতি নগণ্য প্রশ্ন, গোরা চাচা। কিন্তু কথা দিতে হবে—আপনি এর উত্তর আমায় দেবেনই। প্রতিশ্রুতি না পেলে আর এগুবোনা।"

গোরা হাসিয়া কহেন, "আচ্ছা বাবা, বল। কথা দিচ্ছি সাধ্যমত জবাব অবশ্যই দেবো।"

"পন্ধারপুরের এই ভক্তসভায় বিশিষ্ট সব সাধকেরাই রয়েছেন। কিন্তু এঁরা ভাগবত সাধনার কোন্ স্তরে কে অধিষ্ঠিত, বিশেষ ক'রে ভক্তিসিদ্ধ হয়েছেন কারা, তা আমাদের খুলে বলুন।"

"এর কোন প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।"—গোরার মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠে।

"আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ। আপনার মুখ থেকে এ তথ্য জেনে নিতে পারলে আমাদের সুবিধে হয়—এই নূতন সাধকদের মধ্যে যাঁরা কৃতী, তাঁদের চরণে শরণ নিয়ে ধন্য হতে পারি।"

"এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার, বাবা! প্রকাশ্যে করতে হবে প্রভুর সাধকদের যাচাই? না—না, তা হয়না, এ যে ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়! আর কোন প্রশ্ন থাকে তো বল?"

"মার্জ্জনা করুন, গোরা চাচা। সত্যি বলছি, আমার এই প্রশ্নে ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই। সংসারের তাপদুঃখ ক্লিষ্ট পথিক আমরা। সঠিকভাবে জেনে রাখতে চাই—পথের বাঁকে বাঁকে কোথায় আছে বনস্পতির ছায়া। শরণ-ধর্ম্ম ছাড়া আমাদের মত জীবের উপায় কই? গতি কই? তাই ঐ আশ্রয়দাতাদের চিনে রাখতে চাই।"

গোরা এবার মৃদু হাসলেন। ধীরকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার কথায় যুক্তি আছে কি নেই তা নিয়ে আর বিচার করবো না। কারণ, তোমায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলে আমি আজ আটকে গেছি। বেশ, এখানকার সাধকদের সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু বলবো। কিন্তু বাবা, জেনে রেখো, আমি কুমোরের ছেলে, কোন্ হাঁড়ি আগুনের তাপে কি রকম পুড়েছে—তাই শুধু বলতে পারি।"

কিছুক্ষণ নয়ন মুদিয়া থাকিয়া গোরা কুম্হার অবলীলায় বলিয়া দিলেন, কে কোন্ অবস্থা লাভ করিয়াছেন।

জ্ঞানদেব প্রভৃতি সাধকদের প্রশংসা করার পর তিনি কহিলেন,

"বিঠ্‌ঠল সম্প্রদায়ের মধ্যে নবীন ভক্ত নামদেবই রয়েছে এখনো কিছুটা কাঁচা। প্রথম জীবনের সংস্কার আর দেহাত্মবুদ্ধি এখনো তার যায়নি—ভক্তিসাধনার আধার হিসাবে অর্জ্জন করেনি উপযুক্ত সামর্থ্য।"

সভার এককোণে, নামদেব ভক্তি-নম্রচিত্তে করজোড়ে বসিয়া আছেন। বর্ষীয়ান, সিদ্ধ সাধক গোরার এই মন্তব্য তীক্ষ্ণ শায়কের মত তাঁহার বুকে গিয়া বিঁধিল। সারা মুখ হইয়া উঠিল পাণ্ডুর।

গোরা কুম্‌হার শক্তিমান মহাপুরুষ। সবাই জানে, তাঁহার কথা অভ্রান্ত। নামদেব তখনি ভাবিতে বসিলেন—সত্যিই তো, জীবনে তাঁহার অমৃতলোকের বার্ত্তা আজো পৌঁছে নাই। আকুল হইয়া কত কাঁদিতেছেন, কিন্তু প্রভু বিঠোবা তো দর্শন দিতেছেন না। হৃদয় আজো ভাগবত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই!

অন্তরে জাগিয়া উঠে তীব্র অনুশোচনা। যে অমৃত আস্বাদন করার জন্য এত কৃচ্ছ্র ব্রত, এত জপতপ করিলেন, ভাগ্যদোষে সবই কি ব্যর্থ হইয়া গেল?

অন্তর্দ্দাহ ও নৈরাশ্যে নামদেব মুহ্যমান হইলেন।

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়। ধর্ম্মকথা ও আলোচনার শেষে একে একে সবাই মন্দির ত্যাগ করিয়া যান।

নামদেব নতশিরে গিয়া দাঁড়ান ভক্তচূড়ামণি জ্ঞানদেবের সম্মুখে। কাঁদিয়া কহেন, "প্রভু, বড় আশা ক'রে বিঠ্‌ঠলজীর চরণে আমি শরণ নিয়েছিলাম। অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে ডেকেছি তাঁকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। করেছি কত কৃচ্ছ্র-সাধন। কিন্তু কই, কৃপা তো আজো পেলাম না? আপনি একটু মুখ তুলে চান। দীক্ষা দিয়ে এ অধমের প্রাণ বাঁচান।"

স্নেহপূর্ণ স্বরে জ্ঞানদেব কহিলেন, "ভাই, শান্ত হও। বিঠোবার আঙিনায় পড়ে আছো। তোমার আবার ভয় কি? আমার থেকে যা সাহায্য পাবার তা সব সময়ই তুমি পাবে। কিন্তু ভাই, তোমার

চিহ্নিত গুরু আমি নই। তোমায় যেতে হবে পরমভাগবত বিশোয়া খেচরার কাছে। তাঁর কাছ থেকেই মন্ত্র দীক্ষা নিতে হবে। তবেই তোমার জীবনে উৎসারিত হবে ঐশী প্রেমের অমৃত-নির্ঝর।'

সাধক বিশোয়া খেচরা আগে ছিলেন জ্ঞানবাদী। জ্ঞানদেবেরই কৃপায় কিছুদিন আগে তিনি রূপান্তরিত হইয়াছেন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে।

অচিরে নামদেব বার্সি গ্রামে, বিশোয়ার কাছে, উপনীত হন। সাশ্রুনয়নে মাগেন মহাত্মার কৃপা।

করজোড়ে মিনতি জানাইয়া কহেন, "বাবা, নিজের আমার সুকৃতি বলতে কিছু নেই। অধম, দুরাত্মা আমি। সারা জীবন কেটেছে দস্যুবৃত্তি ক'রে। এমন সাহস নেই যে, আপনার কৃপা ভিক্ষা করি। দয়াল জ্ঞানদেব আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে। কিন্তু বাবা, আমার পাপের কলঙ্ক মুছে যাবে তো? পাবো তো বিঠ্‌ঠলজীর কৃপা-প্রসাদ?"

ভাবাবিষ্ট বিশোয়া খেচরা ধীর পদে তাঁর দিকে আগাইয়া আসেন। তখনি রচনা করেন এক অভঙ্। এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া নামদেবের প্রশ্নের উত্তর মিলে:

—'নিষ্ঠাভরে ক'রে যাও শ্রীভগবানের ধ্যান, পর্ব্বতপ্রমাণ পাপের স্তূপও যে তাতে হয় ভস্মীভূত। এই ধ্যানেরই মাধ্যমে সাংসারিক জীবনের যত কিছু পাপ কলুষ নিঃশেষে যাবে ধুয়ে মুছে। বিশোয়ার বাণী শোন, হে নামদেব, সৌভাগ্যের তোমার থাকবে না সীমা, যদি পাও এই ভগবৎ-সরণির সন্ধান!'—অভঙ ৩।

নামদেবের দেহ তখন প্রেমভক্তির রসাবেশে ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, নয়নে ঝরিতেছে পুলকবারি। নিবেদন করিলেন, "বাবা, এ সন্ধান যে তোমাকেই বলে দিতে হবে। তোমার কৃপালাভের জন্যই তো এখানে আজ এমন ক'রে ছুটে আসা?"

"ভয় নেই, নামদেব। তোমার অন্তরে আজ ভগবৎ-প্রেমের যে আগুন জ্বলেছে, অচিরে তাতে দগ্ধ হবে যত কিছু অজ্ঞান আর অহঙ্কার। নির্ম্মোহ, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়বেদীতে সানন্দে এসে বসবেন বিঠ্ঠলজী। বৎস, এ কাজে সাহায্যের জন্য তোমায় আমি দীক্ষা দেব। আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার পরম প্রাপ্তি হোক্।

মহাপুরুষের দীক্ষা ও আশীর্ব্বাদের ফল ফলিতে দেরী হয় নাই। বার্সি গ্রামে বসিয়া নামদেব যে সাধনায় ব্রতী হন, তাহা সার্থক হইয়া উঠে। বিশোয়ার এক অভঙে ইহার ইঙ্গিত পাই :

—'বিশোয়া খেচরার কাছ থেকে শোনা যায় আসল তত্ত্ব। তাঁর দৃষ্টির সামনে, সারা বিশ্বচরাচরে দীপ্যমান রয়েছেন তাঁর পরম প্রভু। এ বিশ্বের জলে আর স্থলে, প্রস্তরে আর বৃক্ষ-লতায়, পিপীলিকা থেকে সর্ব্বোত্তম জীবের মধ্যে রয়েছেন তিনি ওতপ্রোত। বিশোয়া খেচরা করছে ঘোষণা—সারা বিশ্বই হচ্ছে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি। এই উপলব্ধির মহামন্ত্রই দিয়েছে সে নামদেবের কাণে, নামদেবের শিরে রেখেছে নিজ হস্তের কল্যাণ পরশ, অপসারিত করেছে তার খণ্ডবোধ, টেনে তুলেছে তাকে একীভূত পরম রসসত্তায়। ভাগবত রসের আনন্দে উচ্ছল হয়ে বিশোয়া বলছে আজ সবাইকে—প্রভু জ্ঞানদেবের প্রেমের শিখায় একদিন সে জ্বালিয়ে নিয়েছিল তার সাধন জীবনের দীপালোক, সেই আলোকেরই পুণ্য পরশ আজ সে বুলিয়ে দিল ভক্ত নামদেবের জীবনে।'—অভঙ ৪।

প্রেমভক্তির অপরূপ আলোকের দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠে নামদেবের সাধনজীবন। অচিরে চিন্ময় লোকের দুয়ার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, বিশোয়ার কৃপায় হন আপ্তকাম। ভক্তিসিদ্ধ তরুণ সাধকের দিব্য দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র স্ফুরিত হইতে থাকে শ্রীভগবানের রসময়, নয়নাভিরাম রূপ।

বার্সি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নামদেব গোরা কুম্হারের কাছে

গিয়া উপস্থিত হন। নিবেদন করেন, বিশোয়া খেচরার কৃপা তিনি পাইয়াছেন। দীর্ঘ কৃচ্ছ্র ব্রত ও সাধনার ফলে লাভ করিয়াছেন দিব্য অনুভূতি। এবার তিনি বর্ষীয়ান মহাপুরুষ গোরার আশীর্ব্বাদ প্রার্থী।

ভক্তপ্রবর গোরার রচিত এক অভঙ-গানে এই সাক্ষাতের তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে :

- -'ভক্ত জ্ঞানদেব আর নামদেবের সম্মুখে বসে গোরা একদিন পরখ করেছিলেন সাধুদের, যাচাই করেছিলেন তাঁদের অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষ। নামদেবকে তখন তিনি বলেছিলেন—কাঁচা ভাণ্ড। কিন্তু এবার যখন সে উপনীত হলো তাঁর কাছে, প্রসন্নতায় ভরে গেল গোরার হৃদয়। নামদেবকে বললেন ডেকে,—গোরা আর নামদেবে নেই কোন প্রভেদ। আরো জানিয়ে দিলেন নামদেবকে,—তাঁর সমগ্র সত্তা প্রতিফলিত হয়েছে আয়ত দুটি নয়নে, ভাগবত জীবনের উপলব্ধি ঝলমলিয়ে উঠেছে নয়নতারায়।'—অভঙ ১।

প্রসন্নোজ্জ্বল হাসি হাসিয়া গোরা কুম্‌হার নামদেবকে বুকে টানিয়া নিলেন, দিলেন সাধনপথের নূতনতর পাথেয়।

গোরার স্বরচিত একটি অভঙ হইতে প্রমাণিত হয়, ভক্ত নামদেব তাঁহার নিকট হইতেও অধ্যাত্মসাধনার নিগূঢ় নির্দ্দেশ কিছুটা গ্রহণ করিয়াছিলেন :

—'সাধক গোরা তার কাণ ভরে শুনেছে অনাহত ধ্বনি। সানন্দে ঘোষণা করছে সে এই জয়গৌরব। স্বয়ং বেদও পরম প্রভুর বর্ণনায় হয়নি সমর্থ, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই অন্তহীন প্রবাহের সম্মুখে। গোরা কুম্‌হার নামদেবকে ডেকে বলেছে—ওগো এসো, এই স্রোতে কর স্নান, তৃপ্ত হও দিব্যলোকের অমৃত-রসে।'—অভঙ ৩।

পন্ধারপুর ভক্তসমাজের অগ্রণী সাধকরূপে জ্ঞানদেব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। বিঠ্‌ঠল ভক্ত সমাজের তিনি অবিসম্বাদিত নেতা। কৃপা করিয়া তিনিই সেদিন নামদেবকে বিশোয়া খেচরার কাছে দীক্ষা নিবার

জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নামদেব তাই স্থির করিলেন, এবার হইতে স্থায়ীভাবেই পন্ধারপুরের প্রেমভক্তিময় পরিবেশে থাকিবেন। পরমানন্দে দিন কাটিবে জ্ঞানদেবের পবিত্র সঙ্গে।

ইষ্টমন্ত্র জপ, বিঠ্ঠলজীর নাম কীর্ত্তন আর বৈষ্ণবীয় দৈন্যের সাধনা —জ্ঞানদেবের নির্দ্দেশে এই তিন ধারায় বহিয়া চলে ভক্ত নামদেবের সাধনজীবন।

জ্ঞানদেবের মহান গ্রন্থ জ্ঞানেশ্বরী ও অমৃতানুভব-এর খ্যাতি তখন ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পন্ধারপুরের বিঠ্ঠল ভক্তদের সাথে মিলিয়া তিনি উৎসারিত করিতেছেন প্রেমভক্তি ও নাম কীর্ত্তনের রসস্রোত। দিক্‌পাল ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তিনি সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত। এ সময়ে তাই দেশের নানা স্থান হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিতে থাকে।

তীর্থ দর্শনের জন্য জ্ঞানদেব আগে হইতেই উৎসুক ছিলেন। এবার সুযোগমত একদিন বাহির হইয়া পড়েন পরিব্রাজনে। সঙ্গে চলেন গোরা, বিশোয়া খেচরা, সম্বৎ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধক।

নামদেবও ছিলেন এই পরিব্রাজকদের সঙ্গে। ভারতের প্রধান তীর্থ ও তপস্যাক্ষেত্রগুলি দর্শনের সুযোগ পাইয়া অন্তর তাঁহার অপার তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠে।

পন্ধারপুরে ফিরিয়া আসার পর জ্ঞানদের বেশীদিন ইহজগতে বাস করেন নাই। তাঁহার তিরোধানের পর হইতে বিঠ্ঠল সমাজের নেতারূপে চিহ্নিত হন ভক্তশ্রেষ্ঠ নামদেব। এ সময় হইতে ভক্তি-আন্দোলন পরিগ্রহ করে নূতন রূপ, নূতন প্রাণশক্তি।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পন্ধারপুর সাধন কেন্দ্রে অবস্থিত থাকিয়া এই সিদ্ধ মহাপুরুষ মহারাষ্ট্রের ভাগবত সমাজকে পরিচালিত করিতে থাকেন।

জ্ঞানদেব ও নামদেব দেশের ভক্তি আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিয়া

গিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের প্রচারিত ভক্তিবাদের তত্ত্ব ও আদর্শের মধ্যে পার্থক্য অনেকটা ছিল। জ্ঞানদেব তাঁহার রচনা, উপদেশ ও জীবনলীলার মাধ্যমে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করেন, আর নামদেব জোর দেন শুদ্ধাভক্তি, নামতত্ত্ব ও নামকীর্ত্তনের উপর।

নামদেবের আরো এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্ম্মে তিনি আনয়ন করেন এক ব্যাপক সর্ব্বজনীন চেতনা। এই চেতনা উদ্বোধিত হওয়ার ফলে ভক্তির প্রবাহ ছড়াইয়া পড়ে সমাজের সর্ব্বস্তরে।

জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকেই এই ভক্তি সাধনায় নামদেব আহ্বান জানান। এই আহ্বান শুধু মহারাষ্ট্রেই নয়, সারা দক্ষিণ ভারতেই সাড়া জাগাইয়া তোলে।

তখনকার দিনে পন্ধারপুর ছিল মহারাষ্ট্রের দেওগিরি রাজ্যের অন্তর্গত। নামদেনের অভ্যুদয় কালে এই দেওগিরির রাষ্ট্রজীবনে দেখা দেয় এক বড় দুর্দ্দৈব।

১৩০৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর এই রাজ্য আক্রমণ করেন। খিলজী বাহিনীর আঘাতে সারা দেওগিরি বিপর্য্যস্ত হয়, সর্ব্বত্র উঠে তীব্র হাহাকার।

রাজা রামদেব রাও বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হন। ছয়মাস কাল সেখানে থাকার পর খিলজী সম্রাটের করদ রাজারূপে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। দুশ্চিন্তা ও হতাশায় জর্জ্জরিত রামদেব রাও-এর মৃত্যু ঘটে ইহার তিন বৎসর পরে। অতঃপর দিল্লীর সুলতান দেওগিরি নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া নেন।

রাষ্ট্রীয় জীবনের এই বিপর্য্যয় মহারাষ্ট্রের সমাজ-জীবনকেও চঞ্চল করিয়া তোলে। সর্ব্বত্র দেখা দেয় অস্বস্তি, ভীতি আর হতাশা।

এই দুর্য্যোগের দিনেই নামদেবের আবির্ভাব। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আর ভাগবত জীবন সাধারণ মানুষের জীবনে বুলাইয়া দেয় সান্ত্বনার

অমৃত প্রলেপ, সঞ্চারিত করে ভাগবত বিশ্বাসের শক্তি ও উদ্দীপনা। মহারাষ্ট্রের পথে প্রান্তরে, প্রতি জনপদে, গীত হইতে থাকে তাঁহার মধুস্রাবী অভঙ সঙ্গীত।

নামদেব ও তাঁহার সমকালীন সাধকদের ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে মহারাষ্ট্রের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির গবেষক, অধ্যাপক পটবর্দ্ধন লিখিতেছেন –

"ভক্তির দুয়ার এ সাধকেরা সদাই রাখিয়াছিলেন সর্ব্বজনের জন্য উন্মুক্ত। যে-ই একবার ইহার ভিতরে প্রবেশ করিত, অমনি সে গৃহীত হইত অন্যতম ভ্রাতারূপে। শুধু তাহাই নয়, ভক্ত সাধকরূপেও মর্য্যাদা তাহার অমনি বাড়িয়া যাইত। সন্ত বলিয়া লোকে তাঁহাকে ডাকিত। গরুড়ধ্বজা, কীর্ত্তন-সামিয়ানা ও পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া, করতাল হাতে বিঠ্‌ঠলজীর নাম একবার উচ্চারণ করিলেই সে চিহ্নিত হইত ভাগ্যবান ভক্তরূপে। এই কীর্ত্তনসভার আকাশ বাতাস ছিল পরম পবিত্র। সমগ্র স্থানটিতে বহিয়া যাইত স্বর্গীয় নিঃশ্বাস, আর সকলেই ছিল এক পর্য্যায়ের। মানুষে মানুষে কোনরূপ তারতম্যের ভাব ছিল অচিন্ত্যনীয়। সত্যকার প্রেম, অকৃত্রিম প্রেম, এই ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল বিরাজিত—তাই সেখানে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধনের পার্থক্য করার প্রশ্ন উঠিত না। সবাই ছিল সমধর্ম্মী।

"বৈষম্যের মনোভাব এখানে ছিল বিলুপ্ত। তাছাড়া, অহঙ্কার আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের ভেদবুদ্ধি বা এককেন্দ্রিকতা জীয়াইয়া রাখার কোন উপায় ছিল না। যে কোন মানুষ—তা সে দুর্ব্বল, রোগক্লিষ্ট, খঞ্জ বা অন্ধ যাহাই হোক না কেন—উদ্দীপিত হইত প্রবল শক্তিতে। এক প্রেম—একই আশা, বিশ্বাস ও প্রেমের উদার স্বপ্ন তাহারা দেখিত। ইষ্টদেব বলিয়া সাধারণ ভক্ত মানুষ যাঁহারই চরণে নতি জানাক্ না কেন—তিনি বিঠোবা, দত্তাত্রেয় বা নাগনাথ, যিনিই হোন না কেন—সকলেই ছিল এক, সকলেই ছিল অবিভাজ্য প্রেমের সূত্রে বিধৃত। বয়সের পার্থক্য, স্ত্রীপুরুষের ভেদ, জাতি বা বর্ণের গণ্ডী ভক্তদের এই পবিত্র ক্ষেত্রে কখনো টানা হইত না। প্রেমের আনন্দে, ভগবৎ-

সেবার শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে, নৃত্যকীর্ত্তনের আবেশের পশ্চাতে, সদা জাগ্রত ছিল একই অগ্নিময় উদ্দীপনা।"[১]

দাক্ষিণাত্যের ভক্ত সাধকেরা সকলেই নাম কীর্ত্তনের উপর জোর দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এইসব সাধকদের মধ্যে নামদেবের প্রচারিত নাম-প্রেমেব প্রসিদ্ধিই সব চাইতে বেশী। একদিকে ছিল তাঁহার পন্ধাবপুবের কার্ত্তনসভা—এই সভার মধ্যে দিয়া দিনের পর দিন বিস্তারিত হইত নামামৃতের ধারা, আর একদিকে এই অমৃত উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিত ভক্ত সাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠে—হৃদয় গলানো অভঙরাজির মধ্য দিয়া। নামের চারণ দিনের পর দিন এমনি ভাবেই উদ্‌যাপন করিতেন তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের মহান ব্রত।

নাম-মহিমার কথা নামদেব বাব বার তাঁহার অভঙে গাহিয়াছেন :
—'জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা বেষ্টন করেছিল পাণ্ডবদের অরণ্য কুটিব। কিন্তু নামবসের প্রসাদে সেদিন তারা পেয়েছিল পরিত্রাণ। পুবাণে বয়েছে লেখা—গোচারণ-রত রাখালেরা নামের বলে নিষ্কৃতি পেয়েছিল আগুনের হাত থেকে, এড়িয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যু। হনুমানকে যায়নি দগ্ধ করা, কারণ, সে যে সদাই ডুবে ছিল রামনামে। অগ্নি গ্রাস করেনি প্রহ্লাদকে—ভক্তবীর নামজপে ছিলেন মত্ত। সীতার অন্তরে জেগেছিল রঘুনাথের স্মৃতি, তাইতো অগ্নি তাকে এতটুকু করলো না স্পর্শ। লঙ্কাদহনের দুর্দ্দৈবের মাঝে বিভীষণের প্রাসাদ পেলো রক্ষা, কারণ, প্রেম হয়েছিল তার ভগবানের নামের সাথে।—অভঙ ৫।

—'এই নিঃসীম সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বর আমার রয়েছেন প্রচ্ছন্ন হয়ে, কিন্তু তাঁর নামের সুধাকে তো পারেননি তিনি লুকিয়ে রাখতে। যখনি এই নামের তরে হই অধীর, অ-ধরা অমনি এসে দেন ধরা, তাঁর কৃপার হয় অপরূপ প্রকাশ।'—অভঙ ৬৬।

১। মিষ্টিসিজম্ ইন্ মহারাষ্ট্র বেলভালকার রাণাড়ে পৃঃ ২০৯ হইতে উদ্ধৃত ও অনূদিত।

পরম প্রভুর জন্য, তাঁহার নামামৃতের জন্য ভক্ত নামদেব বিবাগী হইয়াছেন, ছাড়িয়াছেন তাঁহার সর্ব্বস্ব। এই চরম দানের ফলেই যে ঘটিয়াছে তাঁহার পরম প্রাপ্তি! তাই তাঁহার মধুর অভঙগুলিতে নিহিত রহিয়াছে বৈরাগ্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রশস্তি। সর্ব্বস্ব না বিলাইয়া দিলে যে সর্ব্বময়ের প্রতি সত্যকার প্রেম উপজিত হয়না ; হয় না তাঁহার কৃপারসের বর্ষণ। সংসারকে না ছাড়িলে হয় না সংসারের সার গ্রহণ। নামদেব তাই বলিতেছেন :

—'হাতে নিয়ে মধুনিষ্যন্দী বীণা, কণ্ঠে নিয়ে প্রভুর নাম-সঙ্গীত, আমি দাঁড়াবো গিয়ে তাঁর মন্দিরে। পানাহার করবো ত্যাগ, করবো সদা তাঁর অনুধ্যান। মনের পট থেকে মুছে যাবে পিতামাতা, পত্নী-পুত্রের স্মৃতি, দেহবোধ যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। ওগো, নামের সমুদ্রে নামদেব যাবে চিরতরে তলিয়ে।'—অভঙ ৭৭।

—'ভাই, সংসারকে বজায় রেখে ঈশ্বরকে কি ক'রে তুমি পাবে? তা যদি হতো, তা'লে সনক হতেন না সর্ব্বত্যাগী—ঈশ্বর পাগল। গৃহস্থীতে থেকেই যদি প্রভু আমার হতেন লভ্য শুক তাহলে বেরিয়ে যেতেন না বনে। তাই দেখেই তো নামদেব ছেড়েছে তার আত্ম-পরিজন—সব কিছু। কাঙালের মত কেবলি ছুটে চলেছে পরমপ্রভুর পানে।'—অভঙ ৮৩।

সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ নামদেব। দৈন্য ও বৈষ্ণবীয়তার এক মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। তাই তো দলে দলে মারাঠী নরনারী তাঁহার কীর্ত্তন সভায় যোগ দেয়, তাঁহার দর্শন মানসে পন্ধারপুরে ভীড় করে। এই ভক্ত দর্শনার্থীরা সৎ গৃহস্থ। সুস্থ, সুন্দর পরিবেশে, আত্মপরিজনে ঘেরা থাকিয়াই তাহারা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে চায়। নামদেবের কাছে মিনতি জানায়, "প্রভু আপনার বাণী তো চরম ত্যাগের বাণী। সে ত্যাগের যোগ্যতা আমাদের কই? অভাগা, দুর্ব্বল জীবের জন্য আপনার কি ব্যবস্থা, তাই বলুন।"

নামদেবের কতকগুলি জনপ্রিয় অভঙে এই ভক্তদের জন্য পথের নির্দ্দেশ রহিয়াছে :

—'যা-ই থাক্ না তোমার বৃত্তি আর কর্ম্ম, প্রভুর দিকে লক্ষ্য রেখে সদাই থাকবে স্থির। ছাখো, বালক আকাশে ঘুড়ি ওড়ায়, কিন্তু হাতে ধরা থাকে শক্ত ডুরি। চোখ দুটো থাকে নিবদ্ধ ঘুড়ির দিকে, ডুরি নিয়ে ব্যস্ত হবার নেই তার প্রয়োজন। দেখবে এসো, গুজরাটের মেয়েদের। শিরে তাদের সাজানো আছে ঘড়ার পর ঘড়া, হাত দুলিয়ে হেঁটে চলেছে অবলীলায়, কিন্তু মন রয়েছে ঘড়ার ওপর। স্বৈরিণী নারীর মন বাসা বেঁধেছে তার নাগরের রূপে। তস্করের শূন্য দৃষ্টি সদাই পড়ে রয়েছে লোকের সোনাদানায়। কৃপণের লোভাতুর মন জড়িয়ে আছে তার বিত্ত সঞ্চয়কে। সব মানুষই এমনিভাবে, তার কর্ম্মের জালে জড়িয়ে থেকেও, অনুধ্যান করতে পারে প্রাণপ্রভুর চরণকমল।'—অভঙ ৮৫।

নামদেব সিদ্ধপুরুষ, পরম কৃপালু তিনি। তাই ভক্ত ও মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে আর্ত্ত নরনারীর ভীড় সদাই তাঁহার দুয়ারে লাগিয়াই আছে। ইহাদের কেহ আসে রোগমুক্তির জন্য, কেহ চায় শোক-দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালার উপশম। দুঃখ দারিদ্র্য মোচনের জন্য কেহ জানায় আকুল প্রার্থনা। ভক্তি রসাত্মক অভঙের মধ্য দিয়া এই সব তাপিত জনগণের জন্য আসে নামদেবের বাণী :

—'মানুষ ভুলে যায়—তার এই ব্যাধির জ্বালা, সংসারের দুঃখ দহন, সৃষ্টি করেছে সে নিজে। তার পাপকর্ম্মই টেনে নামিয়েছে তাকে এই রোগশোক দুঃখদুর্দ্দশার পঙ্কে। ওগো, ভাবো একবার, যে তিক্ত ফলের বীজ করেছো রোপণ, তাতে কি ক'রে ফলবে মধুর রসাল ফল? আকন্দের কুঁড়ি থেকে হয় কি কখনো সুস্বাদু কদলী উদূখলের দণ্ড দিয়ে কি তৈরী হয় ধনুকের বাণ? যতই চূর্ণ কর পাথরের পিণ্ড, জল হবেনা নিষ্কাশিত। ওগো, ভাগ্য বিড়ম্বনা নিয়ে ক্রোধ ক'রে লাভ নেই, বরং ভাবো কৃতকর্ম্মের কথা।' অভঙ-৯২

যে কোন সামাজিক দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে ভক্ত নামদেবের উষ্মার সীমা ছিলনা। স্বরচিত সঙ্গীতে তিনি গাহিয়া গিয়াছেন ঃ

—'পরনারীর আকর্ষণে হয়োনা অন্ধ। নামদেব বলে—এ আকর্ষণ আর লোভ এগিয়ে আনবে তোমার নিশ্চিত বিনষ্টি। এই পাপেই ভস্মাসুর হয়েছিল ধ্বংস। এরই ফলে চন্দ্র পড়েছিল ক্ষয়রোগের কবলে, ইন্দ্রের দেহে হয়েছিল সহস্র গর্ত্ত।'—অভঙ ১০২।

—'নামদেব বল্‌ছে সাধনকামী সব মানুষকে—শান্ত ও বীতরাগ আমরা তখনি হবো, যখন রূপসী নারীর নয়নবাণে আর হবোনা বিদ্ধ। আত্মজ্ঞানের পথে চলার কথা তখনি আসবে, যখন দেখা যাবে—ক্রোধ আর প্রেম দুই-ই হয়েছে তরোহিত, হয়েছি আমরা নিস্তরঙ্গ। অহংবোধ বিলুপ্তির কথা যাবে না মুখে আনা, যদি ভেতরকার সত্তাকে না ক'রে তুলি শুচিশুভ্র, অনিন্দনীয়।"—অভঙ ১০৩।

সাধু সন্ত এবং যোগী মহাপুরুষদের সম্পর্কে নামদেব কতকগুলি জনপ্রিয় সঙ্গীত-পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সাধনা ও সিদ্ধির প্রকৃত মূল্যায়ন ইহাতে পাই ঃ

—'নামদেব বলছে, শোন ভাইসব, অধ্যাত্মজীবনের রজক হচ্ছে সাধু সন্তের দল। চৈতন্যোদয়ের সাবান তারা লাগায় মানুষের মন-বস্ত্রে, কাচে তা প্রশান্তি আর স্থৈর্য্যের ধোপীপাটে, জ্ঞানের নির্ম্মল স্রোতধারায় করে ধৌত। এমনি ক'রে পাপের কলঙ্ক-কালি করে তারা নিশ্চিহ্ন।"

—'ধিক্ সেই স্থানকে, যেখানে নেই কোন সাধুসন্তের পূত সঙ্গ সেই বিত্তবিষয় আর পুত্র কন্যায় ধিক্, যার দ্বারা হয়না সাধুসেবা। ধিক্ সেই জীবনধারায়, যাতে নেই ভগবানের আরাধনা। ধিক্ সেই সঙ্গীতে আর বিদ্যায়, যা হয় না নিবেদিত প্রাণপ্রভুর নামে। ধিক্ সেই মানব জীবনে, যা হয়নি কেন্দ্রীভূত শ্রীভগবানে।'—অভঙ ১০২।

—'প্রেম সাগরে ডুবেছেন বলে তিনিই করতে পারেন দাবী, মান

আর অপমান যাঁর কাছে হয়েছে সমতুল। বন্ধু আর বৈরী দুই-ই যাঁর চোখে হয়েছে সমান, তিনিই তো পরমপ্রভুর প্রেমভাজন। স্বর্ণ আর কর্দ্দম যিনি করেন সমজ্ঞান, তাকেই তো বলা যায় সার্থক যোগী। সেই শুদ্ধাত্মা মহাত্মাই ধরেন শোধনের মহাশক্তি। ওগো, ত্রিলোক শুচি হয়ে ওঠে তাঁর পূত চরণের স্পর্শে।'—অভঙ ১১৪।

নামদেবের মতে, প্রকৃত সাধু তিনিই —হৃদয়ে যাঁহার বাস করেন শ্রীনিবাস। এই প্রকৃত সাধু শুধু ভগবানকে বুকে ধরিয়া রাখার শক্তিই অর্জ্জন করেন না, অপরেরবুকেও এই পরম বস্তু সংস্থাপন করিতে তিনি সমর্থ। শক্তি আর করুণা—এই দুইয়েরই ঐশ্বর্যে সাধু থাকেন ঐশ্বর্য্যবান। এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

—'ওরে ভাই, তিনিই তো সার্থকনামা সাধু, আশ্রিতকে যিনি করাতে পারেন ভগবৎ-দর্শন। কি ভাগ্যবান এই দীনাতিদীন ভক্ত নামদেব! সে যে প্রত্যক্ষ করেছে তার শ্রীভগবানকে সাধুগোষ্ঠীর মাথার মণিরূপে।'

নামদেবেব অভঙে, আর তাঁহার সাধন নির্দ্দেশে ধ্বনিত হইয়াছে পরম আশ্বাসের বাণী। দীন ভক্তের জন্য, মুক্তিকামী মানব মাত্রেরই জন্য, তিনি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন ভগবানের করুণাঘন সত্তাকে। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি ঃ

—'ঈশ্বরোপলব্ধির শক্তি মহা কল্যাণময়, আর এ শক্তি হচ্ছে শ্রীভগবানেরই দান। করুণাময় নিজে থেকেই যে এসেছেন এগিয়ে, যুগিয়েছেন দুর্ব্বল মানবকে তার উত্তরণের সামর্থ। নির্জ্জন গহন বনে গোমাতা প্রসব করে বাছুরকে, কিন্তু কে ঠেলে দেয় নবজাতককে তার মাতৃস্তন্যের দিকে? ভুজঙ্গ-শিশুকে কে শেখায় দংশন করার কৌশল? মোগরা পুষ্প অবলীলায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার লতার ওপর, কে তাকে বলে,—ওগো, বিতরণ কর তোমার বুকের

সৌগন্ধ ? মাকাল লতার শেকড়ে সেচন কর দুগ্ধ আর মধু, কিন্তু ফল তার থাকবে তেমনি তিক্ত। ইক্ষুকে যতই কাটো খণ্ড খণ্ড ক'রে, যতই করো চর্ব্বণ, মধুর স্বাদ তার থাক্‌বে অব্যাহত। তাইতো নামদেব বলছে—এমনিভাবে সহজাত হয়ে রয়েছে মানুষের ঈশ্বর-লাভের শক্তি, এই শক্তিবলেই সে লাভ করবে তার পরম প্রভুকে।'
—অভঙ ১৩৫।

ভক্তিরসের সমৃদ্ধি, আবেগধর্ম্মিতা ও আন্তরিকতায় দাক্ষিণাত্যের ভক্তেদের অভঙ ভরপুর। সমকালীন ধর্ম্মান্দোলন ও সমাজ জীবনকে এগুলি গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল। এই সর্ব্বজনপ্রিয় কাব্যসঙ্গীতের সংবেদন ও সাধন-ইঙ্গিত বহু মানুষের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিয়াছিল অমৃতময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

মারাঠী অভঙ-রচয়িতাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে প্রসিদ্ধি লাভ করেন জ্ঞানদেব। তারপর ভক্ত নামদেব। মনীষা ও জ্ঞানোজ্জ্বলা বুদ্ধির দিক দিয়া জ্ঞানদেব উচ্চতর স্তরের হইলেও পদকর্ত্তা হিসাবে নামদেবই হন বেশী জনপ্রিয়। অন্তরের আকুতি, আত্মনিবেদন ও প্রসাদগুণে তাঁহার অভঙসমূহ ভরপূর। অল্পকাল মধ্যে মারাঠার দিকে দিকে এগুলি ছড়াইয়া পড়ে।

এই অমূল্য সঙ্গীতের ৮০টি পদ শিখদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-সাহিবে পরম সমাদরে স্থান পাইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত, গুজরাটের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় সাধক, নরসী মেহ্‌তার হরমালা গ্রন্থেও নামদেবের জীবন কাহিনী ও রচনার পরিচয় পাই। তুকারাম ছাড়া মহারাষ্ট্রের অভঙরচয়িতাদের মধ্যে নামদেবের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না।

দক্ষিণ ভারতের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে দুই নামদেবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ফলে আসল নামদেবের, অর্থাৎ, দরজী-তনয় মহাত্মা নামদেবের অভঙ-পদের সঙ্কলন দুরূহ হইয়াছে। এ সম্পর্কে যুক্তি ও তথ্যাদি উপস্থাপিত করিয়া অধ্যাপক আর, ডি রাণাড়ে লিখিতেছেন :

"মহাত্মা নামদেবের অভঙের প্রামাণিক সংগ্রহকার্য্য আজ অবধি সম্ভব হয় নাই। দরজী নামদেব ও ব্রাহ্মণ নামদেব এই দুই জনেরই অভঙ কালক্রমে মিশিয়া যাওয়ার ফলে এই কাজের সাফল্য সুদূর-পরাহত হইয়া রহিয়াছে। দুই জনের অভঙ পৃথক করার একমাত্র চিহ্ন, ব্রাহ্মণ নামদেবের রচনার শেষে রহিয়াছে—'বিষ্ণুদাসনামা' এই ভণিতা। এ নামেই প্রতি ক্ষেত্রে পদকর্ত্তা তাঁহার আত্মপরিচয় ঘোষণা করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ বংশীয় নামদেব কিন্তু আমাদের আলোচ্য ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষের, আসল নামদেবের দুই শত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। স্বভাবতঃই পূর্ব্বসূরী মহাত্মা নামদেবের অভঙ হইতে নিজের অভঙের পার্থক্য বজায় রাখার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন, তাই 'বিষ্ণুদাসনামা' ভণিতায় এগুলি চিহ্নিত করেন।

"পূর্ব্ববর্ত্তী নামদেব অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য মহাত্মা যদিই কখনো নিজেকে 'বিষ্ণুদাসনামা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে তাহা করিয়াছেন নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত ও দাসরূপে পরিচিত করার জন্য। আর পরবর্ত্তীকালের ব্রাহ্মণ-নামদেব 'বিষ্ণুদাসনামা' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন শুধু একটা উপাধি চিহ্নরূপে। উভয়ের মধ্যে আরো কয়েকটি পার্থক্যজ্ঞাপক বিশেষত্ব রহিয়াছে। ভাবের সমৃদ্ধি, ভাষার প্রাচীনত্ব এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের আসল নামদেবের প্রামাণিক অভঙসমূহের সঙ্কলন হয়তো শীঘ্রই একদিন সম্ভব হইয়া উঠিবে।"[১]

জ্ঞানদেবের তিরোধানের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল নামদেব পন্ধারপুরের ভক্ত সমাজের নেতৃত্ব করেন। এই দীর্ঘ সময়ে বহু মুমুক্ষু নরনারী তাঁহার আশ্রয় লাভে ধন্য হয়। সমকালীন বিশিষ্ট সাধকেরাও এই মহাত্মার সান্নিধ্য লাভের জন্য আসিতেন, লাভ করিতেন নানা মূল্যবান সাধন-নির্দ্দেশ।

১। হিস্টরী অব্ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি: বেলভালকর; রাণাড়ে; ভল্যু—৭, পৃঃ ১৮৭—১৮৮;

ভক্ত সম্বৎ ছিলেন বাগানের মালী। নিম্নশ্রেণীর ঘরে তাঁহার জন্ম। মীরাজের কাছে, অরণগাঁয়ে তাঁহার বাসস্থান। কাজ কর্ম্মের তাঁহার অন্ত নাই—চাষ, জলসেচন, অনেক কিছু করিতে হয়। বাগানের সেবায় এতটুকও ত্রুটি হইবার যো নাই। কিন্তু সারা দিনের এত কাজের সঙ্গে সদাই জড়ানো থাকে পরম প্রভুর মধুর স্মৃতি। সমস্ত কিছুতেই ভক্তপ্রবর সম্বৎ দেখিতে পান তাঁহারই ছায়া। পরমানন্দে করেন ইষ্টের অনুধ্যান।

সেদিন আপনমনে কাজ করিতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন, বাগানের সম্মুখ দিবা জ্ঞানদেব ও নামদেব পদব্রজে কোথায় চলিয়াছেন। বড় অপ্রত্যাশিত দুই মহাত্মার এই দর্শন!

ভক্ত সম্বতের প্রাণে তখনি জাগিয়া উঠিল অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবেশ। গভীর ইষ্টধ্যানে তিনি মগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই দিন যে অতীন্দ্রিয় দর্শন ভাগ্যে ঘটে, তাহা তাঁহার সাধন জীবনকে রূপান্তরিত করে। উন্মোচন করে অধ্যাত্মলোকের সিংহদ্বার।

ইহার পর হইতেই তিনি জ্ঞানদেব ও নামদেবের ভক্তিধর্ম্মের আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন।

অল্প বয়সেই জ্ঞানদেবের তিরোধান ঘটে, তাই তাঁহার সান্নিধ্য সম্বৎ বেশী দিন পান নাই। ফলে নামদেবের সাথেই গড়িয়া উঠে তাঁহার আত্মিক জীবনের গভীর যোগাযোগ।

নামদেবের নামপ্রচারের ব্রত উদ্‌যাপনে সম্বৎ মালীর সহায়তা অনেক দিক দিয়া কার্য্যকরী হইয়াছিল। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে এই জনপ্রিয় সাধকের জীবনদীপ নিভিয়া যায়।

মহারাষ্ট্রের সাধিকা এবং ভক্তি-রসাত্মক অভঙ-রচয়িত্রীদের মধ্যে জনাবাঈ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জ্ঞানদেবের ভগ্নী মুক্তাবাঈ ছাড়া আর কেহ সাধনা ও কবিত্বের ক্ষেত্রে এমন সাফল্য দেখাইতে পারেন নাই

প্রথম জীবনে এই জনাবাই নামদেবের পিতা দামাশেটের গৃহে পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে নামদেবের আশ্রয় তিনি লাভ করেন, সাধন জীবনে হন আপ্তকাম।

ভক্তিসাধনার মূল কথা আত্মনিবেদন। কিন্তু অহমিকা দূর না হইলে, দেহবুদ্ধি তিরোহিত না হইলে তো তাহা সম্ভব হয় না। চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়াই এই সাধনার ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে হয়, অন্য কোন পথ নাই। ভক্তকবি জনাবাঈ তাঁহার অভঙের মধ্য দিয়া এই তত্ত্বটিকেই ফুটাইয়া তুলেন।

তিনি গাহিয়াছেন,—'ভক্তির পথ নয়কো মোটেই সহজ, জ্বলন্ত অঙ্গারের কুণ্ড আর নদীর গভীর দুর্গম তলদেশের সাথেই' চলে এ পথের তুলনা। এক মুঠো প্রাণঘাতী বিষ বা সুতীক্ষ্ণ তরবারির ঝক্‌ঝকে ফলার কথা ভাবো—আর জেনে রাখো, এমনিতর মারাত্মক পথ দিয়ে তোমায় ঢুকতে হবে ভক্তিলোকে !'

জনাবাঈর রসমধুর অভঙে নামদেবের সাধনজীবনের নানা তথ্য, তাঁহার অলৌকিক শক্তির নানা কাহিনী ছড়ানো আছে।

নামদেবের কৃপাতেই যে জনাবাঈর আধ্যাত্মিক জীবন সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার রচিত এক অভঙের মধ্যে সেই স্বীকৃতি মিলে :

—'ভাগ্যের আমার সত্যই নেই সীমা, পেয়েছি আমি নামের চারণ, প্রভু নামদেবের পবিত্র সঙ্গ। আর এই সঙ্গের মাহাত্ম্যে পেয়েছি প্রভু বিঠ্‌ঠলকে। বিয়ের আসরে বরের সাথে বসে বরযাত্রীদের লাভ হয় কত স্বাদু ভোজ্য, তেমনি নামদেবের অনুগামী হয়ে পেয়েছি আমি অধ্যাত্মজীবনের পরম ধন।'

গুরুর অলৌকিক শক্তির এক বিস্ময়কর কাহিনী ভক্ত জনাবাঈ পরিবেশন করিয়াছেন :

সেবার পন্ধারপুরে তুমুল বর্ষা শুরু হইয়াছে। নদীর দুই তীর ভাসাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে প্রচণ্ড বন্যা। গ্রামের লোকের আতঙ্কের

সীমা নাই। তবে কি উন্মত্ত নদী সারা পন্ধারপুরকেই ভাসাইয়া নিবে! নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে বিঠোবাজীর পবিত্র মন্দির!

এ সঙ্কট সময়ে ভক্তপ্রবর নামদেব আগাইয়া আসিলেন, সকলকে অভয় দানে করিলেন আশ্বস্ত! বিঠ্ঠলজীর মন্দির প্রাঙ্গণে, আর নদীর তীরে তীরে শুরু হইল আকাশভেদী নামসঙ্গীত।

জনাবাঈ তাঁহার অভঙে লিখিয়াছেন,—স্ফীতকায়া নদী দুই তীরের বহু গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলে, কিন্তু পন্ধারপুরের কাছে আসিয়া হঠাৎ ধারণ করে শান্তমূর্ত্তি। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! নামদেবের নামগানের মাহাত্ম্যে সেদিন সারা পন্ধারপুর রক্ষা পায়।

ভক্তিসিদ্ধ নামদেবের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে আরো জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

ভক্ত চোখা ছিলেন জাতিতে অস্পৃশ্য। সাংলির অন্তর্গত মঙ্গল-ভেদা গ্রামে এই পুণ্যাত্মা সাধক বাস করিতেন। জ্ঞানদেব ও নামদেব উভয়েরই তিনি পরম অন্তরঙ্গ। এক সময়ে ইঁহাদের সঙ্গীরূপে ভারতের নানা তীর্থেও পরিব্রাজন করিয়া আসেন। উত্তরজীবনে নামদেবের সহিত তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের সম্বন্ধ ক্রমে আরো গভীর হইয়া উঠে।

চোখার বৃত্তি ছিল রাজমিস্ত্রীগিরি। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন, আর তাঁহার এই কর্ম্মজীবনের আড়ালে সদা বহিয়া চলিত ইষ্টনামের মধু-প্রবাহ।

মাঝে মাঝে চোখার ডাক পড়িত পন্ধারপুরের ভক্তসমাজে। নৃত্য কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রভু বিঠ্ঠলজীর মন্দির চত্বরে তিনি ভক্তি-রসের তরঙ্গ তুলিতেন। তারপর ফিরিয়া আসিতেন নিজ গ্রামে।

হঠাৎ সেবার মঙ্গলভেদায় এক বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। কাজ করার সময় একটি দুর্গ প্রাকার ধ্বসিয়া পড়ে এবং উহার নীচে চাপা পড়িয়া চোখা ও তাঁহার একদল সহকর্মী প্রাণ হারান। বহু চেষ্টা

করিয়াও এই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। ধ্বংসস্তূপ
অপসারণের পর দেখা যায়, মৃতদেহগুলি ছিন্নভিন্ন ও গলিত হইয়া
গিয়াছে। কোন্‌টি কাহার বুঝিবার উপায় নাই।

পন্ধারপুরের ভক্তসমাজ পরম ভাগবত চোখার দেহাস্থি পাইবার
জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, এ পবিত্র
অস্থি পন্ধারপুরেই স্থাপন করিবেন। চোখার ধর্ম্মজীবনের স্মারকরূপে
নির্ম্মিত হইবে এক রম্য সমাধি-মন্দির। কিন্তু মৃতদেহগুলির যেরূপ
অবস্থা তাহাতে চোখার দেহাস্থিকে পৃথক করার কোনই উপায় নাই
এ এক মহাসঙ্কট।

নিরুপায় হইয়া ভক্তেরা নামদেবের শরণ নিলেন।

তিনি আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "চোখার অস্থি পন্ধারপুরে আন্‌তে
চাও তোমরা, এতো অতি উত্তম কথা। আচ্ছা, এগুলো বেছে নেবার
উপায় আমি বলে দিচ্ছি। গলিত মৃতদেহের হাড়গুলো তুলে একটি
একটি ক'রে তোমরা কানের কাছে ধরো। যে হাড়টির ভেতর নিরন্তর
বাজতে শুনবে বিঠ্‌লজীর নাম—জানবে, তা-ই হচ্ছে প্রভুর মহান
সেবক, নামসিদ্ধ ভক্ত চোখার।"

নামদেবের কথামত ভক্তেরা তাড়াতাড়ি মঙ্গলভেদায় উপস্থিত
হন। কথিত আছে, ঐপন্থা অনুসরণ করিয়াই চোখার দেহাস্থি তাঁহারা
চিনিয়া নিয়াছিলেন।

অধ্যাপক আর, ডি, রাণাড়ে এ প্রসঙ্গে লিখিতেছেন: "এ কাহিনী
হইতে অনুমান করা যায় যে, ভক্ত চোখার নামপ্রেম তাঁহার অস্থি
মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যদিও তাঁহার মরদেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র
ছিলনা, তবুও উহার পঞ্চভৌতিক উপকরণের মধ্যে নিহিত ছিল
ভগবানের অস্তিত্বের সাক্ষ্য। চোখার ঐ দেহাস্থি সাড়ম্বরে ভক্তগণ
পন্ধারপুরে নিয়া আসেন। বিঠ্‌ঠল মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে
জ্ঞানদেবের দেহাস্থির পাশে, উহা সমাহিত করা হয়।"

নামদেবের পবিত্র জীবনকাহিনীর এক বড় অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে

তাঁহার অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ। বিশেষ করিয়া ভক্ত সাধিকা জনাবাঈর রচনায় ইহা নানাভাবে কীর্ত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু নামদেবের সাধন জীবনের সব কিছু সিদ্ধি ও বিভূতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে ভক্তির রসস্রোত। অপরূপ মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও শরণধর্ম্ম।

সেদিন গভীর রাত্রে বিঠ্‌ঠলজীর মন্দির চত্বরে নৃত্য কীর্ত্তন শেষ হইয়াছে। বিশ্রাম ও কৃত্যাদি সারিয়া নামদেব ভোজনে বসিলেন। সারা দিনের পর তিনি আহার্য্য গ্রহণ করেন মাত্র দুই টুকরা রুটি ও সামান্য একটু দধি।

ভোজন পাত্রের সম্মুখে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা হইতে এক কুকুর আসিয়া উপস্থিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে নামদেবের রুটি দুইখানি মুখে করিয়া উহা ছুটিতে শুরু করিল।

নামদেব তো মহা বিব্রত! দধির পাত্রটি হাতে নিয়া তখনি ধাবিত হইলেন পিছনে পিছনে। ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ আজকাল সর্ব্বভূতে করেন ইষ্টদর্শন। কুকুরের আগমনে তাই উপলব্ধি করিয়াছেন কৃপালু ইষ্টদেবেরই আবির্ভাব!

গণ্ড বাহিয়া কেবলি ঝরিতেছে অশ্রুধারা। কুকুরটির পিছে পিছে ছুটিয়া বারবার তিনি মিনতি জানাইতেছেন, "প্রভু, কৃপা ক'রে একটু থামুন, স্থির হয়ে ভোজনে বসুন। এ শুক্‌নো রুটি কি ক'রে আপনি গলাধঃকরণ করবেন? এই যে দেখুন, আমি নিয়ে এসেছি দই। এ দিয়ে ভিজিয়ে রুটি ভোজন করুন।"

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? নামদেব যত মিনতি করিতেছেন, সারমেয় ততই প্রাণভয়ে দৌড়িয়া চলিয়াছে।

এই প্রেম-মধুর দৃশ্য দেখার জন্য পন্ধারপুরের রাজপথে সেদিন ভীড় জমিয়া গেল।

বৈষ্ণবীয় সাধনার সাফল্য নামদেবকে ভক্ত সমাজের বরণীয়

করিয়া তোলে। ইষ্টনিষ্ঠা ও শরণাগতির মধ্য দিয়া মহাবৈষ্ণব খুঁজিয়া পান প্রাণপ্রভুর জ্যোতির্ময় লোক, জীবন হয় চির-ভাস্বর।

ভক্তশ্রেষ্ঠ জ্ঞানদেব পরম স্নেহে একবার তাঁহাকে অভিহিত করেন বিশ্বের আলোকবর্তিকারূপে। মহাপুরুষের কথা মিথ্যা হয় নাই—বিশ্বের ভক্তজনের কল্যাণে যে আলোক নামদেব ছড়াইয়া যান, তাহা আজো তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

১৩৫০ খৃষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায়, আশী বৎসর বয়সে, এই মহাজীবনে চিরবিরতির যবনিকা নামিয়া আসে।

নামমূর্তি নামদেব ছিন্ন করেন প্রপঞ্চময় জগতের নাম-রূপময় সমস্ত কিছু বন্ধন। সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়ে দেখা দেয় শোকের করুণ ছায়াপাত, নয়ন ছাপাইয়া নামে অশ্রুর বন্যা।

আচার্য্য রামানন্দ

রাত্রির অন্ধকার তখনো অপসৃত হয় নাই, আকাশের দিগন্তে দুই চারিটি তারা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। কাশীর পথ ঘাট একেবারে নীরব নির্জ্জন। এমনি সময়ে বালক রামদত্ত ফুলের সাজি হাতে চুপি চুপি পথ চলিতেছে।

সামনেই পঞ্চগঙ্গা মহল্লার প্রাচীরঘেরা মস্ত বড় বাগান। এই বাগানের ফুলের উপর রামদত্তের ভারি লোভ। ঝোপেঝাড়ের বিচিত্র বর্ণের কত ফুল পাপড়ি মেলিয়া থরে থরে ফুটিয়া আছে। সুগন্ধী শ্রেণীর মধ্যে রহিয়াছে অজস্র কত বেল, যুঁই, মল্লিকা, মালতী। দেখলেই প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

কোন কোনদিন শেষরাত্রে, কোনদিন বা প্রত্যূষের ক্ষীণালোকে প্রাচীর ডিঙাইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে। ফুল তোলা শেষ হইলেই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ে নিঃশব্দে।

রোজই গুরুদেবের ভোর বেলাকার পূজায় ফুল চাই প্রচুর। বালক রামদত্তই মহা উৎসাহে এ কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু গোপন পথে এই বাগানে আসা, ফুল সংগ্রহ করা—ইহাও কম বিপদের কথা নয়। আশ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই কিভাবে যেন টের পাইয়াছে, সে প্রায়ই এখানকার ফুল তুলিয়া নেয়। সুযোগমত একবার তাহারা ধরিতে পারিলে সহজে ছাড়িয়া দিবে না।

সাজি প্রায় ভরিয়া উঠিয়াছে। থাক্, আজ আর নয়। কে হঠাৎ দেখিয়া ফেলে, কি বিভ্রাট বাধাইয়া বসে, কে জানে?

ঘন ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া রামদত্ত প্রাচীরের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে, এমন সময় কাণে আসিল গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর—"কে হে ওখানে? কে ফুল চুরি করছো? দাঁড়াও!"

রামদত্ত থতমত খাইয়া যায়। তাই তো। একেবারে ফুলের সাজি সহ সে যে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। পলায়নের চেষ্টাও মূর্খতা। হৈ-চৈ শুনিতে পাইলে এই মুহূর্ত্তে আশ্রমের ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। প্রাণ নিয়া আর ঘরে ফেরার উপায় থাকিবে না।

আবার আসে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ, "উত্তর দাও! এ আশ্রমের ফুল কেন তুমি চুরি করেছো?"

"চুরি? কক্ষণো নয়! দেবতার জন্য সংগ্রহ করেছি এ ফুল, নিজের জন্য নয়। একে চুরি বলে না," ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বালক উত্তর দেয়।

"চমৎকার যুক্তি! অপকার্য্যের সমর্থনে ভাল কথাই বলেছো। এদিকে এসে দাঁড়াও তো' হে একবার।"

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই ভয় বিস্ময় ও সম্ভ্রমে রামদত্ত হতবাক্ হইয়া গেল। এ কি! এ যে স্বয়ং স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সারা ভারতের এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তিনি। রামানুজ সম্প্রদায়ের অগ্রণী আচার্য্য। কাশীধামের সাধক সমাজে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির সীমা নাই। কখনো তাঁহাকে মঠের বাহিরে, লোকলোচনের সম্মুখে আসিতে দেখা যায় না। মন্দিরের গর্ভগৃহে, আপন ধ্যানাসনে বসিয়াই বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। তিনি হঠাৎ আজ কেন এখানে? আর এমনি দুর্ভাগ্য রামদত্তের, ফুল চয়ন করিতে আসিয়া শেষটায় মহাত্মার কাছেই হাতে নাতে ধরা পড়িয়া গেল!

জটাজুটসমন্বিত বিশালকায় মূর্ত্তি সম্মুখে পথ আগুলিয়া রহিয়াছে। আর বালকের দৃষ্টি নির্নিমেষ, মুখে একটি কথাও যোগাইতেছে না। দাঁড়াইয়া আছে চিত্রার্পিতের মত।

সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। অন্ধকারের মায়াজাল ছিঁড়িয়া দিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়াছে স্বর্ণসূর্য্য। আলোকরশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়াছে হেমকান্তি মহাপুরুষের সারা অঙ্গে, তাম্রাভ জটাজালে।

প্রশান্ত নয়ন দুইটির দিকে তাকাইতে রামদত্ত আত্মবিস্মৃত হয়, চরণতলে লুটাইয়া পড়ে।

"ওঠ বৎস, ভয় নেই। এবার বল দেখি, কোথায় তুমি থাকো? কার আশ্রয়ে আছো? কি পাঠাভ্যাস করছো?"

বালক মৃদুস্বরে একে একে জ্ঞাপন করে তাহার সমস্ত সংবাদ। শিক্ষাগুরুর কাছে আজকাল সে যে স্মৃতির পাঠ নিতেছে, একথাটিও গর্ব্বের সহিত জানাইয়া দিতে ভুলে না।

রাঘবানন্দ মহারাজ তাহার কথা শুনিতেছেন, আর একদৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, স্মৃতি আর তার ভাষ্য টীকা তো তোতার মত খুব মুখস্ত ক'রে যাচ্ছো। তাতে কি ফল হলো? না-না। ওতে তোমার সত্যিকার কল্যাণ আসবে না। শোন, দিনরাত কেবল হরিনাম জপ কর, হরির ধ্যানে ডুবে থাকো। তোমার আচার্য্য আশ্রমে বসে বসে কি ক'রছেন? এদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই কেন?

"আজ্ঞে, শাস্ত্রপাঠ কিছুটা এগিয়ে গেলে তারপর সাধন পাবো তাঁর কাছে। এখনো সময় হয়নি কিনা।"—মাথা চুলকাইয়া সবিনয়ে বালক নিবেদন করে।

"মূর্খ! সময় আর তোমার হবে কবে? এদিকে প্রদীপের তেল যে ফুরিয়ে এসেছে।"—কথা কয়টি বলিয়া ফেলিয়াই রাঘবানন্দের হুঁস আসিল। এ তিনি কি করিলেন? বালকের আসন্ন মৃত্যুর যে মর্ম্মন্তুদ ছবি তাঁহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে, এভাবে প্রকাশ্যে তাহা বলিয়া ফেলা তো সঙ্গত হয় নাই।

মনে বড় পরিতাপ হইল। এবার স্নেহার্দ্র স্বরে কহিলেন, "বৎস, আর এখানে দেরী ক'রো না। আশ্রমে ফিরে যাও। সবাই হয়তো তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছেন।"

তীক্ষ্ণধী বালকের কাণে তখনো বাজিতেছে রাঘবানন্দের গম্ভীর কণ্ঠস্বর—"প্রদীপের তেল যে ফুরিয়ে এসেছে!"

তবে কি রামদত্তের জীবনাবসানের আর দেরী নাই? নির্দ্দিষ্ট লগ্নে মৃত্যুর দূত তাঁহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইবে! নির্ম্মম ক'রে নিবে তাহাকে ছিনাইয়া! হাসি-গান-আলো-আনন্দ ভরা এই পৃথিবী হইতে তাহাকে চিরতরে নিতে হইবে বিদায়? মাতাপিতা, আত্মপরিজন বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া কোথায় কোন অনির্দ্দেশ্য লোকে সে যাইবে, তাহা জানা নাই। অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

রাঘবানন্দ শক্তিধর সাধক। কাশীর সবাই জানে, তিনি বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। রামদত্তের অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে যে কথা তিনি উচ্চারণ করিলেন, তাহা তো কখনো মিথ্যা হইবে না।

সাহস সঞ্চয় করিয়া বালক কহিল, "প্রভু, সবাই জানে, আপনার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী বিফল হ'বার নয়। আমার আয়ু সম্বন্ধে আপনি দিব্যদৃষ্টিতে যা দেখেছেন, তা স্পষ্ট ক'রে বলুন। আমায় আর এড়িয়ে যাবেন না। কৃপা করুন।"

প্রিয়দর্শন বালকের নয়নে অশ্রু, কণ্ঠে আর্ত্তি। রাঘবানন্দের অন্তর গলিয়া গেল, ফুটিয়া উঠিল করুণাঘন রূপ।

স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বৎস, তুমি নিশ্চিন্ত মনে আশ্রমে ফিরে যাও। আমি বলছি, তোমার কোন ভয় নেই। আর শোন, এখনি গিয়ে তোমার আচার্য্যকে সংবাদ দাও, আজই তিনি যেন আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।"

আনুপূর্বিক সকল কথা শুনিয়া, রামদত্তকে সঙ্গে নিয়া, শিক্ষাগুরু তখনি রাঘবানন্দজীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "মহারাজ, সব কথা শুনে এখনি আপনার কাছে ছুটে এলাম। আপনি ঠিকই বলেছেন, রামদত্তের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। জ্যোতিষী বিদ্যায় আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা আছে, তার সাহায্যে আগে থেকেই আমি এ তথ্য জেনেছিলাম। কিন্তু এর প্রতিকার করার সাধ্য আমার কই? আপনার মত অলৌকিক শক্তি তো আমার নেই। রামদত্ত আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র, কৃপা ক'রে তার প্রাণ রক্ষা করুন। আমরা

জানি, আপনি যোগ-বিভূতিসম্পন্ন মহাসাধক। ইচ্ছে করলেই যে কোন অঘটন অবলীলায় ঘটাতে পারেন।"

স্মিতহাস্যে রাঘবানন্দ কহিলেন, "আচার্য্য, আপনি এতো ব্যাকুল হবেন না। এতো ক'রে অনুরোধও আপনাকে জানাতে হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, রামদত্ত যে শেষরাত্রে এ বাগানে আসবে, আমার মনের মুকুরে আগে থেকেই তার ছায়া পড়েছিল। আমি আদিষ্ট হয়েছি তার প্রাণদানের জন্য। খণ্ডিত-প্রাক্তন এই বালককে আমি আবার স্থাপন করবো নূতন জীবনের পথে। তাছাড়া, আমি যে আরো জেনেছি, ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট এক মহান কর্ম্ম তাকে সম্পন্ন করতে হবে। জনকল্যাণের জন্যই তার বেঁচে থাকা দরকার।"

স্মার্ত্ত আচার্য্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পরম উৎসাহে তখনি প্রিয় ছাত্র রামদত্তকে সঁপিয়া দিলেন রাঘবানন্দ স্বামীর হাতে। পরদিনই এক শুভলগ্নে বালকের সন্ন্যাস দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গেল। গুরু নাম দিলেন—রামানন্দ স্বামী।

কাশীধামে জনশ্রুতি আছে, কয়েক দিনের মধ্যে রামানন্দের জীবনে সেই নির্দ্ধারিত মৃত্যুলগ্ন আসিয়া যায়। গুরু তাঁহার অসামান্য যোগশক্তির বলে মৃত্যুর আঘাতকে প্রতিহত করেন। তারপর তাঁহার আশীর্ব্বাদে রামানন্দ লাভ করেন সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বিপুল কর্ম্মশক্তি।

রামানন্দী সম্প্রদায়ের মতে, তিনি ১১১ বৎসর কাল বাঁচিয়া যান, অগণিত মানুষের জীবনে বিস্তারিত করেন ভক্তিধর্ম্মের ঐশ্বর্য্য।

ভক্তিসাধনার এক শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে স্বামী রামানন্দ আত্মপ্রকাশ করেন, ভক্তি আন্দোলনকে তিনি স্থাপিত করেন উদারতর ভিত্তি ও মানবতাবোধের উপর। রামানুজীয় ভক্তিতত্ত্ব হইতে যে পরম সম্পদ তিনি আহরণ করেন, সমাজ জীবনের সর্ব্বস্তরে অকৃপণ করে তাহা ঢালিয়া দিয়া যান।

এই শক্তিধর আচার্য্যের জীবন ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ রামাওয়ৎ সাধক।

মধ্যযুগের অধিকাংশ ভক্তিবাদী ও মরমিয়া সাধুসন্ত রামানন্দের ভাবধারায় অবগাহন করিয়া ধন্য হন। কবির ছিলেন তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য। আর ভক্ত কবি তুলসীদাস আবির্ভূত হন রামানন্দেরই ভক্তি-ধর্ম্মের এক শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে। নানক, দাদু এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকেরা কেহই রামানন্দের সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

দাক্ষিণাত্যের প্রেমভক্তির ঐতিহ্য বহু দিনের। আড়বার সাধক এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতির মাধ্যমে এই ভক্তিরস আরো গাঢ় হয়। পরবর্ত্তী কালে রামানন্দ এ রসস্রোতকে দক্ষিণ হইতে উত্তর ভারতে আনয়ন করেন। আপন ব্যক্তিত্ব ও সাধনাশক্তির বলে এই স্রোতকে প্রশস্ততর খাতে করেন সঞ্চালিত, দেশের দিকে দিকে ক্রমে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। আজো তাঁহার সেই মহনীয় অবদান সারা ভারতের ধর্ম্মসংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

প্রয়াগের কাছে, মালকোটে ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ ভূমিষ্ঠ হন। পিতা পুণ্যসদন ছিলেন এক সুপণ্ডিত, শুদ্ধসত্ত্ব, গৌরব্রাহ্মণ। মাতার নাম সুশীলা দেবী।[১]

মালকোট পূর্ব্বে শৈব ব্রাহ্মণদের বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। আচার্য্য রামানুজ একবার শিষ্যগণসহ পরিব্রাজন করিতে করিতে এই অঞ্চলে উপনীত হন। শক্তিধর আচার্য্য আপন মনীষা ও সাধন-শক্তির বলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের স্বমতে আনয়ন করেন। তারপর সাড়ম্বরে এখানে এক বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া যান। রামানুজের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রামই স্বামী রামানন্দের

১। আর কে ভাণ্ডারকর:—বৈষ্ণবিজম, শৈবিজম এ্যাণ্ড আদার রিলিজিয়নস্—পৃঃ ৬৬-৬৫

প্রিয়দর্শন শিশুকে কোলে পাইয়া জনক-জননীর আনন্দের সীমা নাই। স্নেহভরে তাহার নাম রাখিলেন, রামদত্ত।

অষ্টমবর্ষে উপনয়ন অনুষ্ঠানের পর হইতেই শুরুহয় রামদত্তের শাস্ত্র অধ্যয়ন। অতি অদ্ভুত তাঁহার মেধা ও প্রতিভা। শুধু চতুষ্পাঠীর পড়ুয়ারাই নয়, অধ্যাপক ও গ্রামের বড় বড় পণ্ডিতেরাও বালকের কৃতিত্ব দেখিয়া বিস্ময় মানেন।

প্রবীণেরা বলেন, "পুণ্যসদন, তুমি সত্যই মহা ভাগ্যবান। শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তাই এমন মহা প্রতিভাধর বালককে পুত্ররূপে পেয়েছ। এর শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করো না। এখানে না রেখে, রামদত্তকে বরং পাঠিয়ে দাও বারাণসীতে। সেখানকার দিক্‌পাল পণ্ডিতদের কাছে থেকে সে সর্ব্বশাস্ত্র পারঙ্গম হয়ে উঠুক। এ গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হোক্।"

পুণ্যসদনের দুই চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। উত্তর দেন, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ সফল হয়ে উঠুক। কিন্তু কোন্ প্রাণে এখনি এই কচি শিশুকে আমরা বারাণসীতে পাঠাবো? আরো কয়েকটা বৎসর বরং যেতে দিন।"

রামদত্তের বয়স তখন মাত্র বারো বৎসর। ইহারই মধ্যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বহু দুরূহ পাঠ সে আয়ত্ত করিয়াছে, দেখাইতেছে অমানুষিক বিদ্যাবত্তা। পুণ্যসদন চিন্তা করিলেন, পুত্রকে আর এই গ্রাম্য পরিবেশে রাখা ঠিক নয়। প্রতিভার সম্যক বিকাশের জন্য উন্নততর শিক্ষাক্ষেত্রে এবার তাহার যাওয়া প্রয়োজন।

তখনকার দিনে বারাণসীধাম ছাড়া এমন স্থান আর কোথায়? ভারতের দিক দিগন্ত হইতে বিখ্যাত আচার্য্য ও শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরা এই পুণ্যধামে আসিয়া জড়ো হইতেছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, বিচার বিতর্ক ও ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠানে এ নগরী সদাই মুখর হইয়া রহিয়াছে। পুণ্যসদন পুত্রকে এখানেই প্রেরণ করিলেন।

শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ গ্রহণের জন্য রামদত্তকে ভর্ত্তি করা হয় এক

স্মার্ত্ত আচার্যের চতুষ্পাঠীতে। এখানে বাস করার কালেই হঠাৎ সেদিন রাঘবানন্দজীর সহিত ঘটে তাহার ঐ নাটকীয় সাক্ষাৎ। সমর্থ গুরুর আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শুরু হয় এই বালক-শিষ্যের নূতনতর সাধনজীবন।

নবীন শিষ্যের প্রতি রাঘবনন্দজীর স্নেহের অন্ত নাই। আন্তরিক যত্নে, মনের মত করিয়া তিনি তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন। গুরু বুঝিয়া নিয়াছেন, রামানন্দ এক শুদ্ধসত্ত্ব আধার, বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই আগ্রহের সহিত বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র ও সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব একের পর এক তাঁহার নিকটে তিনি উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকেন। শক্তিমান শিষ্যের জীবনপাত্র ভরিয়া তোলেন উদার দাক্ষিণ্যে।

গুরুর এই কৃপার ধারা ধারণ করিতে সাধক রামানন্দও কিন্তু কম যোগ্যতা দেখান নাই। একান্ত নিষ্ঠায়, দিনের দিন পর তিনি আগাইয়া চলেন আত্মিক সাধনার দুরূহ পথে।

রাঘবানন্দ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দিক্‌পাল আচার্য্য, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। দক্ষিণ দেশ হইতে চলিয়া আসিয়া কাশীধামে ভক্তিধর্ম্মের এক নব মধুচক্র তিনি রচনা করিয়া বসিয়াছেন। এই শিবধামে—বেদান্তী, শৈবপন্থী ও যোগীজন অধ্যুষিত এই মহাতীর্থে—আনয়ন করিয়াছেন বৈষ্ণবীয় সাধনার ভাবপ্রবাহ।

এবার রামানন্দকে পাইয়া রাঘবানন্দ স্বামীর অন্তরে মহা উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই শ্রুতিধর, শক্তিমান নবীন শিষ্যকে তিনি নিজের অভিলাষ অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবেন। উত্তর ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আচার্য্যরূপে তাঁহাকে করিবেন প্রতিষ্ঠিত। রামানুজীয় তত্ত্ব ও ভাবধারা উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তারিত করিতে রাঘবানন্দ বড় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। একাজ সম্পন্ন না হওয়া অবধি অন্তরে তাঁহার

স্বস্তি নাই। এবার শিষ্য রামানন্দের মধ্যে অভীষ্ট পূরণের এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি দেখিতে পাইয়াছেন।

দীর্ঘ দিন গত হইয়াছে। রামানন্দ এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক। গুরু-দেবের কৃপায় সাধনার নানা উচ্চতর উপলব্ধি, শক্তি বিভূতি, তিনি লাভ করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এক মর্ম্মী ব্যাখ্যাতা হিসাবেও প্রসিদ্ধি কম হয় নাই। কাশীর সাধকসমাজে তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন অসামান্য জনপ্রিয়তা।

গুরু হঠাৎ সেদিন একান্তে রামানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় সাধন ভজনে তুমি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছ। তোমার ঐকান্তিকতা ও ভক্তিনিষ্ঠা দেখে আমি সন্তোষ লাভ করেছি। কিন্তু বৎস, মঠের অভ্যন্তরে বসে, বাঁধা ছকের নিশ্চিন্ত আরামে তো সাধকের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না!"

"প্রভু, তবে কৃপা ক'রে আদেশ করুন, কি আমায় করতে হবে।"

"এবার তোমায় পরিব্রাজনে বেরিয়ে পড়তে হবে। চলতে হবে অজানা, বন্ধুর পথে। আশ্রমের নিভৃতি আর স্নিগ্ধ তরু-ছায়ায় বসে প্রভুজীর নাম জপ্‌ছো, সাধন ক'রে যাচ্ছো। ফলও ভালই পেয়েছো। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে, হুঁচোট খেয়ে—সে নামজপ, সে সাধন ঠিক থাকে কি না, তা যে পরখ ক'রে দেখতে হবে। তাছাড়া, বৎস, আদিষ্ট ঐশীকর্ম্ম রয়েছে তোমার জীবনে। আমি চাই, এই পরিব্রাজনের ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এবার তুমি লাভ কর। তাদের অন্তরের অভাব ও দৈন্যকে ভাল ক'রে জানতে শেখো। তাদের সুখদুঃখের ভাষা বুঝে নাও।"

গুরুদেবের আজ্ঞা রামানন্দ শিরোধার্য্য করিয়া নিলেন। অচিরে এক সাধু জমায়েতের সঙ্গে বাহির হইলেন তীর্থ পর্য্যটনে।

কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা, গুজরাট হইতে গঙ্গাসাগর তিনি এ সময়ে পরিভ্রমণ করেন। তীর্থ ও সাধুসঙ্গের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান দেশের দিকে দিকে।

বদরীধামে উপনীত হইয়া রামানন্দ দীর্ঘদিন শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। তারপর সেখান হইতে গঙ্গাধারার কূলে কূলে পূর্ব্বাঞ্চল অভিমুখে তিনি অগ্রসর হন। কথিত আছে, গঙ্গা নদীর মোহনায় গঙ্গাসাগর তীর্থে উপনীত হওয়ার পর রামানন্দ দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। এই ভাবাবেশের মধ্যেই সেখানকার সাগর উপকূলে তিনি আবিষ্কার করেন কপিলমুনির প্রাচীন সাধনপীঠ। স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় অচিরে সেখানে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরকালে এই পুণ্যময় স্থানই হইয়া উঠে লক্ষ লক্ষ ভক্তের দর্শনীয় তীর্থস্থান।

কয়েক বৎসর পরিব্রাজনের পর স্বামী রামানন্দ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গুরু রাঘবানন্দজীর আনন্দের অবধি নাই। রামানন্দ তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য। প্রতিভাধর, শাস্ত্রবিদ্‌ ও উচ্চ স্তরের সাধক-রূপেও সে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এবার বৃদ্ধ বয়সে তাহারই হস্তে আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া গুরু মহারাজ নিশ্চিন্ত হইতে চান। রামানন্দ চরণ বন্দনা করিতেই সস্নেহে তিনি আলিঙ্গন দিলেন, জ্ঞাপন করিলেন আন্তরিক স্নেহাশীষ।

স্নানতর্পণ ও পূজাদির শেষে রামানন্দ মন্দিরের অলিন্দে আসিয়া বসিয়াছেন। গুরুর মন আজ বড় প্রসন্ন। সস্নেহে কহিলেন, "বৎস রামানন্দ, বহুদিন পরে তুমি মঠে ফিরে এসেছো। আমার ইচ্ছে, আজ শ্রীবিষ্ণুর ভোগরাগের উত্তম আয়োজন হোক্, তোমার রন্ধিত ও নিবেদিত বস্তু আশ্রমিকেরা সবাই মিলে প্রসাদ পাক্।"

একে ইষ্টদেবের ভোগ রান্না, তদুপরি গুরুদেব সে প্রসাদ পাইবেন, রামানন্দ তো মহাপুলকিত। তখনি পাকশালায় যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রামানুজী সম্প্রদায়ে ভোগ রন্ধন করা হয় অদ্ভুত নিষ্ঠা সহকারে। বাহিরের লোকের স্পর্শদোষ তো দূরের কথা, দৃষ্টিও পক্ক বস্তুর উপর

পড়িতে পারে না। বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিলে সব কিছু একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ঠাকুরের ভোগ নিবেদনও এমনি নিষ্ঠার মধ্য দিয়া ভক্তেরা সম্পন্ন করেন।

মঠের পাকশালাটি শ্রীমুর্ত্তির সেবার এক পবিত্র কেন্দ্র। আশ্রমের সকল সাধুই প্রাণপণে এ স্থানের শুচিতা রক্ষা করেন।

কয়েকটি সতীর্থ রামানন্দকে তেমন সুচক্ষে দেখে না। গুরু তাঁহাকে অতিরিক্ত স্নেহ করেন—ইহা তাহাদের কাছে অসহ্য। তাছাড়া, গুরু যে মনে মনে রামানন্দকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন, মোহন্তের গদি যে তাঁহারই হইবে—ইহাও এ বিরুদ্ধবাদীদের অজানা নাই। এবার তাহারা দলবদ্ধভাবে আগাইয়া আসে রামানন্দকে অপদস্থ করার জন্য।

দলের মুখপাত্র সাধুটি করজোড়ে গুরুদেবকে নিবেদন করেন, "প্রভু, রামানন্দ মঠের ভোগশালায় প্রবেশ করার আগে আমরা গুটিকয়েক প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি কৃপা ক'রে এতে অনুমতি দিন।"

"বেশ তো, বল কি বলতে চাও তোমরা। উভয়পক্ষের কথা শোনবার জন্য আমি আগ্রহ বোধ করছি।"

এবার বিরোধীদলের প্রশ্ন বর্ষিত হয় রামানন্দের উপর। "আচ্ছা ভাই, আমাদের শ্রীসম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে শ্রীবিষ্ণুর মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, নয় কি?"

"হ্যাঁ! সম্প্রদায়ের সবারই কাছে এটা সুবিদিত।"

"ভোগ-প্রসাদ রাঁধতে, আর ইষ্টের কাছে তা নিবেদন করতে যে নিয়মনিষ্ঠা পালন করতে হয়, তাও নিশ্চয় তোমার জানা আছে?"

"নিশ্চয়।"

"তুমি তো এ কয় বৎসর নানা তীর্থে, নানা জনপদে ঘুরে এলে। পরিব্রাজক জীবনে বাস করতে হয়েছে কত অজানা গৃহে, মিশেছো জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে কত লোকের সাথে। আচ্ছা ভাই, ভোগ-

রাগের শুচিতা কি তুমি সর্ব্বত্র, সর্ব্ব সময়ে ঠিক রাখতে পেরেছিলে? কোন স্পর্শদোষ, কোন দৃষ্টিদোষ কখনো কি ঘটেনি? গুরুদেবের সামনে সত্য কথা বল।"

"তা সত্যের খাতিরে বলতে হয়, সে সব দোষ ঘটেছে বইকি। অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে। মঠের বাইরে সব সময় তো আচারগত নিয়মনিষ্ঠা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে জীবন সাধনাকে এতো বিড়ম্বিত করে তোলাই বা কেন? অনেক দিন হ'লো আমি ভাব্‌ছি, আমাদের প্রেমভক্তির আদর্শ ও আচরণে ঘটেছে এক মর্ম্মান্তিক স্বতঃবিরোধ। এর অবসান ঘটলেই আমি খুসী হবো।"

"তা'হলে, কি তুমি বলতে চাও—স্পষ্ট করে বলো।"

"বলতে চাই, প্রভু জগন্নাথকে ভজনা করবো, কিন্তু জগন্নাথধামে যেমন ক'রে প্রসাদ বিতরণ করা হয়—নির্বিবচারে, ছোঁয়াছুঁয়ির কোন দোষ না দেখে—তা করবো না, এ নীতিকে আমি মনে করি নিতান্ত অযৌক্তিক।"

"মনে রেখো রামানন্দ, জগন্নাথ যা পারেন, আমরা তা পারিনে —পারা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাই তো আচার্য্য রামানুজ সরে এলেন মহাধাম শ্রীক্ষেত্র থেকে।"

"আমি জগন্নাথক্ষেত্রের ধারাকেই সর্ব্বত্র করবো প্রবর্ত্তিত। আন্‌বো সর্ব্ব ভেদবিবাদহীন উদার বৈষ্ণবতা।"

"কিন্তু তোমার এ কাজ তো এই মঠে থেকে, সম্প্রদায়ের ভেতরে থেকে হতে পারবে না, ভাই।"

আচার্য্য রাঘবানন্দ নীরবে এতক্ষণ এ বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন। এবার তাঁহাকে মুখ খুলিতে হইল। কহিলেন, "তোমাদের কথা সবই আমি শুন্‌লাম। বৎস, রামানন্দ, তুমি কি সত্যই তোমার এই বৈপ্লবিক মতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাও? এজন্য চরম মূল্য দিতে তুমি পশ্চাদ্‌পদ নও?"

দৃঢ় প্রশান্ত কণ্ঠে রামানন্দ উত্তর দেন, "গুরুদেব, যা বলেছি তা একান্তভাবে আমার মনের কথা। ভগবান বাসা বেঁধে আছেন ভক্তদের হৃদয়ে হৃদয়ে। ভগবানকে ভালোবাস্‌বো, তাঁর ভক্তকে বাস্‌বো না— এ তো কখনো হতে পারে না। ভক্ত সমাজকে বিভক্ত করার কথা কোন দিনই আমার চিন্তায় স্থান পায় না। প্রভু, এ মতবাদ অনেক আগে থেকেই অমার অন্তরে জেগেছিলো। পরিব্রাজনের এ কয়টি বৎসরে তা আরো দৃঢ় হয়েছে। মঠের বাইরে গিয়ে, বৃহত্তর জগতকে— মানব সমাজকে, আমি নিবিড় করে দেখতে পেয়েছি। আর তাকে দেখেছি সমকালীন সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের আলোতে।"

রাঘবানন্দ মহারাজ আপন মনে কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া নিলেন। তারপর কহিলেন, "শোন তোমরা। আমি আমার চরম সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছি। এতকাল ধরে গুরুপরম্পরাক্রমে যে আদর্শ, যে আচার নিয়ম এ মণ্ডলীতে চলে আসছে, তার ব্যতিক্রম করার কোন সাধ্য আমার নেই। তা পূর্ব্ববৎ চলতে থাকবে। তবে একথাও স্বীকার করবো, রামানন্দ যা বল্‌ছে তার পেছনে রয়েছে তার নিজের বিশ্বাস ও উপলব্ধ সত্য। ভক্তিপ্রেম সাধনার গভীরে প্রবেশ ক'রেই সে একথা বলতে পেরেছে। তাই আমি নিজে থেকেই তাকে মুক্তি দিচ্ছি সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে।"

নতজানু হইয়া রামানন্দ আচার্য্যের চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। বিরুদ্ধবাদী সতীর্থের দল চিত্রার্পিতের মত দণ্ডায়মান, কাহারো মুখে কোন কথা সরিতেছে না।

প্রিয়তম শিষ্যকে আশীষ জানাইয়া রাঘবানন্দ মহারাজ কহিলেন, "বৎস, তুমি তোমার উপলব্ধ সত্যকেই অবলম্বন করে থাকো। আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি তোমার নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে যাও, প্রতিষ্ঠা ক'র নূতন মণ্ডলীর। নূতন যুগের নূতন ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রেমভক্তির বাণী তুমি শোনাও। আশীর্ব্বাদ করি, অগণিত মানুষের কল্যাণ হোক তোমার মাধ্যমে।"

গুরু ও গুরুভ্রাতাদের কাছে বিদায় নিয়া সেই দিনই রামানন্দ আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলেন।

সেদিনকার আদর্শ-সংঘাত ও রামানন্দ কর্ত্তৃক মঠ ও মণ্ডলী পরিত্যাগ সারা উত্তর ভারতের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে এমন এক বিপ্লবের সূচনা করে যাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। এ বিপ্লবের প্রভাব শুধু রামানন্দের অনুবর্ত্তী শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সারা ভারতের জনসমাজে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার আদর্শ ও উদার মতবাদ জনগণের শিক্ষা দীক্ষা ও বিশ্বাসকে ক্রমে উজ্জীবিত করিয়া তোলে।

গুরুর নির্দ্দেশ রামানন্দ মানিয়া নেন। অচিরে রামাওয়ৎ নামে এক নূতন ভক্তিবাদী সম্প্রদায় তিনি গঠন করিয়া তোলেন। তাঁহার নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামানন্দী বলিয়াও অভিহিত হইতে থাকে।"[১]

সম্প্রদায়ের গণ্ডী চিরতরে ছিন্ন করিয়া স্বামী রামানন্দ বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এবার আর তাঁহার নিজস্ব মতবাদ প্রচারের পথে কোন বাধা নাই। শুধু কাশীতেই নয় ভারতের নানা তীর্থে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নব ধর্ম্মান্দোলনকে তিনি প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন।

সাধন সম্পর্কে রামানন্দ সর্ব্বাধিক জোর দেন ত্যাগ বৈরাগ্যের উপর, জাগতিক সমস্ত কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করিয়া নিজে হন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধনকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে চারি শ্রেণীর নাগা সাধু। উত্তর ভারতের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে এই সাধুদের অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম।

রামানন্দ অসাধারণ শাস্ত্রবিদ্। তাই প্রথম হইতেই শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া নিজের মতের পরিপোষক তথ্য ও যুক্তি সংগ্রহ করিতে

১ জর্জ, এ, গ্রীয়ারসন: এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিক্‌স্—ভল্যু-১০, পৃঃ ৫৭০

থাকেন। একাজে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি।

শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া নবীন আচার্য্য ঘোষণা করেন,—যে ভক্ত ভগবানের শরণ নেয়, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে, জাতিভেদ মানিয়া চলার প্রয়োজন তাহার নাই। আরো তিনি দেন নির্দ্দেশ, যে তাঁহার সম্প্রদায়ের আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণ করিবে, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সে-ই লাভ করিবে একত্রে পান ভোজন করার অধিকার। ভগবানের সেবাপূজা একই বিধি অনুযায়ী যাহারা সম্পন্ন করে, একই সামাজিক মর্য্যাদা তাহাদের।

শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, রামানুজ সাধারণ ভক্তদের জন্য বহু কঠোর আচার-আচরণ ও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রামানন্দ তাহার অনেক কিছু পরিবর্ত্তিত করিলেন। ধর্ম্মসাধনার দুয়ার মানুষের জন্য করিয়া দিলেন উন্মুক্ত।[১]

তাঁহার সেদিনকার পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা জনমনে আনিয়া দেয় নূতন সাহস ও নূতন আশার আলোক-সঙ্কেত।

ফলে অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত, সমাজের নীচেকার মানুষ জাগিয়া উঠে অপূর্ব্ব আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে। সে ভাবিতে শিখে,—ঈশ্বরীয় কৃপা ও জ্ঞানের আলোকচ্ছটা মানুষকে আনিয়া দিবে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি, সমাজ জীবনের বন্ধন ও নিষ্পেষণ এড়াইয়া সে এবার বাঁচিবে।

ভগবৎ-প্রেমে স্বামী রামানন্দের সর্ব্বসত্তা ছিল পরিপ্লাবিত। তেমনি ভগবানের সৃষ্ট জীবের প্রতি, সর্ব্ব মানবের প্রতি তাঁহার প্রেম ও করুণার অবধি ছিলনা। সকলেরই জন্য মুক্তির পথ, ভগবৎ-আরাধনার পথ তিনি সারা জীবন ভরিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার নির্দ্দেশিত সাধনার অন্যতম অঙ্গ শ্রীভগবানের নাম জপ। এই জপের উপর তিনি সদাই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। বলিতেন,—

১ ম্যাকলিফ্ : হিষ্টরি অব শিখ্ রিলিজিয়ন—ভল্যু ৬, পৃঃ ১০৮

হে মুমুক্ষু, ভগবানের নামমন্ত্র নিরন্তর জপ ক'র, তাহাতেই মিলিবে পরমা মুক্তি, সিদ্ধ হইবে সর্ব্ব অভীষ্ট।

সমাজ ও ধর্ম্মাচরণের অনাবশ্যক আচার নিয়ম হইতে তাঁহার শিষ্যেরা মুক্ত, তাই তাঁহারা সাধুসমাজে অভিহিত হইতেন 'অবধূত' বা সর্ব্বপাশমুক্ত সাধকরূপে।

নিরীশ্বরবাদী বা ভগবৎবিমুখ তার্কিকদের দমনে স্বামী রামানন্দের উৎসাহের সীমা ছিল না। অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও ধীশক্তি নিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে ইহাদের তিনি পর্য্যুদস্ত করিতেন। তাই দেখা যায়, মধ্যযুগে তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদের প্রতাপে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কর্ম্মপরিধি অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পূর্ব্বতন বৈষ্ণব আচার্য্যগণ হইতে রামানন্দের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে গিয়া ডাঃ আর, জি, ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, "হিন্দু সমাজের নিম্ন, অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্য সহানুভূতি হইতেছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই ধর্ম্ম আন্দোলনের গোড়া হইতেই সেটি চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাচীন আচার্য্যেরা ব্রাহ্মণেতর জাতি-বর্ণের মানুষকে সাধারণতঃ দাঁড় করাইয়া রাখিতেন মণ্ডলীর বহিরাঙ্গনে, তবে এই সব লোককে নূতন পরিস্থিতি ও ভাবধারার সুযোগ সুবিধা অবশ্যই দান করা হইত। রক্ষণশীল বেদপন্থীরা চাহিতেন, এই সব মানুষ তাহাদের নিজস্ব নীচু গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক এবং জন্ম জন্মান্তরের অর্জ্জিত পুণ্যের ফলে আবার ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক—তারপর তাহাদের সেই নবলব্ধ উন্নত জীবনে শুরু হোক মোক্ষের সাধনা। বৈষ্ণবীয় পন্থা ও আদর্শ অনুযায়ী যে কোন সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে মোক্ষলাভের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু রামানুজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ আচার্য্যেরা বেদভিত্তিক ভক্তিসাধনার ব্যবস্থা দিতেন শুধু উচ্চবর্ণের সাধকের জন্যই। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির জন্য ছিল ভিন্ন ব্যবস্থা।[১]

১ ডাঃ আর, জি, ভাণ্ডারকর : বৈষ্ণবিজম, শৈবিজম অ্যাণ্ড মাইনর রিলিজিয়াস্ সিস্টেম্স্ : পৃঃ ১৩০।

রামানন্দ কিন্তু এ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করেন। ব্রাহ্মণ এবং নিম্নবর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্যই তিনি রাখেন নাই। এমন কি, শুধু বিষ্ণুর উপাসক এবং সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই যে কোন লোক সবার সাথে পঙ্গতে বসিয়া আহারের অধিকার প্রাপ্ত হইত।

রামানন্দের আর একটি বড় সংস্কারমূলক অবদান—তাঁহার নব ভক্তিবাদের প্রচারে সাধারণের চলতি ভাষার ব্যবহার। রাধাকৃষ্ণের রাগানুগা ভজনের স্থলে রামসীতার শুচি-শুদ্ধ আরাধনার প্রবর্ত্তনও তাঁহার আচার্য্য জীবনের এক বিশিষ্ট কীর্ত্তি।

রামানন্দের সাধনা ও দার্শনিক তত্ত্বের মূল কথা—ভগবৎ-প্রেম। পুরুষ বা নারী, ব্রাহ্মণ বা অন্ত্যজ, যে কোন ধরণের ভক্তই হোক্ না কেন, ভগবানের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। রামানন্দী সম্প্রদায়ে তাই তাহাদের সমান অধিকার দেওয়া হয়।

ভগবানের ভক্তসমাজ মানেই এমন এক সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃসমাজ যেখানে ভেদ বিভেদের গণ্ডী রচনার প্রশ্ন আসে না। তাই সকলেরই জন্য তাঁহার রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ের দুয়ার থাকে সদা উন্মুক্ত।[১]

শ্রীবৈষ্ণবদের মত রামানন্দ শুধু ব্রাহ্মণদেরই আচার্য্যের পদে নিয়োজিত করেন নাই, অব্রাহ্মণদেরও তিনি সাদর আহ্বান জানান প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারে। সেদিনকার সংরক্ষণশীল সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধ্বনিত করেন উদার আশ্বাসের বাণী—

জাতি পাতি পুছই নহি কোই।
হরিকো ভজই সো হরিকো হোই।

—ওরে ভাই, প্রশ্ন ক'রোনা কাউকে জাতি নিয়ে, জানতে চেয়োনা কোন্ পংক্তিতে বসে সে খায়। হরিকে যে করবে ভজন, সেই হয়ে যাবে হরির আত্মজন।

১ কালক্রমে রামাওয়ৎদের মধ্যে এই উদার সমাজবোধের অভাব ঘটে এবং জাতিগত ভেদবৈষম্য আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

রামানন্দের উপাস্য ও ইষ্টদেব এই হরির স্বরূপ কি? কে তিনি?

বিষ্ণুর অবতার, রামায়ণ মহাকাব্যের আদর্শ নায়ক, পূতচরিত রামচন্দ্রই রামানন্দের ইষ্ট। এই পরমপুরুষই রামাওয়ৎ পন্থীদের সাধনার ধন। রামমন্ত্র আর রাম-ভজনের মধ্য দিয়াই সে যুগের অগণিত আশ্রিত ভক্ত ও সাধকের জীবনে আচার্য্য রামানন্দ আনিয়াছিলেন অপূর্ব্ব রূপান্তর।

আজিও রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রথার অনুকরণে উত্তর ভারতের জনসাধারণ 'রাম রাম' 'জয় রাম' বা 'সীয়া রাম' বলিয়া পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, সৌজন্য প্রকাশ করে।

রামানন্দের সংস্কারপন্থী মন, উদার সমাজবোধ ও শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা প্রবর্ত্তনের পিছনে দেশের সমকালীন ইতিহাসের প্রভাব বেশ কিছুটা রহিয়াছে।

চৌদ্দ শতকের অধিকাংশ কাল এই আচার্য্য জীবিত ছিলেন। খিলজি বংশের শেষ সুলতানদের রাজত্ব তিনি দেখিয়াছেন, তুঘলক সুলতানদের সকলেরই শাসনকালের অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনে আছে। আলাউদ্দীন যখন চিতোর আক্রমণ করেন, রামানন্দ স্বামী তখন যুবক মাত্র। আর মহম্মদ তুঘলকের পাগলামী ও অত্যাচার যখন জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে তখন তিনি এক প্রবীন ভক্ত সাধক, দেশের দিকে দিকে পরিব্রাজন করিয়া বেড়াইতেছেন। রামানন্দের যে দীর্ঘ আয়ুষ্কালের কথা শোনা যায় তাহাতে মনে হয়, তৈমুরের দিল্লী অধিকার ও নৃশংস হত্যালীলার কাহিনী তাঁহার কাছে অজানা ছিলনা।

গবেষক গ্রীয়ারসন বলেন, "ইহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না যে, তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক দুর্দ্দৈব ও দুর্দ্দশা স্বামী রামানন্দের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। পরম কৃপালু, মহিমান্বিত বীর যোদ্ধা রামচন্দ্রের উপাসনার তত্ত্ব তিনি দেশের জনজীবনের সর্ব্বস্তরে

বিস্তারিত করেন এবং সে সময়ে সর্ব্বত্র উহা যথেষ্ট সমর্থনও পায়—ইহার কারণ, বিদেশী শাসনের গ্লানি ও লাঞ্ছনা সাধারণ মানুষকে ঐ মহাশক্তিধর উপাস্যের দিকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল।[১]

রামানন্দ ও তাঁহার প্রধান শিষ্যদের প্রচারিত রামসীতা-তত্ত্ব এদেশের ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনের এক বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করে। ত্যাগ বৈরাগ্য, শুচিতা ও সংযমের সঙ্গে তাঁহার নূতনতর আন্দোলন সর্ব্ব সমক্ষে তুলিয়া ধরে পৌরাণিক যুগের তেজবীর্য্য, শক্তিমত্তা ও আদর্শ চরিত্র।

পরবর্ত্তী কালে রাধাকৃষ্ণ যুগলভজনের ব্যপদেশে কোন কোন ভক্তিবাদী উপদলের মধ্যে অবাঞ্ছিত আচার আচরণের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। রামাওয়ৎ সিদ্ধ সাধকদের উচ্চতর তত্ত্ব ও আদর্শের প্রচারে তাহাদের কদাচার সে সময়ে অনেকটা কমিয়া আসে।

রামানন্দের ধর্ম্মীয় আদর্শ ও জীবনদর্শন প্রধানতঃ প্রচারিত হয় হিন্দি ভাষার মাধ্যমে। তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের রচনাও প্রকাশিত হয় হিন্দি-আশ্রিত নানা উপভাষায়। রামানন্দের নিজের লিখিত উপদেশ বা বাণী অতি যৎসামান্যই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার শিষ্য সুখানন্দ এবং বিশেষ করিয়া অন্যতম উত্তরসাধক কবীরের অজস্র রচনা হিন্দিতেই লিখিত। রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদের প্রভাবেই যে হিন্দি ভাষা ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হয়, সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়, আজ আর তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

হিন্দি সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন তুলসীদাস ছিলেন এক বিশিষ্ট রামাওয়ৎ সাধক। তাঁহার অধিকাংশ ভক্তিরসাশ্রিত কাব্য রামানন্দেরই শিক্ষার ফলশ্রুতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই রামানন্দের কাছে ভারতীয় ভক্তিসাধনা ও সাহিত্যের ঋণ যে কত তাহার পরিমাপ করা সহজ নয়।

১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্‌স্—ভল্যু-১০, পৃঃ ৫৭০-৭১।

আচার্য্যজীবন শুরু হওয়ার পর একে একে আসিতে থাকে রামানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্যদল। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য, বিদ্বান ও নিরক্ষর, নারী ও পুরুষ—সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ। প্রধান শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অনন্তানন্দ, সুখানন্দ, সুরেশ্বরানন্দ, নরহরিয়ানন্দ, যোগানন্দ, গালভানন্দ, পিপানন্দ, কবীর, ভবানন্দ, সেনানন্দ, রইদাস, পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী।

পদ্মাবতী আর সুরেশ্বরী এই দুইজন রামানন্দের নারী শিষ্যা। তাঁহার পুরুষ শিষ্যদের মধ্যে কবীর মুসলমান জোলা বংশীয়। ধনানন্দ জাতিতে জাঠ, রইদাস চর্ম্মকার, সেনানন্দ ক্ষৌরকার।

আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এই শিষ্যেরা উন্নত স্থান অধিকার করেন এবং এক একটি বিশিষ্ট ভক্তমণ্ডলী ইঁহাদের কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। রামানন্দের এই সব সাক্ষাৎ শিষ্যদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া ভক্তিধর্ম্মের উচ্ছল রসস্রোত দেশের সর্ব্বত্র ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

রামাওয়ৎ সম্প্রদায়ে অনন্তানন্দ এক বিশেষ মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। স্বামী রামানন্দের তিনি প্রথম শিষ্য। দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই তাঁহার জীবনে আসে ভক্তিপ্রেমের জোয়ার। যোধপুর অঞ্চলে সাধন কুটির স্থাপন করিয়া এই ত্যাগী সাধক রাজ্যের সর্ব্বত্র গুরুর সাধনতত্ত্ব ও জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া বেড়ান।

জনশ্রুতি আছে, অনন্তানন্দ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অসামান্য যোগবিভূতির বলে সে-বার এক মৃত যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া যোধপুরের মহারাজা বিস্ময়বিমূঢ় হন, শক্তিধর মহাত্মার চরণতলে তিনি শরণ নেন।

ভক্ত কবি সুখানন্দের জীবনে রামানন্দের পবিত্র স্পর্শ উৎসারিত করে ঐশী প্রেমের অমৃত নির্ঝর। সুখানন্দের রচিত অজস্র সঙ্গীত,

গাথা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া হাজার হাজার নরনারীর জীবন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। তাঁহার ভক্তিরসাপ্লুত রচনাসমূহ হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

ভক্ত কবীর যে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়া আচার্য্য রামানন্দের আশ্রয় লাভ করেন, তাহা সুবিদিত। রামানন্দের সাধনা ও বাণী এই তরুণ মুসলমান জোলার জীবনে আনয়ন করে অপূর্ব্ব রূপান্তর। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমিয়া সাধকরূপে কবীর দাস আত্মপ্রকাশ করেন। উত্তর ভারতের জনজীবন ও সাহিত্য দীর্ঘদিন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও রচনা দ্বারা উজ্জীবিত হয়।

সুরেশ্বরানন্দ ও তাঁহার পত্নী সুরেশ্বরী উভয়েই ছিলেন স্বামী রামানন্দের অশেষ কৃপাভাজন। উত্তরকালে বহু সাধকের পথপ্রদর্শক-রূপে সুরেশ্বর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তি-বিভূতির নানা কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে।

সে-বার জনকয়েক ভক্ত শিষ্যসহ তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর সবাই অতিশয় ক্লান্ত। নগরীর উপকণ্ঠে সেদিনকার মত বিশ্রামের স্থান নির্ব্বাচন করা হয়।

এমন সময় একটি স্থানীয় লোক সেখানে আসিয়া আলাপ জুড়িয়া দেয়। আগন্তুক সদালাপী। তাছাড়া, মালা তিলকধারী এই বৈষ্ণব সাধুদের দর্শন করিয়া সে মহাপুলকিত। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সবিনয়ে প্রস্তাব করিল, "প্রভুরা যখন দয়া করে এখানে এসেছেন, এই অধমকে আপনাদের সেবায় একটু লাগতে দিন। কাছেই রয়েছে আমার খাবারের দোকান। সেখান থেকে আপনাদের ভোজনের জন্য সামোসা, পুরী, তরকারী সব এক্ষুনি গরম গরম ভেজে এনে দিচ্ছি। সবাই সারাদিন হেঁটে শ্রান্ত হয়েছেন, আজ আর রান্নার ঝামেলা না-ই বা করলেন।"

লোকটির দৈন্যের সীমা নাই। বৈষ্ণব সেবার জন্য বারবার সে অনুনয় করিতেছে, এড়ানো বড় কঠিন। অগত্যা তাহার আনীত আহার্য্যই ইষ্টদেবকে ভোগ দেওয়া হইল। সকলে ভক্তিভরে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

ভোজনের পর বেশ কিছুকাল কাটিয়া গিয়াছে। গুরু সুরেশ্বরানন্দ পাশের প্রকোষ্ঠে নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন। এমন সময় শিষ্যেরা উত্তেজিত অবস্থায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

দলের মুখপাত্র নিবেদন করিলেন, "গুরুদেব, সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমরা সবাই আজ এক পাপাত্মার কবলে পড়ে জাত ধর্ম্ম খুইয়েছি যে লোকটা এতো যত্ন করে আমাদের ভোজন করালো, আসলে সে হচ্ছে এক ঘোর পাষণ্ড। বৈষ্ণব সাধু দেখলেই, কপট ভক্ত সেজে সে তাঁদের ঠকায়। এইমাত্র সে বিদ্রূপের সুরে ব'লে গেল,—আমাদের খাবারে সে মাংসের কুচি মিশিয়ে দিয়েছিল। আর তা এমনি নিপুণভাবে দিয়েছিল যে আমরা টের পাইনি! এখন উপায়?"

সুরেশ্বরানন্দ কিন্তু নির্ব্বিকার। আত্মপ্রত্যয় ভরা কণ্ঠে ভক্তদের কহিলেন, "বৎসগণ, তোমরা বৃথা এতো চিন্তিত হয়েছো। তোমরা যা ভোজন করেছো, তা কি ঠাকুরের প্রসাদ ক'রে খাওনি? সত্যকার ভক্তি ও বিশ্বাস কি তাহ'লে তোমাদের ছিল না?"

সবাই একে অন্যের দিকে চাহিতেছেন, কাহারো মুখে কোন কথা ফুটিতেছে না।

এবার সুরেশ্বরানন্দ কহিলেন, "বেশ তো, তা হ'লে তোমরা এক কাজ ক'র। যে যা খেয়েছো এখনি বমন ক'রে ফেলো। আমি বলছি, যে সব বস্তু তোমাদের পাকস্থলীতে গিয়েছে তা এবার পৃথক পৃথকভাবে বেরিয়ে আসবে।"

গুরুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একের পর এক শিষ্যেরা বমন করিলেন। গলনালী দিয়া বাহির হইয়া আসিল আটা, ঘৃত, শাক সব্জির সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড। সকলের বিস্ময় ও ক্ষোভের সীমা রহিল না।

এবার গুরু সুরেশ্বরানন্দের পালা। তিনি কিন্তু মুখবিবর হইতে উদ্‌গীরণ করিলেন একরাশ তুলসীপত্র।

এ দৃশ্য যেমনি অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বাস্য! সকলে হতবাক হইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন।

সুরেশ্বরানন্দ সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা না জেনে যে অখাদ্য খেয়েছিলে, তা শ্রীগুরুর কৃপায় নিষ্কাশিত হয়ে গেল। আর আমার পাকস্থলী থেকে উঠে-আসা তুলসীপত্রের কথা ভাবছো? বাবা, এতে আশ্চর্য্য হবার সত্যই কিছু নেই। অন্তরে যদি কলুষ না থাকে, ইষ্টদেবের ভোগ যদি সত্যকার ভক্তি নিয়ে নিবেদন ক'র, তবে তা এমনিতর পবিত্র বস্তুতেই রূপান্তরিত হতে পারে। আজকের এই দুর্দ্দৈবের ভেতর দিয়ে গুরুশক্তি এই তত্ত্বটিই আমাদের মনে গেঁথে দিয়ে গেল।"

রামাওয়ৎ মণ্ডলীতে সুরেশ্বরানন্দ আরও এক কারণে স্মরণীয় হইয়া আছেন। এই মহাত্মার শিষ্য পরম্পরার মধ্য দিয়াই উত্তরকালে আত্মপ্রকাশ করেন অমর ভক্তকবি, তুলসীদাস।

রামানন্দের আর এক বিশিষ্ট শিষ্য গাংড়োনের রাজপুতবংশীয় রাজা পিপাজী। গুরু সকাশে মুমুক্ষু পিপার আগমনের কাহিনীটি বড় বিচিত্র।

যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকার্য্য, আর বিলাসব্যসন নিয়াই বেশী সময় পিপাজীর দিন কাটে। কিন্তু তাঁহার এ রাজসিক জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক গভীর সাত্ত্বিক সংস্কার। তাই সুযোগ ও সময় পাইলেই কুলদেবীর আরাধনায় তাঁহাকে নিবিষ্ট হইতে দেখা যায়।

একদিন দেবী প্রত্যাদেশ দেন, "বৎস, কেন বৃথা এমন ক'রে নিজের সময় নষ্ট করছো। অগৌণে তুমি কাশীধামে চলে যাও। সেখানে রামানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পাবে। তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নাও, তাহলে এ জীবনেই লাভ করবে পরমা মুক্তি।"

পিপাজী তাড়াতাড়ি বারাণসীতে রামানন্দের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। করজোড়ে, দৈন্যভরে কহিলেন, "প্রভু, ভোগ বিলাস আর রাজসিকতার মোহে এতদিন ছিলাম অন্ধ। এবার আমি দেবীর কৃপায় আলোকের সন্ধান পেয়েছি। তিনিই শরণ নিতে বলেছেন আপনার চরণে। এ অধমের ভার গ্রহণ করুন। দীক্ষা দিয়ে আমায় নিয়ে চলুন অভীষ্ট সিদ্ধির পথে।"

রামানন্দ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চান। কহিলেন, "বৎস, নিছক ভাবাবেগে তো সত্যবস্তু লাভ হয় না। মর্কট বৈরাগ্য ক'দিন তোমার থাকবে, তা কে বলবে? তাছাড়া, তুমি হচ্ছো শাক্তবংশীয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছো, বিষ্ণুভক্তির রাজ্যে কি ক'রে তোমার মন টিকবে, বল? না, তোমায় আমি দীক্ষা দেবো না।"

"প্রভু আপনার কৃপা পেলে পুরানো জীবনের সমস্ত স্মৃতি নিশ্চয় আমি মুছে ফেলতে পারবো। আপনার আদেশে প্রাণ অবধি বিসর্জ্জন দিতে রাজি আছি। আমায় কৃপা করুন।"

আশ্রমের আঙিনার এক পাশে রহিয়াছে এক সুগভীর কূপ। সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আচার্য্য বলিলেন, "আচ্ছা, দেখবো তোমার কথার সত্যতা কতটুকু। এক্ষুনি ঐ কূয়োর ভেতরে লাফিয়ে পড়ো দেখি!"

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভক্ত পিপাজী সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন, ঠিক সে সময়ে রামানন্দের ইঙ্গিতে শিষ্যেরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এবার আচার্য্যের আননে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্নমধুর হাসি। কহিলেন, "বৎস,তোমায় আমি দীক্ষা দেব। কিন্তু তার আগে এক বৎসর এ আশ্রমে বাস ক'রে তোমায় করতে হবে কঠোর তপস্যা।"

গুরুর এই পরীক্ষায় পিপাজী উত্তীর্ণ হন। দীক্ষান্তে তাঁহার নূতন নামকরণ হয় পিপানন্দ। রাজ্য ও আত্মপরিজন ছাড়িয়া তিনি তপস্যার জন্য প্রবিষ্ট হন গহন অরণ্যে।

পিপাজীর প্রিয়তমা রাণী, সীতা-সহচরী ছিলেন পরম ভক্তিমতী। আচার্য্য রামানন্দের কৃপা তাঁহার উপরও পতিত হয়। গুরুর আজ্ঞা নিয়া স্বামীর সহিত তিনিও বানপ্রস্থে গমন করেন।

ভক্তমাল ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে রামানন্দের এই শিষ্য-দম্পতির ত্যাগবৈরাগ্য ও সিদ্ধ জীবনের নানা কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে।

রামানন্দের প্রদত্ত মন্ত্র চর্ম্মকার রইদাসের জীবনে ঘটায় অভাবনীয় রূপান্তর। বৈরাগ্যের কঠোরতম সাধনায় তিনি ব্রতী হন, এই সঙ্গে অবিরাম চলে ইষ্টমন্ত্রের জপ ও ইষ্টধ্যান। এই চর্ম্মকার সাধকের জীবনে যে অমৃত একদিন উপজিত হয়—উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র—সবাইকে তাহা প্রেমভরে তিনি বিতরণ করিয়া যান।

ভক্তপ্রবর নাভাদাসের রচনায় এই অন্ত্যজ সাধকের অলৌকিক বিভূতির এক কাহিনী পাওয়া যায়ঃ

রইদাসের মন্ত্রশিষ্যা, রাণী ঝালি সে-বার এক বিরাট ভাণ্ডারার অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে গুরু রইদাসকেও তিনি পরম সমাদরে নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন।

কিন্তু গণ্ডগোল বাধে পঙ্গতে উপবেশন করার সময়। সিদ্ধপুরুষ হইলে কি হয়, রইদাস জাতিতে মুচি। বহু সাধু ও ভক্ত বৈষ্ণবই সেদিন তাঁহার সঙ্গে একত্রে বসিয়া ভোজন করিতে রাজী নন। রাণী ঝালি দেবী মহা সমস্যায় পড়িলেন। প্রাণ থাকিতে গুরুর অমর্য্যাদা হইতে দিবেন না, আবার দূরদূরান্ত হইতে যে সব সাধু ভাণ্ডারায় আসিয়াছে উপবাসী অবস্থায় তাঁহারা ফিরিয়া গেলেও দুঃখের সীমা থাকিবে না।

সজল নয়নে রাণী রইদাসকে তাঁহার এই সঙ্কটের কথা নিবেদন করিলেন।

গুরু উত্তর দিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নেই। মনে কোন দ্বিধা না রেখে সব সাধুদের ভক্তিভরে অভ্যর্থনা কর, পঙ্গতে বসিয়ে দাও।

আমার জন্য ভেবোনা। অভ্যাগত সাধু মহাত্মারা ভোজন করলেই আমার ভোজন হবে।"

নির্দ্দেশ মত সবাইকে বসাইয়া দেওয়া হইল। সেদিন পঙ্গতের মধ্যে কিন্তু ঘটিতে দেখা গেল এক মহা অলৌকিক কাণ্ড। সাধুরা সবাই শ্রেণীবদ্ধভাবে ভোজন করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রত্যেকটি সারিতেই যে রহিয়াছে রইদাসের জীবন্ত মূর্ত্তি!

ভক্তকবি নাভাজীর মতে, রইদাসের ইষ্টদেবই সেদিনকার এই অঘটন ঘটান। চর্ম্মকার মহাসাধকের হৃদয়পুরে সদা তাঁহার অধিষ্ঠান, তাই তিনিই প্রাণপ্রিয় ভক্তের মর্য্যাদাকে সর্ব্বজন সমক্ষে এমন করিয়া তুলিয়া ধরেন।[১]

বেদান্ত ও শৈবধর্ম্মের মহান পীঠ বারাণসীতে রামানন্দ স্বামী বহু বৎসর অবস্থান করেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে নিজের আশ্রমে তিনি গড়িয়া তোলেন ভক্তিধর্ম্মের এক সুদৃঢ় কেন্দ্র। ভারতের দিক দিগন্ত হইতে আসিয়া তাঁহার চারিপাশে জড় হইতে থাকে অগণিত ভক্তসাধক।

গুরু রাঘবানন্দের আশীষ-বাণী আচার্য্য রামানন্দের জীবনে সফল হইয়া উঠিয়াছে। নবতর, উদারতর ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তকরূপে এখন তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত। যোগসিদ্ধির ফলে বয়স তাঁহার অনায়াসে শতাধিক বর্ষ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে।

মহাবৈষ্ণবের সিদ্ধ জীবনে এখন হইতে অবিরাম শুধু বহিয়া চলে গুরুকৃপার অমৃত-তরঙ্গ। দেখা দেয় ঐশীলীলার অজস্র প্রকাশ। সমগ্র অস্তিত্ব হইয়া উঠে ইষ্টময়। সর্ব্বাতিশায়ী পরমপ্রভুর জ্যোতিঃসত্তা ওতপ্রোত থাকে তাঁহার সর্ব্ব সত্তায়।

নানকপন্থীদের গ্রন্থসাহিব-এ স্বামী রামানন্দের রচিত যে গাথা

১ নাভাদাস: ভক্তমাল (টীকা: প্রিয়াদাস; সম্পাদন: ভগবানপ্রসাদ

সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার এ সময়কার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির রূপটি ফুটিয়া উঠিতে দেখি। তিনি গাহিতেছেন :

কোথায় কোন্ দিকে আর করবো
পরিব্রাজন ?
করবো কোথায় যাওয়া-আসা ?
আমি যে ভাস্‌ছি সদাই
দিব্য আনন্দের রসস্রোতে
আপন গোপনপুরে বসে।
অন্তর আমার যেতে চায় না
আর ইতস্তত,
এবার স্থান ক'রে নিয়েছে সে
আপন উৎস-স্থলে।
মনে পড়ে বিগত দিনের কত স্মৃতি—
পুড়িয়েছি সুগন্ধী কত ধূপ,
ঘষেছি পবিত্র চন্দন,
লেপন ক'রেছি সারা অঙ্গে।
তীর্থ আর মন্দিরের পানে
ছুটেছি দেবতার আরাধনায়।
তারপর আবির্ভূত হয়েছেন
আমার আলোক-দিশারী গুরু,
অন্তরে দিয়েছেন জ্বেলে দিব্যজ্যোতি
জেনেছি পরম সত্য জীবনপ্রভুর
অপার কৃপায়।
জেনেছি—বেদ আর পুরাণের
নেইকো কোনই মূল্য,
যদি না থাকে তাতে শ্রীভগবানের
মধুময় স্পর্শ।

চিদানন্দময় হে আমার সদ্‌গুরু,
তোমার চরণে ক'রেছি নিজেকে
চিরতরে উৎসর্গ।
সর্ব্ব দ্বিধা সংশয়ের
নিরসন করেছো তুমি।
রামানন্দ উপলব্ধি ক'রেছে সেই
পরমোজ্জ্বল সত্যকে,
সারা বিশ্বের অনুপরমাণুতে
যিনি রয়েছেন ওতপ্রোত।
এ সত্য উদ্‌ভাসিত হয়েছে মোর প্রাণে
কৃপালু সদ্‌গুরুর অপার কৃপায়—
আর লক্ষ কোটি পাপের কালিমা
গিয়েছে নিশ্চিহ্ন হয়ে।
(গ্রন্থসাহিব)[1]

লোকচক্ষুর অন্তরালে রামানন্দ স্বামী ধীরে ধীরে নিজেকে এবার অপসারিত করিয়া নেন। তারপর একদিন, ১৪১০ খৃষ্টাব্দে (সম্বৎ ১৪৬৭) ১১১ বৎসর বয়সে তাঁহার মরজীবনের মঞ্চে নামিয়া আসে চির-যবনিকা। সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, ভক্তি-ভাবগঙ্গার নব ভগীরথ প্রবিষ্ট হন নিত্যলীলার মধুময় লোকে।

[1] ম্যাকলিফ: হিষ্টরী অব শিখ রিলিজিয়ন—(রামানন্দ) ভল্যুঃ ৬, পৃঃ ১০৬—৯।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, কৃষ্ণরসে রসায়িত মাধবেন্দ্র গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বড় মধুর, বড় রমণীয় এই গোবর্দ্ধন। এ যে তাঁহার ধ্যানের ধন শ্রীনন্দনন্দনের রম্য লীলা-ভূমি! যে দিকে মাধবেন্দ্র নয়ন ফিরান সেদিকেই হয় তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি! ভুবনভুলানো রূপে নবকিশোর নটবর নয়ন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ভক্তপ্রবর বারবার হন আপনা বিস্মৃত।

দিনের পর দিন চলে অপরূপ অপ্রাকৃত লীলা। আর প্রাণপ্রিয় রাধা-মদনমোহনের বিরহ মিলনের রঙ্গ দেখিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন।

গিরি গোবর্দ্ধনের ধীর সমীরণ বহিয়া আসে। মাধবেন্দ্র উচ্চকিত হইয়া উঠেন। মনে ভাবেন, ঐ বুঝি ভাসিয়া আসে কৃষ্ণদেহের অপরূপ দিব্য গন্ধ। আমার কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই—বলিয়া প্রেমিক সাধক উন্মত্ত হইয়া উঠেন।

মেঘ মেদুর আকাশ দেখিয়া ময়ূরীর হৃদয়ে জাগে পুলক শিহরণ, পেখম তুলিয়া মধুর ভঙ্গিমায় নৃত্য করে। মাধবেন্দ্রের বুকে ঝলকিয়া উঠে শিখিপুচ্ছচূড় নওল কিশোরের মধুময় স্মৃতি।

পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণমেঘ জাগাইয়া তোলে কৃষ্ণের বিরহ। আর্ত্তি ও কান্নায় হৃদয় তাঁহার ফাটিয়া পড়ে, নয়নে ঝরে অবিরাম অশ্রুধারা।

বড় অদ্ভুত এই কৃষ্ণপাগল সন্ন্যাসী! ব্রজবাসীরা অবাক হইয়া নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে। সাধু সন্তদের বিস্ময়ও বড় কম নয়। সবাই জানেন, মাধবেন্দ্র দশনামী পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। গুরুপরম্পরার মধ্য দিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ে জ্ঞানতপস্যার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। তবে সেখানে কি করিয়া উদ্‌গত হয় এমনতর রাগানুরাগা

ভক্তি? এমন প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসই বা কেন জাগিয়া উঠে? মহাপ্রেমের একি মহিমময় প্রকাশ! কত খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য্য, কত ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষই তো ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হন, কিন্তু কই, প্রেমের তরঙ্গে এমন উদ্বেল তো কেহ হন না?

কয়েক দিনের ভিতর এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করিয়া প্রকট হয় এক দৈবী লীলা। কথাটা অচিরে জানাজানিও হইয়া পড়ে। সারা অঞ্চলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়।

বিধর্ম্মীর আক্রমণ ও লুণ্ঠনে ব্রজমণ্ডলের অধিকাংশ তীর্থ এ সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোনমতে জাগিয়া আছে শুধু গোবর্দ্ধন এবং আরো দুই চারিটি প্রাচীন তীর্থ।

সেদিন প্রত্যূষে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা শেষ করিয়া মাধবেন্দ্র গোবিন্দ-কুণ্ডের তীরে আসিয়া বসিলেন। স্নান ও মধ্যাহ্ন-জপ শেষ হইয়া গেল। এবার ইষ্টকে ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

ত্যাগব্রতী মহাবৈষ্ণব দীর্ঘকাল যাবৎ অযাচক বৃত্তি নিয়া আছেন। কৃষ্ণের কৃপায় যখন যে ভিক্ষা জোটে, তাহাতেই কাজ সমাধা করেন। কিন্তু আজ কিছু জুটিবে বলিয়া তো মনে হইতেছে না। খর-তাপদগ্ধ গ্রীষ্মের এই মধ্যাহ্নে কাছাকাছি কোন জনমানবই নাই।

কুণ্ড-তীরে, বৃক্ষের ছায়ায় মাধবেন্দ্র চুপচাপ শয়ন করিয়া আছেন। হঠাৎ এক গোপতনয় দুগ্ধের ভাণ্ড হস্তে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। অপরূপ প্রিয়দর্শন এই বালক। সুঠাম শ্যামদেহে লাবণ্যশ্রী টলমল করিতেছে। মাথায় ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, আয়ত নয়ন দুইটি যেন ইন্দ্রজালে ভরা।

মধুর হাসিতে চারিদিক সচকিত করিয়া বালক কহিল, “ওগো, শুন্‌ছো! এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ো দিকিনি। এই ছাখো, ভাঁড় ভরে দুধ নিয়ে এসেছি তোমার জন্য। নাও, চট্ ক'রে গলায় ঢেলে দাও। আচ্ছা, এমনতর উপবাস ক'রে কি লাভ তা বলতে পারো?

সামান্ত যা কিছু খাবে, মেগে খেলেই তো পারো। গোয়ালাদের ঘরে দুধের তো অভাব নেই। তবে শুধু শুধু উপবাসী থাকবে কেন?"

সম্মোহিতের মত মাধবেন্দ্র এই বালকের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। চমক ভাঙ্গিলে প্রশ্ন শুরু করিলেন, "বাবা, কে তুমি? কোন্ গাঁয়ে তোমার বাস? বলতো, কি ক'রে জান্‌লে যে, আমি এখানে উপোস ক'রে রয়েছি?"

"আমি যে পাশের গাঁয়েতেই থাকি গো! তুমি বুঝি জানোনা, কেউ যদি অযাচকবৃত্তি নিয়ে থাকে—মেগে না খায়, আমিই তাকে যোগান দিই দুধের। গোপবধূরা চান্ ক'রতে এসেছিল এই ঘাটে। তারাই যে আমায় জানালো তোমার উপবাসের কথা। দুধও তারাই পাঠিয়ে দিলো। তুমি ভোজন শেষ কর। খানিক বাদে এসে আমি ভাঁড়টি নিয়ে যাবো।"

শ্রদ্ধাভরে ইষ্টদেবকে এই দুগ্ধ নিবেদন করিয়া মাধবেন্দ্র তাহা পান করিয়া ফেলিলেন।

বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে করিতে বেলা গড়াইয়া গেল। কিন্তু কই, সে গোপবালক তো আর ফিরিয়া আসিলনা? ভাণ্ডটি যে তখনো একপাশে পড়িয়া রহিয়াছে।

ক্রমে রাত্রি হয়। গোবর্দ্ধনের আকাশ ছাইয়া নামে ঘন অন্ধকার। পূজা-কীর্ত্তন ও জপের শেষে, মধ্যরাত্রে মাধবেন্দ্র আসন বিছাইয়া শয়ন করেন। শ্রান্ত দেহে অচিরে হন নিদ্রাভিভূত।

রাত্রির শেষ যামে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা টুটিয়া যায়। নয়ন উন্মীলন করিতেই দেখেন এক অপরূপ দৃশ্য। দিব্য আলোকের ছটায় সারা বনভূমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, আর আলোকপুঞ্জের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান সেই গোপবালক!

একি পরম বিস্ময়! কোন্ তাৎপর্য্য এ অলৌকিক আবির্ভাবের? মাধবেন্দ্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন।

এবার মধুর হাসি ছড়াইয়া নওলকিশোর কহেন, "মাধবেন্দ্র, তুমি

এসে পড়েছো, ভালই হয়েছে। তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে যে আমার মূর্ত্তির উদ্ধারকার্য্য সম্পন্ন হবে না। বহু দিন আগেকার কথা—গোবর্দ্ধন পাহাড়ের পাশে, এই গ্রামেরই এক প্রান্তে আমার পৌত্র, মহারাজ বজ্রনাভ, স্থাপন করেছিলো আমার শিলা বিগ্রহ—গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালমূর্ত্তি। সেই প্রাচীন বিগ্রহ আজো পড়ে রয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, ভূগর্ভের গভীরে। মুসলমানের আক্রমণের সময় পূজারীরা তা লুকিয়ে রেখেছিলো। সেই থেকে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সমানে মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার ঐ মূর্ত্তি তুমি উদ্ধার ক'রে আনো। তোমার মত পরম ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করবো বলেই যে আমি প্রতীক্ষা ক'রে আছি। ঐ মূর্ত্তি তুলে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা কর, অগণিত মানুষের কল্যাণ হবে।"

দিব্য মূর্ত্তি অন্তর্হিত হন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মাধবেন্দ্রের করুণ আর্ত্তি আর ক্রন্দন।

ভূতলে আছড়াইয়া পড়িয়া সাশ্রুনয়নে বারবার কহিতে থাকেন, "হায় প্রভু! নিজ হাতে ভাঁড় বয়ে এনে করালে আমায় দুগ্ধ পান, কৃপা ক'রে দিলে দর্শন, করলে আমার সেবা অঙ্গীকার। তবুও এ অধম তোমায় চিন্‌তে পারলো না। হে দয়াল, এ দুঃখ যে আমার রাখবার ঠাঁই নেই।"

কিছুক্ষণ বাদে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভাবিলেন, এমন করিলে তো প্রভুর আজ্ঞা পালন করা যাইবেনা! নিজ মুখে তিনি সেবা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। বনমধ্যে কোথায় শ্রীবিগ্রহ প্রোথিত আছেন—দয়া করিয়া তাহারও দিয়াছেন নির্দ্দেশ। এখন মাধবেন্দ্রের সব চাইতে বড় কাজ এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা।

তখনি গ্রামের লোকজন সবাইকে ডাকিয়া এই অলৌকিক বার্ত্তা তিনি প্রচার করেন।

সারা গ্রামে প্রবল উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে। কোদাল কুঠার নিয়া শত শত নরনারী তাঁহার সঙ্গে আগাইয়া চলে। স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দ্দেশ-

মত মাধবেন্দ্র সবাইকে নিয়া দুর্গম অরণ্যস্থিত নির্দ্দিষ্ট কুঞ্জে উপস্থিত হন। লতাগুল্মের দুর্ভেদ্য জাল কাটিয়া ফেলার পর খনন শুরু হয় এবং ভূগর্ভ হইতে বাহির হয় মনোহর গোপাল-মূর্ত্তি !

গ্রামবাসীদের আনন্দ আর উৎসাহের সীমা নাই। মাধবেন্দ্রও ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। সেই দিনই সাড়ম্বরে সকলে মিলিয়া সম্পন্ন করিলেন শ্রীবিগ্রহের অভিষেক।

মাধবেন্দ্রপুরীর ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এক অপূর্ব্ব প্রকাশ এ সময়ে দেখা যায়। অন্তরে তাঁহার অভিলাষ জাগে, এই অভিষেক উৎসব উপলক্ষে অন্নকূট অনুষ্ঠিত হোক, দেওয়া হোক বৈষ্ণব সাধুদের এক বৃহৎ ভাণ্ডারা। মহাবৈষ্ণবের এই অভিলাষ পূর্ণ হইতে দেরী হয় নাই। মথুরার ভক্ত শেঠদের মধ্যে তুমুল সাড়া পড়িয়া যায়—ভারে ভারে আসিতে থাকে দধি, দুগ্ধ, আটা, চিনি, ঘৃত। কৃতাঞ্জলিপুটে সবাই আসিয়া মাধবেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। মহাপুরুষের কৃপায় শ্রীগোপাল প্রকট হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার নির্দ্দেশ পালনে উৎসাহের অবধি নাই।

মহা ধূমধামে অন্নকূট ও ভাণ্ডারা সমাপ্ত হয়। গোপাল প্রতিষ্ঠিত হন এক সুরম্য মন্দিরে।

এই বিগ্রহের অভিষেক ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মাধবেন্দ্র ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার কথা নিয়া আলোড়ন পড়িয়া যায়। সকলেই বলাবলি করিতে থাকেন, গোপাল নিজে যাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন, কান্থাকরঙ্গধারী সে বৈষ্ণব নিশ্চয়ই এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ।

গোবর্দ্ধনের সেদিনকার এই ভাগ্যবান মহাপুরুষ সম্বন্ধেই বৃন্দাবন-দাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে লিখিয়া গিয়াছেন—

> "ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
> গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারবার।"

(চৈঃ ভাঃ ১।৬।৬১)

বাংলার প্রেমভক্তির নিজস্ব সম্পদের অধিকারী হইয়া মাধবেন্দ্র আবির্ভূত হন, এই সঙ্গে তাঁহার সাধনায় আসিয়া মিলে দাক্ষিণাত্যের আড়বারদের ভক্তিরস। রাধাকৃষ্ণলীলা-তত্ত্বের এক শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে তাঁহার প্রকাশ ঘটে। নিগূঢ় বৈষ্ণবীয় সাধনা পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠে তাঁহার মহাজীবনে।

বাংলা, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও ব্রজমণ্ডলের নানা অঞ্চলে মাধবেন্দ্র প্রেমভক্তিনিষ্ঠ এক সাধকগোষ্ঠি গড়িয়া তোলেন। জ্ঞানবাদী পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইলে কি হয়, অন্তরে তাঁহার সদা স্ফুরিত হইতে থাকে কৃষ্ণ-প্রেমরস। ভাবপ্রমত্ত সাধক দিনের পর দিন জনচৈতন্যে তুলিয়া ধরেন ভাগবত-আশ্রিত প্রেমধর্ম্মের।

উত্তর ভারতে এসময়ে রামানন্দ-কবীরের যুগ চলিতেছে। ভক্তি ও প্রপত্তির বাণী ছড়াইতেছে দেশের দিকে দিকে। এই ভক্তি আন্দোলনে মাধবেন্দ্র পুরীনূতনতর রসস্রোত উৎসারিত করেন। উত্তরকালে এই স্রোতধারা পুষ্টি লাভ করে বাংলার বৈষ্ণব সাধনায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমযমুনার বৃহত্তর খাতে এই সাধনা খুঁজিয়া পায় আপন চরিতার্থতা। লক্ষ লক্ষ ভক্ত ইহাতে অবগাহন করিয়া ধন্য হয়।

শ্রীহট্ট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রাম, পুর্ণিপাট। এই গ্রামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আবির্ভূত হন।[১]

---

১ ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। কাশ্যপ গোত্র, শুদ্ধ শ্রোত্রেয়ী এবং করজা গ্রামীন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হরিচরিত নামক গ্রন্থে পাওয় যায় যে, গ্রন্থকার চতুর্ভুজের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্ণরেখ রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমে করজা নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং করজা গ্রামীন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রও চতুর্ভুজের ন্যায় স্বর্ণরেখ বিপ্রেরই এক বংশধর। ইহা ব্যতীত তাঁহার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু এখনও জানিতে পারা যায় নাই। মাধবেন্দ্রপুরী : ডক্টর হৃষীকেশ বেদান্ত শাস্ত্রী—হিমাদ্রি ৩২শে ফাল্গুন ১৩৬৫।

উপনয়ন সংস্কারের পর বালককে চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। অসাধারণ তাঁহার ধীশক্তি। অবলীলায় একের পর এক ব্যাকরণ, কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র সে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। দেখিয়া আচার্য্যদের বিস্ময়ের সীমা থাকেনা।

ক্রমে মাধবেন্দ্র যৌবনে পদার্পণ করেন। অধ্যাপনা ও শাস্ত্রপাঠের মধ্য দিয়া জীবনে তাঁহার জাগিয়া উঠে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা।

ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ঘরে, সহজাত ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা নিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনে উদ্‌গত হইতে থাকে ভগবৎ-প্রেমের রসধারা।

বেদ বেদাঙ্গের সাথে মাধবেন্দ্র ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-শাস্ত্রেও পারঙ্গম হইয়া উঠেন। শুধু শ্রীহট্ট অঞ্চলেই নয়, পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র প্রতিভার আলোক ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এ আলোক যেন ঘৃতের আলোক। স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল দীপ্তি রহিয়াছে, অথচ নাই কোন নয়ন ধাঁধাঁনো তীব্রতা। একবার যে ইহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই মুগ্ধ হইয়া যায়।

মাধবেন্দ্রের বয়স হইয়াছে, অধ্যাপনার কাজে খ্যাতি ও অর্থও বেশ মিলিতেছে। পিতা মাতা এবার তোড়জোড় করিয়া তাঁহার বিবাহ দেন। কিছুদিন পরে এক পুত্র সন্তানও ভূমষ্ঠ হয়।

পুত্রের জন্মের পর পত্নী হঠাৎ একদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। মাধবেন্দ্রও সংসার জীবনে ধীরে ধীরে বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। কিছুদিন পরে গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য কিশোর পুত্রকে নিয়া আগমন করেন পশ্চিমবঙ্গে।

কুলিয়া ও কুমারহট্টের মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুপুর গ্রাম। এখানে আসিয়া মাধবেন্দ্র কুটির বাঁধেন, খুলিয়া বসেন নুতন চতুষ্পাঠী।

নবাগত আচার্য্যের শাস্ত্রজ্ঞান ও ভক্তিসাধনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। অল্পকাল মধ্যে কুমারহট্ট, কাঞ্চনপল্লী হইতে

শুরু করিয়া কুলীনগ্রাম, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ অবধি তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

এই কুমারহট্টেই একদিন মাধবেন্দ্রের কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন এক মেধাবী তরুণ। মাধবেন্দ্রের কাছে শাস্ত্রজ্ঞান, সাধন ও দীক্ষা লাভ করিয়া এই শিক্ষার্থী ধন্য হন, উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন ঈশ্বরপুরী নামে। এই ঈশ্বরপুরীই গয়াধামে শ্রীচৈতন্যকে গোপালমন্ত্র দান করেন, ঘটান তাঁহার জীবনে বিস্ময়কর রূপান্তর।

অধ্যাপনা ও সাধনভজনের মধ্য দিয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। সে-বার বিষ্ণুপুরে মাধবেন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হন নূতন ছাত্র, কমলাক্ষ। শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার নবগ্রামে এই তরুণের বাস। মাধবেন্দ্রের সাধননিষ্ঠা ও ভক্তিশাস্ত্রের পাণ্ডিত্যের কথা লোকমুখে তিনি অনেক শুনিয়াছেন। এবার এই ভক্তিমান আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণের জন্য স্বগ্রাম হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। পরিণত জীবনে এই কমলাক্ষ আত্মপ্রকাশ করেন শ্রীচৈতন্যের লীলাপার্ষদ শ্রীঅদ্বৈতরূপে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভুর এক প্রভু বলিয়া তিনি পূজিত হন।

কমলাক্ষের চোখে মুখে অপূর্ব্ব প্রতিভার দীপ্তি। প্রেমভক্তির রসে অন্তর রহিয়াছে সদা ভরপুর। মাধবেন্দ্র মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিলেন, এই তরুণ অনন্যসাধারণ, বিরাট প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে তাঁহার মধ্যে। তাই দুই হাত বাড়াইয়া তখনি কমলাক্ষকে কোল দিলেন, পুত্রপ্রতিম নিজগৃহে স্নেহে দিলেন আশ্রয়।

কৃষ্ণপ্রেমের অন্তহীন পিপাসা মাধবেন্দ্রের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে থাকে। নিষ্ঠাবান, পরম সাত্ত্বিক যে সাধনজীবন একদিন শুরু হইয়াছিল, তাহাতে ঢল নামে রাগানুগা ভক্তিরসের।

ভাগবতকে তিনি গ্রহণ করেন অধ্যাত্ম সাধনার প্রধান অবলম্বন রূপে। বাংলার যে ভাবকল্পনা ও প্রেমাবেগ ছিল তাঁহার সহজাত, সে

আবেগ এবার উত্তাল হইয়া উঠে। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের ভাবলোকে আচার্য্য নিরন্তর করেন অবগাহন, কোমলকান্ত পদাবলীর রসে হৃদয় দিনের পর দিন হয় রসায়িত। প্রেম-সুষমার অঞ্জন দুই নয়নে মাখিয়া সাধক মাধবেন্দ্র সদাই বিভোর থাকেন রাধাকৃষ্ণ-লীলার অনুধ্যানে।

তবুও তাঁহার আশ মিটিতেছে কই? লোকমুখে শুনিয়াছেন, দক্ষিণদেশে ভাগবতধর্ম্মের এক অপরূপ, মাধুর্য্যময় বিকাশ ঘটিয়াছে। তামিল আড়বারদের প্রেমার্ত্তি, সাধনা ও সিদ্ধি ভক্তি-ধর্ম্মের ইতিহাসে রচনা করিয়াছে নূতনতর অধ্যায়। সেই নিগূঢ় সাধনার সহিত পরিচয় সাধনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। স্থির করিলেন, বিষয়-কূপে আর ডুবিয়া থাকা নয়, এবার চিরতরে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবেন। দক্ষিণ দেশের প্রেমিক সাধকদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করার পর শুরু করিবেন সারা ভারত পরিব্রাজন। তীর্থে তীর্থে কুঞ্জে কুঞ্জে দীনহীন কাঙালের বেশে প্রেম পিপাসু সাধক মাধবেন্দ্র ঘুরিয়া বেড়াইবেন।

সমস্যা মাতৃহীন কিশোর পুত্র বিষ্ণুদাসকে নিয়া। কাহার কাছে তাহাকে রাখিয়া যাইবেন?

প্রিয় ছাত্র কমলাক্ষ মাধবেন্দ্রের সেবায় সদা তৎপর, যেমন তাহার গুরুনিষ্ঠা তেমনি দায়িত্ববোধ। বিষ্ণুদাসের ভার তো তাহারই উপর দেওয়া যায়! অবশেষে সেই ব্যবস্থাই করিলেন, পুত্রকে তাঁহার কাছে রাখিয়া বাহির হইলেন ইষ্টের সন্ধানে।

বিদায় বেলায় কমলাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা, এবার থেকে শুরু হলো আমার নূতন জীবনের পালা। পরম প্রভুর হাতছানি এসে গিয়েছে। সংসার ছেড়ে, কাস্থাকরঙ্গধারী হয়ে বেরিয়ে পড়বো, স্থির ক'রেছি। শ্রীভগবান তোমায় আমার কাছে টেনে এনে এক পরম সুযোগ এনে দিয়েছেন। বিষ্ণুদাস অবোধ বালক, তার দেখাশুনা করবার ভার আজ থেকে তোমার ওপরই রইল। জীবনের স্বপ্ন যদি

সফল করতে পারি, ইষ্টদেব শ্যামল কিশোরের দর্শন যদি মিলে, তবেই আমি দেশের দিকে ফিরবো।”

একি হৃদয়ভেদী কথা গুরুদেবের? কমলাক্ষ একেবারে মুষড়িয়া পড়েন। নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মাধবেন্দ্র বুঝান, “কমলাক্ষ, আমার মত দীনাতিদীন সাধকের জন্য তোমার চোখের এ জল শোভা পায় না, বৎস। যদি কাঁদতেই হয় সারা বিশ্বের দুর্ভাগা মানুষের জন্য কাঁদো। আর কাঁদো তাঁর জন্যে, যিনি আবির্ভূত না হ'লে কলিহত জীবের উদ্ধার হবেনা, থামবেনা তাদের কান্না আর অশ্রুজল।”

“কিন্তু প্রভু, তিনি কি সত্যই জন্ম পরিগ্রহ করবেন? এ সৌভাগ্য কি জীবের হবে?”—কমলাক্ষের দুই নয়নে আশার আলো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠে।

“হ্যাঁ বাবা, তাঁর আসবার সময় হয়েছে। আমি যে দিব্য দৃষ্টিতে তা দেখতে পাচ্ছি। চরম পাপের পঙ্কে মানুষ আজ ডুবে রয়েছে। দ্বেষ, হিংসায় পৃথিবী হয়ে উঠেছে কলুষিত। এই তো তাঁর আসবার সময়। কিন্তু বৎস, এ সৌভাগ্যকে ত্বরান্বিত ক'রতে হলে এগিয়ে আসতে হবে শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদের, মানবপ্রেমিকদের। তাঁর আবির্ভাবের জন্য তিল তুলসী হাতে নিয়ে আমি ভারতের তীর্থে তীর্থে কাঁদতে চলেছি। তুমিও এমনি ক'রেই তাঁর জন্য কাঁদো। সম্ভাবিত ক'রে তোলে তাঁর বহু প্রতীক্ষিত মহাপ্রকাশ।”

কমলাক্ষ ও বিষ্ণুদাসের কাছে বিদায় নিয়া মাধবেন্দ্র বাহির হইলেন তাঁহার পরমধন শ্রীনন্দনন্দনের সন্ধানে।

কিছু দিন হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষার জন্য মাধবেন্দ্র বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। বারবার ভাবিতেছেন, কোন্ শক্তিমান মহাপুরুষের কাছে আশ্রয় নিবেন? এবার ঈশ্বরকৃপায় হঠাৎ সে সুযোগ মিলিয়া গেল। পরিব্রাজনের পথে পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী জমায়েতের

সঙ্গে তাঁহার দেখা। এই জমায়েতের নেতাকে দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, শ্রদ্ধায় মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। একদিন শুভ লগ্নে এই মহাত্মার নিকট হইতেই নিলেন সন্ন্যাসদীক্ষা।

গুরুর সহিত কিছুদিন অতিবাহিত করার পর আবার তিনি বাহির হইয়া পড়েন পর্য্যটনে। দাক্ষিণাত্যের নানা তীর্থে ঘুরিয়া তাঁহার দিন কাটিতে থাকে।

পরমপ্রাপ্তির আশা নিয়া মাধবেন্দ্র ঘর ছাড়িয়াছেন, নিয়াছেন কৃচ্ছ্রব্রত ও সন্ন্যাস। গৃহ, সমাজ, সমস্ত কিছুর স্মৃতি তিনি মুছিয়া ফেলিতে চান। কিন্তু কই, তাহা তো হয় না? শুভ লগ্ন তো আগাইয়া আসে না? কবে হইবে প্রভুর বহুবাঞ্ছিত দর্শন? কবে সর্ব্বসত্তায় জাগিয়া উঠিবে রসব্রহ্মের পরম অনুভূতি? এই সৌভাগ্যোদয়ের প্রতীক্ষাতেই যে এতকাল তিনি বসিয়া আছেন।

তাছাড়া, সন্ন্যাস নিবার পর হইতেই মাধবেন্দ্রের জীবনে দেখা দিয়াছে এক নূতন মানসসঙ্কট। প্রেমধর্ম্মের অন্তঃসলিলা ধারা তরুণ বয়স হইতে তাঁহার জীবনে বহিয়া চলিয়াছে। এ ধারা পুষ্ট হইয়াছে সাধনা, দিনচর্য্যা ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া। এতকাল ধরিয়া ভাগবতের উপদিষ্ট কৃষ্ণপ্রেম ছিল তাঁহার লক্ষ্য, আর শ্রীধর স্বামীর প্রেমরসাশ্রিত ব্যাখ্যান ছিল জীবনের পরম পাথেয়। কিন্তু জ্ঞানমার্গীয় এই সন্ন্যাস জীবনে তাঁহার সে লক্ষ্য, সে পাথেয় ঠিক থাকে কই? এখানকার শুষ্ক পথে, বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে, চিরবাঞ্ছিত রসলোকের সন্ধান তো তিনি পাইতেছেন না!

জীবনের বহু পরিচিত সুরটি বারবার কি জানি কেন হারাইয়া যাইতেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বময় মহা সঙ্কটে তিনি পতিত হইয়াছেন!

দক্ষিণ দেশে পরিব্রাজন করিতে করিতে মাধবেন্দ্র সেবার উদীপি মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। মধ্বাচার্য্যের উত্তরসাধকদের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এই মঠ। দ্বৈতবাদী সাধনার ধারা এখানে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

উদীপি মঠের ধর্ম্মনেতার নাম আচার্য্য লক্ষ্মীপতি। ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া সাধক সমাজে তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। মাধবেন্দ্র স্থির করিলেন, এই মহাত্মার কাছেই নিবেন সাধনার নূতন পাঠ। দ্বৈতবাদী সাধনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবেন নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে।

কিছুকালের জন্য মধ্ব সম্প্রদায়ে তিনি অবস্থান করেন, আচার্য্য লক্ষ্মীপতির নির্দ্দেশ নিয়া নিমজ্জিত হন সাধনার গভীরে। ভক্তিসাধনা ও ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ নিষ্ঠাভরে এ সময়ে তিনি আয়ত্ত করিতে থাকেন।

পরবর্ত্তীকালে মাধবেন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনে আসে আর এক নূতন প্রবাহ। নৈষ্ঠিক ভক্তিসাধনার স্থলে, কৃষ্ণপ্রেমের রসমধুর সাধনপথ চিরতরে তিনি বাছিয়া নেন।

এই সময়ে তাঁহার জীবনের প্রধান আকর্ষণ হইয়া উঠে জয়দেবের গীতগোবিন্দ আর বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত। তাছাড়া, তামিল সাধক আড়বারদের প্রেমধর্ম্ম ও উহার নিগূঢ় তত্ত্বও তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে থাকে।

কিছু দিনের মধ্যেই মাধবেন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সাধন জীবনের স্রোত অচিরে আসিয়া মিলে কৃষ্ণপ্রেমের রসসাগরে।

রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের রঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে সাধন সত্তা। যুগলভজনের মধ্যে দিয়া প্রাপ্ত হন তাঁহার প্রাণপ্রভুকে। নওল কিশোর নন্দনন্দনের রসোজ্জ্বল মূর্ত্তি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, জীবন মঞ্চে এবার হইতে শুরু হয় এক নূতনতর লীলা।

রাগানুগা ভজনের যে স্তরে মাধবেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন সেখানে মধ্ব-মঠের সঙ্গে আর বেশীদিন সম্পর্ক রাখা চলে না। বৈধী ভক্তি ও শাস্ত্রীয় তত্ত্বের বিচার আজ তাঁহার কাছে নীরস, অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমরসে হইয়াছেন তিনি অধীর উদ্বেল।

এ অবস্থায় উদীপি মঠ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়।

এই মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর হইতেই মাধবেন্দ্রপুরীর আচার্য্যজীবন শুরু হইতে দেখা যায়। ভারতের প্রেমধর্ম্ম সাধনার ক্ষেত্রে এক প্রাণবন্ত উৎসরূপে তিনি আবির্ভূত হন। এই উৎসের ধারা দেশের দিকে দিকে অচিরে ছড়াইয়া পড়ে।

এই পুণ্যময় স্রোতধারা বাহিয়াই উত্তরকালে আত্মপ্রকাশ করে শ্রীচৈতন্যের মহাভাবময়ী প্রেমগঙ্গা।

মহাপ্রভু এবং স্বয়ং তাঁহার বিশিষ্ট অনুগামীরা মাধবেন্দ্রের কাছে তাঁহাদের ঋণের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

মধ্ব মতবাদ ও সাধন-পন্থা হইতে সরিয়া আসিয়া মাধবেন্দ্র যে জীবনদর্শন প্রচার করেন, তাহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব সাধনা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।[১] ভাগবতের লীলাবাদ ও আড়বারদের সাধন প্রণালীর সহিত বাংলার প্রেমসাধনা ও যুগল-ভজনের এক অপরূপ মিশ্রণ তিনি সম্পন্ন করেন।

তাই দেখি, প্রেমভক্তির সাধনজগতে মাধবেন্দ্রপুরী এক নূতনতর বাণী নিয়া আবির্ভূত। তাঁহার ভাবময় জীবন ও বাণী আত্মকাশ করে বিধাতার এক মহা করুণারূপে। সন্ন্যাসী, আচার্য ও গৃহস্থ সবাই মাধবেন্দ্র প্রবর্ত্তিত এই প্রেমধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন।

মাধবেন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে পরমানন্দ পুরী,

১ আসলে মাধ্ব মতবাদ ও সাধ্যসাধন প্রণালীর সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তেমন মিল নাই। এ জন্যই কবি কর্ণপুর মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীর কথা লিখিয়াও মাধবেন্দ্রকে নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী কিন্তু মাধ্ব সম্প্রদায় ও মাধবেন্দ্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু বলেন নাই, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিনি আখ্যাত করিতে চাহিয়াছেন মাধ্ব সম্প্রদায় নামে। বৈষ্ণব বন্দনার শেষে তিনি লিখিয়াছেন :—

এতদ্বৈষ্ণব-বন্দনং সুখকরং
সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদং
শ্রীমন্মাধব-সম্প্রদায় গণনং
[॥

পশ্চিমে শ্রীরঙ্গপুরী, আর পূর্ব্বদেশে অদ্বৈত ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহার সাধনার ধারা বিস্তারিত করেন।[১]

তাঁহার গৌড়ীয় সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ঈশ্বরপুরী এবং কেশব ভারতী। এই দুই প্রেমিক সন্ন্যাসীই শ্রীচৈতন্যকে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দিয়া ইতিহাসখ্যাত হইয়াছেন।

মাধবেন্দ্রের গৃহস্থ বাঙালী শিষ্য, শ্রীঅদ্বৈত কীর্ত্তিত হন মহাপ্রভুর এক প্রধান পার্ষদরূপে। অপর বিশিষ্ট শিষ্য হইতেছেন শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁহার প্রভাবে প্রাক্‌চৈতন্যযুগের নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র অথচ দৃঢ়মূল ভক্তসমাজ গড়িয়া উঠে।

পূর্ব্ববাংলায় মাধবেন্দ্রের প্রতিনিধি ছিলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, প্রেমধর্ম্মের বিস্তার সাধনে তাঁহার অবদানও যথেষ্ট। স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহাকে পিতার ন্যায় মর্য্যাদা দিতেন। এই পুণ্ডরীকের শিষ্য, পণ্ডিত গদাধর শ্রীচৈতন্যের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। গদাধরের কাছে দীক্ষা নিবার পরই বল্লবাচার্য্য উত্তর ভারতে রাধাকৃষ্ণ উপাসনার বিস্তার সাধন করিতে সমর্থ হন।

মাধবেন্দ্রপুরীর কৃপাপ্রাপ্ত সাধক, রাঘবেন্দ্র ছিলেন রায় রামানন্দের গুরু। শ্রীজীবের বৈষ্ণববন্দনায় দেখি, নিত্যানন্দের গুরু সঙ্কর্ষণপুরীও মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

মাধবেন্দ্রের খ্যাত ও অখ্যাত গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা। অনেকের মতে, নবদ্বীপের রত্নগর্ভ আচার্য্য (জগন্নাথ মিশ্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ), শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গঙ্গাদাস, হিরণ্য সদাশিব জগদীশ প্রভৃতি ভক্তগণও এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের নিকট হইতে প্রেমধর্ম্ম লাভ করেন।

মাধবেন্দ্র একবার স্বীয় শিষ্য শ্রীরঙ্গমপুরীসহ নবদ্বীপে আগমন

---

১ মাধবেন্দ্রের অপরাপর শিষ্যদের মধ্যে রহিয়াছেন :—ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, মৈথিল বিষ্ণুপুরী, রঘুপতি উপাধ্যায়, কৃষ্ণানন্দ, নৃসিংহ তীর্থ, সুখানন্দ পুরী, রামচন্দ্র পুরী, রঘুনাথ পুরী, অনন্ত পুরী, গোপাল পুরী ইত্যাদি।

করেন। কথিত আছে, এ সময়ে শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোপালের সেবায় মাধবেন্দ্রপুরী ব্রজমণ্ডলে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। শ্রীমূর্ত্তি প্রকট হইবার পর হইতেই মহা আড়ম্বরে পূজা ও ভোগ চলিতেছে—মথুরার শেঠেরা, বৃন্দাবনের সম্পন্ন গৃহস্থেরা সোৎসাহে ঠাকুরের সেবা পূজার ব্যবস্থাদি করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শনের জন্য লোকের ভীড় লাগিয়াই আছে। অপার সন্তোষে মাধবেন্দ্র-পুরীর দিন এ সময়ে কাটিতেছে।

স্বপ্নাদেশের মধ্য দিয়া প্রভু নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। তাছাড়া, সেবা পূজা অঙ্গীকারের পর হইতে কাঙাল সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রকে একদিনের তরেও বিব্রত করেন নাই। কৃপাময় নিজেই অজস্র ভোগ-উপকরণ প্রতিদিন সংগ্রহ করাইয়া নিতেছেন। কোথা হইতে ভারে ভারে নানা বস্তু আসিতেছে, কে যোগাইতেছে, কেহ জানেনা। মাধবেন্দ্রেরও তাহা নিয়া কোন উৎকণ্ঠা নাই। ভাবাবেশে আর প্রেমানন্দে সদাই তিনি মত্ত হইয়া আছেন।

গোপাল সেদিন তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। এবার কিন্তু প্রভুর নূতন লীলারঙ্গ। ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, "পুরী গোঁসাই! বলি, খুব ঘটা ক'রে তো আমার পূজো ক'রছো। কিন্তু এদিকে যে গ্রীষ্মের তাপে সারা দেহে দেখা দিয়েছে প্রবল জ্বালা। প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। এ জ্বালা কমাবার কি ব্যবস্থা করেছো?"

ত্রিতাপ জর্জ্জরিত মানুষের যিনি পরমাশ্রয়, সর্ব্ব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটে শুধু যাঁহার নাম কীর্ত্তনে, সেই পরম প্রভুর মুখে একি অদ্ভুত অভিযোগের কথা! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মাধবেন্দ্র ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঠাকুর সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। করুণভাবে কহিলেন, "শোন, মলয়জ চন্দন না হ'লে আমার দেহের এ জ্বালা জুড়াবে না। সে

চন্দন তুমি পাবে নীলাচলে। এই দারুণ গ্রীষ্মে ভক্তেরা দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবকে সেই চন্দনই মাখায়। তা-ই আমার চাই। কিন্তু একটা কথা। আর কাউকে যেন তা আনতে পাঠিয়ো না, তুমি নিজে গিয়ে সংগ্রহ কর। আমার সারা অঙ্গে মাখিয়ে তাপ দূর কর।"

এতো আব্দার নয়, এ যে প্রভুর আদেশ। অলঙ্ঘনীয় আদেশ। এই স্বপ্ন দর্শনের পর দিনই প্রেমাবশে মত্ত হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিলেন।

বৃন্দাবন ধাম হইতে নীলাচলের দিকে যাইতে হইলে তখনকার দিনে গৌড় হইয়াই যাইতে হইত। তাই তাড়াতাড়ি সেই পথেই তিনি পা বাড়াইলেন।

অদ্বৈত তখন শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। মাধবেন্দ্রের এই প্রিয় ছাত্র এখন এক বিখ্যাত আচার্য্যরূপে সম্মানিত। ভক্তি-শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার। জনপ্রিয়তাও এ অঞ্চলে যথেষ্ট। মাধবেন্দ্র প্রথমেই গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ের সাক্ষাতে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল।

মাধবেন্দ্রের আগমনে শান্তিপুরে সেদিন চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। এমন ভক্তিসিদ্ধ রূপ, এমন প্রেমার্ত্তি, এমন কৃষ্ণবিরহ ইতিপূর্ব্বে অনেকেরই চোখে পড়ে নাই। গুরুর এই মহা পরিবর্ত্তন দর্শনে অদ্বৈতের আনন্দের সীমা রহিল না।

পুরী মহারাজের কাছে এক শুভলগ্নে অদ্বৈত দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই দীক্ষার মধ্য দিয়া এ দেশের ভক্তিধর্ম্মের ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক বিরাট বনস্পতির সম্ভাবনা।

শান্তিপুর ও নবদ্বীপে কয়েকদিন অতিবাহিত করার পর মাধবেন্দ্র উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া যান। কয়েকদিন নিরন্তর পদযাত্রার পর উপনীত হন রেমুনায়।

নয়নমনোহর বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ রেমুনায় বিরাজমান। বড় জাগ্রত এই ঠাকুর! এখানে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই পুরী মহারাজ প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে বসিয়া অশ্রান্তভাবে শুরু করিলেন নাম কীর্ত্তন। এই পরম ভাগবতের আবির্ভাবে রেমুনা গ্রামে সেদিন প্রেমের বন্যা বহিয়া গেল

কীর্ত্তন ও স্তবস্তুতির শেষে পুরীজী মন্দিরের জগমোহনে আসিয়া বসিয়াছেন। নয়ন ভরিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতেছেন তাঁহার সেবার অনুষ্ঠান। গোপীনাথের ভোগের বরাবরই বড় সমারোহ। রাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী রোজই নির্দ্দিষ্ট-করা বহু উপাদেয় ভোজনসামগ্রী নিবেদন করা হয়।

পুরী মহারাজ পূজারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই, গোপীনাথজীর সেবা পূজার এই আয়োজন দেখে, তোমাদের আন্তরিকতা দেখে, বড় মুগ্ধ হয়েছি আমি। নয়ন আর ফেরাতে পারছিনে। আচ্ছা ভাই, দয়া ক'রে আমায় বলতে পারো, প্রভুর ভোগে কোন্ কোন্ সুস্বাদু বস্তু নিবেদন করা হয়?"

পূজারী সবিস্তারে সব বর্ণনা করিলেন। তারপর স্মিতহাস্তে কহিলেন, "কিন্তু মহারাজ, প্রভু গোপীনাথের সকল ভোগের ওপরে হচ্ছে অমৃতকেলী ক্ষীর। এ একেবারে অমৃতোপম বস্তু। এখানকার ব্যবস্থামত রোজ ঠাকুরের সামনে সাজিয়ে দিতে হয় এই ক্ষীরপূর্ণ নয়টি হাঁড়ি। এমনতর ভোগ-প্রসাদ কিন্তু আর কোথাও দেখা যায় না। এ আমাদের গোপীনাথেরই নিজস্ব।"

পুরী মহারাজের অন্তরে চকিতে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। এই অমৃতকেলী যদি এমনি অপূর্ব্ব বস্তু, তবে শ্রীগোপালের ভোগেও তা কেন লাগানো হইবেনা? মনে মনে কহিলেন, "আহা, এই অনুপম ক্ষীর-প্রসাদের আস্বাদ একবার যদি পেতাম, তা'হলে বুঝতে পারতাম —এ কি রকম বস্তু। কিভাবে তৈরী হয়, তাও ধরা যেতো।"

সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা হইল। অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "শ্রীবিষ্ণু,

শ্রীবিষ্ণু ! ছিঃ ছিঃ। কি সব যা-তা আমার মনে আসছে আজ ? এ যে মহা পাপ ! এ তো কিছুতেই সম্ভব নয়। সন্ন্যাসী হবার পর অযাচক বৃত্তি নিয়েছি, অমৃতকেলী প্রসাদ কি ক'রে আমি চাইবো ? তবে হ্যাঁ, যদি অযাচিতভাবে মন্দিরের কর্ত্তারা দিয়ে দেন, তবে হয়। কে জানে, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রভু পূর্ণ করবেন কিনা ?"

ভোগরাগ শেষ হইয়া গেল। পুরী মহারাজ মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে উপনীত হইলেন গ্রামের প্রান্তস্থিত হাটে।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কেনাবেচা শেষে হাটের মানুষ সব ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। মাধবেন্দ্র জনপরিত্যক্ত এক চালা ঘরে গিয়া বসিলেন। মন আজ বড় অনুতপ্ত। অযাচক সন্ন্যাসী তিনি, অথচ যাচ্ঞার ইচ্ছা উদয় হইয়াছে তাঁহার মনে। এ পাপ স্খালনের জন্য সারা রাত জাগিয়া করিবেন প্রভুর নাম গান।

প্রহরের পর প্রহর চলিতে লাগিল তাঁহার মৃদুকণ্ঠের কীর্ত্তন।

এদিকে গোপীনাথ মন্দিরের পূজারী ঠাকুরকে শয়ান দিয়াছেন। নিজের কাজকর্ম্ম যাহা ছিল তাহাও সব শেষ হইয়াছে। এবার পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে গিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন।

গভীর নিশুতি রাত। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। মন্দিরের চারিপাশের বনাঞ্চলে শুধু শোনা যায় ঝিল্লির একটানা রব।

হঠাৎ ঘুমন্ত পূজারীর কাণে পশে মৃদু মধুর আহ্বান, "ওরে ওঠ্, ওঠ্। শিগ্গীর দুয়ার খোল্।"

পূজারী ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসেন। এ কি! এ আবার কাহার কণ্ঠস্বর ? জনমানবহীন এই অরণ্য অঞ্চলে কে এমন করিয়া তাঁহাকে ডাকে ?

আবার কাণে আসে সুধাস্নিগ্ধ সে কণ্ঠস্বর—"ওরে, শোন্। আর দেরী করিস্নে। ছাখ্গে যা, আমার পীতবাসের আড়ালে গোপনে লুকোনো রয়েছে এক হাঁড়ি অমৃতকেলী ক্ষীর। এটা লুকিয়ে রেখেছি

আমার প্রাণপ্রিয় ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য। এই ক্ষীর প্রসাদ খাবার জন্য মনে তার ভারি ইচ্ছে জেগেছিলো আজ, অথচ মুখ ফুটে সে কারুর কাছে চাইতে পারেনি। তার এই ইচ্ছা পূরণ না ক'রে কি আমি স্থির থাকতে পারি? তাইতো তোদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, তার জন্য এই ক্ষীর আমি চুরি করেছি। পুরীগোঁসাই এখন হাটের এক কোণে বসে আমার নাম গান করছে। তাকে খুঁজে বার ক'রে আমার ঐ প্রসাদ শিগ্‌গীর দিয়ে আয়।"

স্বয়ং গোপীনাথ দিতেছেন এই নির্দ্দেশ! ভক্তবৎসল ঠাকুরের একি অপরূপ লীলা, একি অদ্ভুত প্রেমরঙ্গ!

পুজারীর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, আর দুই চোখে নামিয়াছে পুলকাশ্রু। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই তিনি ঠাকুরের শয়ন ঘরে ছুটিয়া যান। দেখেন, সত্যই তো, শ্রীবিগ্রহের পরিহিত বসনের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক ভাঁড় অমৃতকেলী। তাড়াতাড়ি এটি উঠাইয়া নিয়া তখনি তিনি হাটের দিকে ছুটিলেন।

হাটের আনাচে কানাচে পুরী মহারাজকে তিনি খুঁজিয়া ফিরেন, উচ্চকণ্ঠে বারবার তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকেন।

অবশেষে সাক্ষাৎ মিলিল। প্রসাদের ভাণ্ড সম্মুখে রাখিয়া পুজারী কহিলেন, "মহারাজ, আপনার ভাগ্যের সত্যই সীমা নেই। এই দেখুন, স্বয়ং গোপীনাথজী আপনার জন্য এই অমৃতকেলী পাঠিয়েছেন। আপনি মুখ ফুটে ক্ষীর প্রসাদ চান্‌নি বটে, কিন্তু দয়াল ঠাকুর আপনার জন্য নিজেই এটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রিয় ভক্তের জন্য গোপীনাথ আজ হয়েছেন ক্ষীরচোরা।"

একি কৃপালীলা প্রাণপ্রভুর! মাধবেন্দ্রের হৃদয়ে উত্তাল হয় কৃষ্ণপ্রেমের মহাপাথার। সম্বিৎ হারাইয়া তিনি ভূতলে পতিত হন, সারা দেহে ফুটিয়া উঠে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার।

এ অলৌকিক প্রেমাবেশ দর্শন করাও যে এক বিরল সৌভাগ্য। পুজারী আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। অস্ফুটস্বরে বলিতে থাকেন,

"পুরী মহারাজ, ধন্য আপনি। সার্থক আপনার প্রেমভক্তি, আর কৃষ্ণরসের সাধনা। আপনার জন্য প্রভু গোপীনাথকে কেন ক্ষীর চুরিতে নামতে হয়, এবার তা বুঝতে পেরেছি।"

মাধবেন্দ্র কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইলে পূজারী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করিলেন। আগাইয়া দিলেন প্রভু গোপীনাথের প্রসাদের ভাঁড়।

মহা বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ একেবারে কাটে নাই। সারা দেহ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, আর আয়ত নয়নে অবিরল ধারে ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

অস্ফুট কণ্ঠে বারবার তিনি বলিতেছেন, হে প্রাণনাথ, হে দীনদয়াল! অপার তোমার কৃপা, প্রভু! এ অধমের জন্য তুমি নিজেই নিজের প্রসাদ চুরি করেছো! শুধু তাই নয়, আবার বাহক দিয়ে এই গভীর রাতে তা পাঠিয়েও দিয়েছো!"

প্রসাদ ভোজন শেষ হইল। এবার ভাণ্ডটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মাধবেন্দ্র ভক্তিভরে বহির্ব্বাসে বাঁধিয়া নিলেন। এই মৃৎভাণ্ডের পবিত্র কণাও যে তাঁহার কাছে মহাপ্রসাদ! স্নান ও ভোগরাগের শেষে এক বিন্দু রোজ মুখে দেন আর দিব্য প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া গাহিয়া চারিদিকে উদ্বেলিত করেন কৃষ্ণপ্রেমের ভাবতরঙ্গ।

রেমুনা হইতে মাধবেন্দ্র সেদিন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। দীর্ঘ পরিব্রাজনের পর মিলে শ্রীজগন্নাথের দর্শন। হৃদয়ে প্রেমরসের বন্যা উথলিয়া উঠে, সারা দেহে দেখা দেয় অশ্রু-কম্প-পুলক সমন্বিত সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। ভক্তিপ্রেমের এই পরাকাষ্ঠা যে একবার দর্শন করে, বিস্ময়ের তাহার সীমা থাকে না।

দিকে দিকে সংবাদ রটিয়া যায়, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ মাধবেন্দ্র শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দলে দলে ছুটিয়া আসে, জগন্নাথের পাণ্ডা, রাজার অনুচর সবাই আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। মহারাজ প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে সবাইকে কহেন শ্রীগোপালের লীলারঙ্গের

কথা, "ভাই সব, গোপাল আমার আবদার করেছেন জগন্নাথদেবের মতই চন্দন আর কর্পূর দেহে মাখবেন। আর এসব হওয়া চাই এই পবিত্র ক্ষেত্রেরই বনজাত। তোমরা সবাই কৃপা ক'রে আমায় এগুলো যোগাড় ক'রে দাও। আমার মুখ রক্ষা কর।"

বিশিষ্ট ভক্তেরা, প্রতিষ্ঠাবান রাজকর্ম্মচারীরা, পুরীজীকে সাহায্য করিতে লাগিয়া যান। ভারে ভারে সংগৃহীত হইতে থাকে তাঁহার প্রার্থিত বস্তু। বাহকদের মাথায় প্রচুর চন্দন কাঠ ও কয়েক ভাঁড় সুবাসিত কর্পূর চাপাইয়া মাধবেন্দ্র বৃন্দাবনের পথে রওনা হন। কয়েকদিন চলার পর রেমুনার শ্রীমন্দিরে আসিয়া পৌঁছান।

গোপীনাথের সেবকদের কাছে এবার তাঁহার মহা সম্মান। সবাই এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা যত্নে রত হয়। মন্দির অঙ্গনে বহিয়া যায় দিব্য আনন্দের স্রোত।

ও নর্ত্তন কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেল। প্রসাদ গ্রহণের পর মহারাজ পরমানন্দে জগমোহনের এক কোণে শয়ন করিলেন।

গভীর নিশীথে দেখিলেন এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন। জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, গোপাল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আননে প্রসন্ন মধুর হাসি।

প্রভু কহিলেন, "বৎস মাধবেন্দ্র, তোমায় আর দৌড়ঝাঁপ ক'রে বেড়াতে হবে না। তোমার আনীত চন্দন আর কর্পূর বৃন্দাবনে আমার কাছে পৌঁছে গেছে।"

প্রসাধন-বস্তুর ভেট নিয়া মাধবেন্দ্র কেবলমাত্র রেমুনা অবধি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, বৃন্দাবন যে এখনো বহু দূরে। প্রভুর একি হেঁয়ালিপূর্ণ কথা?

গোপাল আবার কহিলেন, "সেকি গো! এসব যে পেলাম, তা বুঝি তোমার বিশ্বাস হচ্ছেনা? তবে বলছি, শোন। গোপীনাথের অঙ্গ আর আমার অঙ্গ একই। যে আমি বৃন্দাবনে রয়েছি, সেই আমিই যে

রেমুনায়। তুমি গোপীনাথের দেহে কর্পূর চন্দন রোজ লেপন করো, তবেই আমার দেহ শীতল হবে। দ্বিধা করোনা, আমি যা বলছি, সেই ব্যবস্থাই চল্‌তে দাও।"

ভোর হইতে না হইতেই পুরী মহারাজ মন্দিরের সেবক ও ভক্তদের ডাকাইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলেন। স্বয়ং প্রভুর আজ্ঞা—আর সে আজ্ঞা আসিয়াছে ভক্তিপ্রেমসিদ্ধ পুরী গোঁসাইর মুখ দিয়া। সকলে তখনি সোল্লাসে একথা মানিয়া নিলেন!

অতঃপর নিষ্ঠাবান সেবকদের দ্বারা প্রতিদিন চলিতে থাকে কর্পূর, চন্দন লেপন! সে-বার সারা গ্রীষ্মকাল মাধবেন্দ্র রেমুনায় প্রভুর সেবা দর্শন করেন। তারপর আবার নীলাচলে ফিরিয়া যান।

ভক্তশিরোমণি মাধবেন্দ্রের অমৃতময় কাহিনী উত্তরকালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মুখে প্রায়ই শোনা যাইত। পুরী মহারাজের অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততা ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের কথা শুনিয়া ভক্তদের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলাচলের পথে রেমুনায় আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অবস্থান করার কালে পুরী মহারাজের স্মৃতি ও গোপীনাথের লীলারঙ্গের কথা তাঁহার স্মৃতিতে বারবার জাগিয়া উঠে। ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রদ্ধাভরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার!
পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর।
দুগ্ধদানচ্ছলে কৃষ্ণ যারে কৃপা কৈলা।
যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা।
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইলা।

(শ্রীচৈ-চঃ মধ্য-৪)

বৈধী ভক্তির পথ অনুসরণ করিয়া যে জীবন সাধনা মাধবেন্দ্র শুরু করেন, উত্তরজীবনে তাহাই তাঁহাকে টানিয়া নেয় রাগানুগা, প্রেমরসাশ্রিত ভক্তির চরম সাধনায়। ভাগবত-প্রচারিত প্রেমরসের সাধনায় তিনি নিমজ্জিত হন। জীবন তাঁহার অপরূপ মহিমায় সার্থক হইয়া উঠে।

মাধবেন্দ্রের প্রশিষ্য রায় রামানন্দের মুখে এই ভক্তি-ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় চৈতন্যদেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেবার দক্ষিণদেশ হইতে পুরীধামে ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন, "দাক্ষিণাত্যে গিয়ে নানা পথ নানা ধর্ম্মমতের সংস্পর্শে এলাম। কিন্তু দেখলাম, এদের ভেতর রায় রামানন্দের মতবাদই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।" (চৈতন্যচন্দ্রোদয় — কবি কর্ণপুর)

বলা বাহুল্য, রায় রামানন্দের মুখে যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া মহাপ্রভু মুগ্ধ হন তাহা মাধবেন্দ্রপুরীরই প্রবর্ত্তিত প্রেমসাধনার পরম তত্ত্ব।

এই প্রেমসাধনায় সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাসাধক মাধবেন্দ্রের জীবনে নামিয়া আসে দিব্যলোকের আলোকসঙ্কেত। জীবের উদ্ধারের জন্য, পরমপ্রভুর অবতরণের জন্য যে অভীপ্সা এতকালে তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন, আজ তাহা সফল হইয়া উঠে। মহাবৈষ্ণবের উপলব্ধিতে ধরা দেয় গোলকপতিব আসন্ন আবির্ভাবের কথা।

কিন্তু বার বার মনে জাগে সংশয়ের আলোড়ন, এ আবির্ভাব তিনি কি প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে পারিবেন? সে সৌভাগ্য কি সত্যই তাঁহার হইবে?

অবতারের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করিতে হইবে। তাই মাধবেন্দ্রপুরী আবার নূতন করিয়া বসেন কঠোর তপস্যায়। ঝারিখণ্ডের গহন অরণ্যে দিনের পর দিন চলে তাঁহার ধ্যান ভজন।

এ দিকে শ্রীপাদেরই নির্দ্দেশে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অদ্বৈত আচার্য্য এ সময়ে শান্তিপুরে বসিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতেছেন। তিল তুলসী

নিবেদন করিয়া শ্রীভগবানের কাছে দিনের পর দিন জানাইতেছেন প্রাণের আকুল প্রার্থনা।—"কলুষহারী হে প্রভু, এবার এসো—-এসো, ভূভার লাঘবের জন্য তুমি অবতীর্ণ হও।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের মতে, আচার্য্য মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। নবদ্বীপে উপনীত হইয়া নবজাত গৌরসুন্দরকে তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন।

মাধবেন্দ্রের চাওয়া পাওয়া সবই ফুরাইয়াছে, এবার তিনি পূর্ণ-মনস্কাম। মহাভাগবতের মরজীবনে এবার ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে মহাপ্রয়াণের পালা।

অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়াও শ্রীপাদ ভাবিতেছেন জীবনকল্যাণের কথা। সেদিন প্রিয় শিষ্য, মৈথিল পণ্ডিত পরমানন্দ পুরীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, আমার বিদায়ের দিন এবার এসে পড়েছে। কিন্তু আমার জন্য তোমরা শোক ক'রো না। বরং আনন্দই ক'রতে পারো, কারণ, তোমরা যে মহা ভাগ্যবান। তোমরা পরমপ্রভুর আবির্ভাবের আলোকচ্ছটা দেখতে পেয়ে ধন্য হবে। আর বিধির বিধানে আমায় চলে যেতে হবে তার আগে।"

অপূর্ব্ব ভাবাবেশের মধ্য দিয়া মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রের শেষের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। দিনের পর দিন শিষ্যেরা দর্শন করেন তাঁহার কৃষ্ণবিরহখিন্ন মূর্ত্তি, আর বিস্ময়ে সবাই অভিভূত হন।

সেদিন কক্ষমধ্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। তীব্র ভাবাবেশের ফলে শ্রীপাদের দেহে প্রকাশ পাইয়াছে সাত্ত্বিক বিকারচিহ্ন। বহুক্ষণ পরে তিনি অর্দ্ধবাহ্য প্রাপ্ত হন। আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন, "কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় আমার প্রাণপ্রভু! কৃপাময়, কৃপা ক'রে এ অভাজনের প্রাণ বাঁচাও!"

মিলন বিরহের এই তরঙ্গভঙ্গ, দয়িতের জন্য এই প্রেমার্ত্তির মর্ম্ম বুঝিবে, এমন সাধ্য কাহার? কৃষ্ণরসের উত্তাল সাগরে মাধবেন্দ্র

একবার ডুবিতেছেন, আবার ভাসিতেছেন। ভাসিয়া উঠিয়াই আবার কাঁদিতেছেন তেমনি ডুবিবার জন্য।

মিলনের পর বিরহ, বিরহের পর মিলন, প্রেম সাধনার এই চিরন্তন আবেগচঞ্চল দোলা, প্রেমার্ত্তির এই চিরদহন, ইহাই যে মহাপ্রেমিকের চির কাম্য। এ দহনজ্বালা ছাড়া যে জীবন দুর্ব্বহ। কিন্তু কে এই প্রেমজ্বালার স্বরূপ বুঝিবে? কে হইবে তাঁহার ব্যথার ব্যথী?

সেবক ভক্ত ও সাধকগণ নীরবে নির্নিমেষে এই বিরহ-লীলা দেখিতেছেন, আর বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন।

রামচন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্রের অন্যতম শিষ্য। জ্ঞানমার্গীয় বৈধী ভক্তি সাধনার দিকেই তাঁহার বেশী আকর্ষণ। অন্তিম শয্যায় গুরুদেবের এই বিরহজ্বালা দর্শন করিয়া রামচন্দ্র বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

অনুযোগের সুরে কহিলেন, "প্রভু, কেন এমনি ক'রে কেঁদে কেঁদে আপনি আকুল হচ্ছেন, অসুস্থ শরীরকে আরো অসুস্থ ক'রে তুলছেন? আপনার মত ব্রহ্মবিদের পক্ষে এ রোদন তো শোভা পায় না! পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ আপনি স্মরণ করুন, হৃদয়ের তাপ দুঃখ সব দূরে যাবে, আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠবেন।"

শ্রীপাদ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "ওরে, তুই মহাপাপী, কৃষ্ণপ্রেমের রীতি তুই কি বুঝ্‌বি? কৃষ্ণপ্রেম আর কৃষ্ণলীলার কি শেষ আছে রে? হৃদয়-মঞ্চে পরম প্রভুকে স্থাপন ক'রেছি, আর বুভুক্ষু হ'য়ে আছি রসরাজের নব নব লীলার উদ্বোধন দেখার জন্য। আমি মরে যাচ্ছি আমার দহন জ্বালায়। হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে যাচ্ছে। আর তুই হতভাগা, এসেছিস এসময়ে আমায় জ্বালিয়ে মারতে। দূর হ, দূর হ! তোর মত পাষণ্ডের মুখ দেখে যেন আমায় পরলোকে না যেতে হয়।"

আত্মম্ভরী শিষ্য রামচন্দ্র পুরীকে সেই দিনই নত শিরে গুরুসকাশ হইতে বিদায় নিতে হইল।

এ সময়ে গুরুসেবার ভার নিয়া রহিয়াছেন ঈশ্বরপুরী। দিনের

পর দিন, রাতের পর রাত, ক্লান্তিহীন পরিচর্য্যায় তিনি রত থাকেন। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা গুরুকে শ্রবণ করান। সাধননিষ্ঠ, সেবানিষ্ঠ এই শিষ্যের জন্য মাধবেন্দ্রেরও স্নেহের অবধি নাই। সাত্ত্বিক বিকার ও ভাবাবেশের ঘোর কাটিলেই অপার সন্তোষে তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন আশীর্ব্বাদ আর অভয়বাণী।

মহাপ্রয়াণের আগের দিন। শ্রীপাদ সস্নেহে সেবক ভক্তকে নিকটে ডাকিলেন। কহিলেন, "বৎস, এবার আমার সময় হ'য়ে এসেছে। যাবার আগে সারা অন্তর দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রছি, প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম তোমার হৃদয়ে উপজিত হোক, তুমি কৃষ্ণলাভ কর।"

গুরুর কৃপা-নিঃসৃত প্রেমধারা সাধক ঈশ্বরপুরীকে পরিণত করে কৃষ্ণপ্রেমের অমৃত-সায়রে। উত্তরকালে এই সায়রে অবগাহন করিয়াই ধন্য হন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য।

লীলানাট্য এবার শেষ দৃশ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। শিষ্য ও ভক্তেরা সজল নয়নে মাধবেন্দ্রের শয্যা ঘিরিয়া দণ্ডায়মান।

মৃদু মধুর স্বরে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল তাঁহার স্বরচিত চিরপ্রিয় কৃষ্ণবিরহ-শ্লোক—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।

অর্থাৎ, হে দীনদয়াল, হে নাথ, হে মথুরানাথ! কবে তুমি আমায় দেবে তোমার দর্শন? তুমি যে আমার চিরদয়িত—প্রাণের চেয়ে তুমি প্রিয়তর। তোমার অদর্শনে হৃদয় আমার কাতর হয়েছে, ভ্রমময়ী দশায় আমি পতিত হয়েছি। এখন আমি কি করি? তুমি ছাড়া কোন উপায়ই যে আমার নেই!

কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের মহান অধিকারীদের কাছে মাধবেন্দ্রের এই শ্লোক

বড় প্রিয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও তাঁহার এই চিরবিরহ-অঙ্গের শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। অশ্রু-কম্প-স্তম্ভ-বৈবর্ণ প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার তাঁহার দেহে এ সময়ে প্রকটিত দেখিয়া ভক্তগণ বিস্ময়ে হতবাক্ হইতেন।

মাধবেন্দ্রের এই শ্লোকের প্রশস্তি গাহিতে গিয়া দার্শনিক-কবি কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রত্নগণ মধ্যে যৈছে হয় কৌস্তুভ মণি।
রসবাক্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি।
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী।
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে অধিকারী নাহি চৌঠজন।

(চৈ-চ ঃ মধ্য-৪)

কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের শেষ নাই, রূপৈশ্বর্য্যেরও নাই তেমনি তাঁহার প্রেমিক ভক্তেরও নাই রসভুঞ্জনের পরিসমাপ্তি। এ রস যত আস্বাদিত হয়, ততই হইতে থাকে অফুরন্ত।

অনাদ্যন্ত মাধুর্য্য-বিগ্রহের অনাদ্যন্ত আস্বাদন। তাইতো মহাপ্রেমিক মাধবেন্দ্রের এই কৃষ্ণার্ত্তি! এমন বিরহ সন্তাপ আর হা-হুতাশ!

'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' বলিয়া শ্রীপাদ সেদিন চিরতরে নয়ন দু'টি নিমীলিত করিলেন। ভারতের রাগানুগা ভক্তসমাজের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরতরে হইল অদৃশ্য।

মাধবেন্দ্রের বিপুল অবদানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী উত্তরকালে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আজো প্রেমভক্তিময় সাধকদের তাহা বিস্ময় জাগায়—

পৃথিবীতে রোপণ করি
গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ
চৈতন্য ঠাকুর।

ভক্ত লালাবাবু

কাজকর্ম্ম সব শেষ হইয়া গিয়াছে, কাছারি বাড়ী হইতে লালাবাবু প্রাসাদ অভিমুখে ফিরিয়া চলিয়াছেন। তাঞ্জামের পিছনে রহিয়াছে, পাইক বরকন্দাজ ও ভৃত্যের দল।

শীতের পড়ন্ত বেলা। মিষ্টি রোদ আর স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ায় শরীর জুড়াইয়া যায়। লালাবাবুর অন্তর প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। মনে মনে ভাবেন, সায়ংকৃত্যের তো এখনো অনেক দেরী। এই অবসরে গঙ্গাতীরে খানিকটা বেড়াইয়া গেলে মন্দ কি? আদেশমত বাহকেরা সেই পথেই ধাবিত হইল।

পূতসলিলা সুরধুনী কুলু কুলু নাদে বহিয়া চলিয়াছে। জলতরঙ্গে ঝলসিয়া উঠিতেছে অস্তাচলোন্মুখ সূর্য্যের গৈরিক আলোক। নদীবক্ষে সৃষ্ট হইয়াছে এক অপরূপ মায়াজাল, আর মুগ্ধ নয়নে এই নয়নাভিরাম দৃশ্যের দিকে লালাবাবু তাকাইয়া আছেন। দেখিয়া দেখিয়া আশ আর মিটিতেছেন না।

ইঙ্গিত মত নদীতীরে এক গাছের ছায়ায় তাঞ্জাম নামানো হইল। হুকাবরদার সঙ্গেই রহিয়াছে, ছুটিয়া আসিয়া তখনি আলবোলার কল্কেতে তামাকু চড়াইয়া দিয়া গেল।

তাঞ্জামের রঙীন রেশমী ঝালর হাওয়ায় দোল খাইতেছে। মাঝে মাঝে কাণে আসিতেছে গঙ্গার মৃদুমধুর ছল্ ছলাৎ শব্দ। কিংখাবে মোড়া, নরম তাকিয়ায় হেলান দিয়া লালাবাবু ফরসীর নলটি মুখে পুরিয়া দিলেন। আলস্য মন্থর এই শীতের সন্ধ্যাটি তাঁহার বড় রমণীয় লাগিতেছে। মুখ নিঃসৃত সুগন্ধী অম্বুরী তামাকুর ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উর্দ্ধে মিলাইয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে লালাবাবুর মনও হইয়াছে উধাও।

হঠাৎ কাণে পশে বালিকাকণ্ঠের আওয়াজ, "বাবা, বেলা যে যায়। এবার ওঠো। দিন তো শেষ হয়ে এলো।"

এ ব্যাকুল আহ্বান তির্য্যক গতিতে গিয়া বিদ্ধ হয় মর্ম্মমূলে।

বিদ্যুৎপৃষ্টের মত লালাবাবু চমকিয়া ওঠেন। ঝাঁকুনির ফলে হাত হইতে ফর্‌সীর নল খসিয়া পড়ে।

অন্তরে জাগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সর্ব্বসত্তায় জাগে আলোড়ন। লালাবাবু দিশাহারা হইয়া যান।

বেলা যায়! সত্যিই তো এ যাওয়াকে অস্বীকার করার উপায় নাই। পরম সত্যরূপে আজ ইহা উদ্‌ভাসিত হইয়াছে তাঁহার মনশ্চক্ষে। গঙ্গার পরপারে, দিক্‌চক্রবালে ধূসর সন্ধ্যা ঐ ঘনাইয়া আসিতেছে। তেমনি তাঁহার জীবন প্রান্তেও যে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে চিরবিরতির যবনিকা।

জীবন-দেবতার কৃপার অবধি নাই, লালাবাবুর জীবন তিনি ঋদ্ধির প্রাচুর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব কিছুরই সম্ভাবনার দ্বার তাঁহার কাছে ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু সে সব সুযোগের সদ্ব্যবহার তো তিনি করেন নাই। আজ মর জীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া কি তাহার উত্তর দিবেন?

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালাবাবু। বৈভব ও মর্য্যাদায় সারা পূর্ব্বভারতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজের গড়া, শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য নগরী এই কলিকাতায় কাঞ্চন-কৌলিন্যের দিক দিয়া, জৌলুষ ও বিলাসের দিক দিয়া তাঁহার জুড়ি নাই। কিন্তু এই বিপুল ধনৈশ্বর্য্য ও বিলাস-বাহুল্য সত্যকার কোন্ শান্তি, কোন্ আনন্দ তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছে?

গৃহে প্রভু শ্রীগোবিন্দের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেবা পূজাও চলিয়া আসিতেছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এই ইষ্ট বিগ্রহের কৃপার আলোক-সঙ্কেতও লালাবাবুর জীবনে কম আসে নাই। কিন্তু সে আলোকের স্পর্শে জীবনদীপ জ্বালাইয়া নিতে পারিলেন কই? বিষয়কীট হইয়াই শুধু দিন গোঙাইলেন।

চিন্তা ভাবনার আলোড়নের সঙ্গে অন্তরে জাগিয়া উঠে দুর্দ্দম সঙ্কল্প। নাঃ—এ ভাবে দিন যাপন করিতে আর তিনি রাজী নন। এবার নিজেকে করিবেন ইষ্টের চরণে উৎসর্গ। বিত্ত বিভব, যশ মান সব ছাড়িয়া, দেহসম্ভোগ ও দেহবুদ্ধি ছাড়িয়া উপস্থিত হইবেন শ্রীবৃন্দাবনে। রাধা গোবিন্দের মহাধামে বসিয়া শুরু হইবে তাঁহার চরম তপস্যা, জৈব জীবনকে দিবেন পূর্ণাহুতি। ইষ্টসেবার মধ্য দিয়া অর্জ্জন করিবেন নিত্যলীলা আস্বাদনের পরম সৌভাগ্য।

বেলা যায়—বেলা যায়! এ ধ্বনি কেবলি অনুরণিত হইতে থাকে লালাবাবুর সারা অন্তরসত্তায়।

গঙ্গার কূল ঘেঁষিয়া এক ধীবরের কুটির। দ্বিপ্রহরে কর্ম্মক্লান্ত দেহে সেই যে সে নিদ্রা দিয়াছে এখনো তাহা ভাঙ্গে নাই। এ দিকে বেলা গড়াইয়া যাইতেছে, কত কাজ রহিয়াছে অসমাপ্ত কন্যা তাই ব্যগ্র হইয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে।

সেই আকস্মিক আহ্বানেই এক মুহূর্ত্তে টুটিয়া গেল লালাবাবুর মোহনিদ্রা। মহাভোগীর ঘটিল অপরূপ রূপান্তর। আর বাবুশ্রেষ্ঠ লালাবাবু আত্মপ্রকাশ করিলেন মহাবৈষ্ণবরূপে।

তাঞ্জাম ত্যাগ করিয়া তখনি তিনি ছুটিয়া গেলেন সেই ধীবর বালিকার কাছে। পুলকাশ্রুপুরিত নয়নে কহিলেন, "মা তোর এ ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবোনা। আমার বন্ধনমুক্তি হয়েছে আজ তোর কথায়। সত্যিই তো বেলা চলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে নিভে আসছে আমার জীবনের এক একটা বাতি। সাম্‌নে নেমে আসছে চির অন্ধকার। তোর মুখ দিয়ে রাধারাণীই আজ আমায় ডাক দিয়েছেন বৃন্দাবনে যাবার জন্য। সেখানেই আমি যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করি, মা তুই চিরসুখী হ।"

প্রাসাদে ফিরিতেই দেখা গেল লালাবাবুর এক নূতনতর রূপ। মহাপরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী, ভোগপরতন্ত্র মহাবিলাসী সেই লালাবাবু

আর নাই। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, কাঙাল বেশে, ইষ্টধাম শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প।

পত্নী, পুত্র ও আত্মপরিজনের অনুরোধ উপরোধ, কাতর ক্রন্দন সব কিছুই সেদিন হইল ব্যর্থ। দৈন্যভরে লালাবাবু সবাইকে কহিলেন —"রাধারাণী কৃপা ক'রে ডাক দিয়েছেন আমায়। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—বেলা গেল। জীবন-সৌধের দেউটি একটি একটি ক'রে আমার নিভে যাচ্ছে। এ যে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। আর তোমরা আমায় এই বিষয় কূপে পড়ে থাকতে বলোনা। এবার থেকে আমার জীবনের ব্রত হবে কৃচ্ছ্র সাধন, রাধাকৃষ্ণের সেবা, আর ভজন-পূজন। প্রাণপ্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র আর রাই কিশোরীর দর্শন যেন পাই, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের লীলামাধুর্য্য যেন প্রাণ ভ'রে ভুঞ্জন করতে পারি—এই আশীর্ব্বাদই তোমরা আমায় কর।"

সে রাত্রি কোনমতে কাটিয়া গেল। পরদিনই ভিখারীর বেশে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। পা বাড়াইলেন ইষ্টধামের পথে।

লালাবাবুর প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ইতিহাসখ্যাত পুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশে, তাঁহার পৌত্ররূপে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ঋদ্ধি ও সিদ্ধির এক অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার ভজনপরায়ণ জীবনে।

লালাবাবুর পিতা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র ও একমাত্র উত্তরাধিকারী। গঙ্গাগোবিন্দের ভ্রাতা রাধাগোবিন্দও ছিলেন প্রচুর বিত্তের অধিকারী। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার লোকান্তর ঘটে, চিরবিদায়ের পূর্ব্বে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণকৃষ্ণকেই সর্ব্বস্ব তিনি দান করিয়া যান। গঙ্গাগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দের মিলিত এই ধনৈশ্বর্য্য ও কৌলিন্যের অধিকারী হইয়া প্রাণকৃষ্ণ পূর্ব্ব ভারতের এক শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে খ্যাত হন। পরবর্ত্তীকালে লালাবাবু ওরফে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ প্রাপ্ত হন ঐ ঐতিহ্য, আভিজাত্য ও বিপুল বিত্ত।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ইংরেজ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রিয় দেওয়ান। দীর্ঘকাল বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী কার্য্য তিনি অসাধারণ যোগ্যতার সহিত চালাইয়া যান। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পত্তন করেন নিজ বংশের জন্য বিশাল জমিদারী, সঞ্চয় করেন অপরিমেয় ধনৈশ্বর্য্য।

পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নয়নমণি। আদর করিয়া পিতামহ তাঁহাকে ডাকিতেন 'লালা' বলিয়া। উত্তর জীবনে পিতামহের দত্ত এই আদরের ডাকনামেই তিনি সারা ভারতে পরিচিত হইয়া উঠেন।

প্রাণপ্রিয় নাতি লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময় গঙ্গাগোবিন্দ যে বিরাট আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন বাংলার সামাজিক জীবনের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেদিনকার উৎসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। আর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রত্যেকের কাছে সাদরে প্রেরণ করেন সোনার পাতে খোদাইকরা নিমন্ত্রণলিপি। সে উৎসবের জাঁকজমকের কথা জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

আনুমানিক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লালাবাবু জন্মগ্রহণ করেন। বংশের একমাত্র দুলাল, অনিন্দ্যসুন্দর এই শিশুর আবির্ভাবে কাঁথির সিংহ-ভবনে চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। পিতামহ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন। কিন্তু এ আনন্দ তাঁহার ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। পৌত্রমুখ দর্শনের কয়েক বৎসর পর তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

বালক লালা ক্রমে বড় হইতেছে, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য পিতা প্রাণকৃষ্ণের যত্নের অবধি নাই। শুধু সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাই নয়—ইংরেজী, ফার্সী ও আরবী পড়ানোর জন্যও নিয়োজিত করা হয় অভিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত শিক্ষকদের। এমনিতেই তাঁহার মেধা ও প্রতিভা

অসামান্য। তদুপরি রহিয়াছে বিশিষ্ট শিক্ষকদের চেষ্টা যত্ন। অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি ভাষা তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলেন।

সংস্কৃত ও ফার্সীর পাঠই লালাবাবু বেশী গ্রহণ করিতে থাকেন, এই দুইটি ভাষায় তাঁহাকে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে দেখা যায়। উত্তরকালে বিশিষ্ট ফার্সীবিদ্ বলিয়া তিনি সম্মানিত হইতেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ছিল তাঁহার পরম প্রিয়। এই গ্রন্থের কোন শ্লোক সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন তুলিলে তিনি সোৎসাহে আগাইয়া আসিতেন। মনীষা ও ধীশক্তি বলে কঠিন কঠিন শ্লোকের নিহিতার্থ অনায়াসে করিতেন উদ্ঘাটন। শুনিয়া লোকের বিস্ময়ের অবধি থাকিতনা।

বালক কাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া উঠে সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরভক্তি। গৃহের দেবমন্দিরে পুরাণ পাঠ হয়, ধর্ম্মসভা বসে, বুঝুন আর না বুঝুন, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে তিনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। এক এক দিন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ভাবের প্রবাহ, তন্ময় হইয়া ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া থাকেন।

তাঁহার চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য—পরোপকারের উৎসাহ। ধনী গৃহের একমাত্র সন্তান, হাতে মাঝে মাঝে বেশ কিছু অর্থ আসিয়া জমে। এই অর্থ তিনি অবলীলায় বিতরণ করিয়া দেন। দীন-দুঃখীর কাতরোক্তি একবার কাণে গেলে আর স্থির থাকিতে পারেন না।

লালাবাবুর তখন কিশোর বয়স। এসময়ে পিতার তহবিলের অর্থ দান করিতে গিয়া একবার তাঁহাকে বড় বিব্রত হইতে হয়। এই ঘটনার প্রভাব তাঁহার জীবনে-সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে।

কন্যাদায়গ্রস্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছুদিন যাবৎ প্রাসাদের দ্বারে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। প্রাণকৃষ্ণ সিংহের দরবারে উপস্থিত হওয়ার কোন সুযোগ পাইতেছেন না। দেউড়িতে ঢুকিতে গেলে দারোয়ান মারমুখী হইয়া হাঁকাইয়া দেয়।

সেদিন হঠাৎ তাঁহার দিকে লালাবাবুর দৃষ্টি পড়ে। প্রশ্ন করিতেই ব্রাহ্মণটি দুঃখের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে থাকেন।

কিশোর হৃদয় করুণায় গলিয়া যায়। লালাবাবু আশ্বাস দিয়া বলেন, "এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি কেন এত ছুটাছুটি ক'রছেন? কর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হচ্ছেনা? বেশ তো, আমি নিজেই টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

তখনি খাজাঞ্চিখানায় গিয়া নির্দেশ দিলেন, কন্যাদায়গ্রস্ত এই ব্রাহ্মণকে আজই যেন এক হাজার টাকা দিয়া দেওয়া হয়।

বৃদ্ধ খাজাঞ্চী পড়েন মহা বিপদে। কর্তার হুকুম ছাড়া এ টাকা কি করিয়া তহবিল হইতে বাহির করিবেন? এতো কখনো সম্ভব নয়।

তখনি প্রাণকৃষ্ণের কক্ষে ছুটিয়া যান, সবিস্তারে সকল কথা তাঁহার কাছে বিবৃত করেন।

প্রাণকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠে। নীরবে বসিয়া কি যেন ভাবিতে থাকেন। তারপর বলেন, "ত্যাখো, লালা যখন কথা দিয়েছে, টাকাটা দিয়ে দাও। এটা যে সদ্‌ব্যয় তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাবধান! এমনতর ঘটনা আর যেন না ঘটে। লালাকে স্পষ্ট ভাষায় ব'লে দেবে, ভবিষ্যতে সে এ রকম অনুরোধ আর যেন না করে। করলে—তা রক্ষা করা হবে না। আরো বল্‌বে তাকে—আগে নিজের সামর্থ্যে টাকা রোজগার করুক, জমিদারীর আয় বাড়াক, তারপর যেন দানধ্যান করে। সেইটেই মানায়।"

দরিদ্র ব্রাহ্মণটিকে তখনি টাকাটা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে খাজাঞ্চী মনিবপুত্রকে তাঁহার পিতার কঠোর মন্তব্যটিও শুনাইয়া দেন।

কথাগুলি তরুণ লালাবাবুর হৃদয়ে সেদিন শেলের মত বাজিল।

প্রবলপ্রতাপ, কোটিপতি ভূম্যধিকারী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তিনি পৌত্র। একমাত্র উত্তরাধিকারী। লোকহিতের জন্য এই বিপুল সম্পত্তি হইতে এক পয়সা দান করার অধিকার তাঁহার নাই? একি অদ্ভুত, অযৌক্তিক কথা!

হৃদয়ে তখনি জাগিয়া উঠে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। বেশ, তবে তাই হোক্। নিজের উপার্জ্জনের পথই তিনি বাছিয়া নিবেন। আর এখন হইতে পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত ধনের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিবেন না। প্রাসাদের ভোগ বিলাসের উপরও তাঁহার বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে, এবার হইতে নিজের পায়েই দাঁড়াইবেন।

মাতার অশ্রুজল, পিতার করুণ মুখচ্ছবি সকলি সেদিন হয় ব্যর্থ। অনতিবিলম্বে লালাবাবু প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যান। উপস্থিত হন বর্দ্ধমান শহরে।

ফার্সী ভাল জানেন, কাজেই ছোটখাটো কাজ জুটাইতে দেরী হয় নাই। বর্দ্ধমান কালেক্টরীর সেবেস্তাদার রূপে শুরু হয় লালাবাবুর নূতন কর্ম্মজীবন। কর্ম্মে অসাধারণ দক্ষতা তিনি প্রদর্শন করেন, ফলে উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইতে থাকে।

এই সময়ে তিনি দার পরিগ্রহ করেন এবং যথা সময়ে একটি পুত্রসন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশ ইংরেজ সরকারের অধিকারভুক্ত হয়। ইহার পর সেখানকার প্রধান জরীপের কাজে লালাবাবু নিয়োজিত হন। দক্ষতা ও কৃতিত্বের গুণে লাভ করেন সর্ব্বোচ্চ দেওয়ানের পদ।

সরকারী কার্য্যব্যপদেশে এ সময়ে লালাবাবুর সহিত উড়িষ্যার রাজার পরিচয় সাধিত হয়। অচিরে একটি ঘটনার মধ্য দিয়া এ পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

পুরীর মন্দিরের দেয় বাৎসরিক রাজকর বেশ কিছুদিন যাবৎ বাকী পড়িতেছিল। রাজ সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীটি তাই শ্রীমন্দির নীলামে চড়ানোর ব্যবস্থা করে। সৌভাগ্যক্রমে নীলামের আগের দিন এ দুঃসংবাদ লালাবাবুর কাণে যায়। হৃদয়ে তাঁহার জাগিয়া উঠে তীব্র অশান্তি। প্রভুর এই পবিত্র শ্রীমন্দির সর্ব্বজনের আরাধ্য, নিখিল ভারতের গৌরবের বস্তু। সরকারী আইনের বেড়াজালে পড়িয়া উহা মর্য্যাদা হারাইবে? এ ভাবে লাঞ্ছিত হইবে?

কর্ত্তব্য স্থির করিতে লালাবাবুর দেরী হয় নাই। নীলাম তখনি তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। সরকারী ব্যবস্থা রদ করার দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিতে কোন দ্বিধাই সেদিন তাঁহার মনে আসিল না।

এ গণ্ডগোলের ফলে মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ সজাগ হইয়া উঠেন, পরদিনই বাকী রাজকর তাঁহারা পরিশোধ করিয়া দেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

লালাবাবুর নামে চারিদিকে এবার ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। তাঁহার সৎসাহস ও সুবিবেচনায় প্রভুর মন্দির অমর্য্যাদার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, এজন্য পুরীর রাজাও বারবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে থাকেন।

এই কাজের পুরস্কারস্বরূপ পুরী-রাজ নিজ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত কিছুটা অঞ্চল তাঁহাকে অর্পণ করেন। আজ অবধি সেস্থান হইতে আনীত নিম্ব বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা দারুব্রহ্ম জগন্নাথের কলেবর পরিবর্তন করানো হয়। এই নবকলেবর-ধারণ উৎসব প্রতি বারো বৎসর অন্তর পুরীতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

জগন্নাথ বিগ্রহের দর্শন ও সান্নিধ্য লালাবাবুর অন্তরে বপন করে প্রেমভক্তির বীজ। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থলের মাহাত্ম্য দিন দিন তাঁহার অন্তরে স্ফুরিত হইতে থাকে। ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও নামকীর্ত্তন শ্রবণের ফলে অন্তরের আকুতি বাড়িয়া যায়।

এই সময়ে একবার তিনি তীর্থপর্য্যটন মানসে বৃন্দাবনে উপনীত হন। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বিগ্রহ ও লীলাভূমি দর্শনে অন্তর অনাবিল আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

ব্রজমণ্ডলের গহন বনাঞ্চলে তিতিক্ষাবান ও ভজনপরায়ণ বহু বৈষ্ণব সাধকের বাস। তাঁহাদের ভজনগুম্ফা ও কুঠিয়াগুলিও এ সময়ে প্রায়ই তিনি দেখিয়া বেড়ান।

এক একদিন অন্তরে বহিয়া যায় বৈরাগ্যের উদাস হাওয়া। মনে

জাগে প্রশ্ন—ভোগৈশ্বর্য্য, যশ, মান, কোন কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। প্রকৃত শান্তির সন্ধান তো সে পথে নাই। তবে কেন সেই মায়ামৃগের পিছনে ছুটিয়া নিজেকে বিপর্য্যস্ত করা ?

অমৃতময় জীবনের হাতছানি মাঝে মাঝে স্বভাবভক্ত লালাবাবুকে উন্মনা করিয়া তোলে। কিন্তু উপায় নাই। সংসারের দায়িত্ব, কর্তব্য তাঁহার অনেক। তাহা শেষ না করা অবধি কি করিয়া এখানে বাস করিবেন ? আনন্দময় বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়া কিছুদিনের মধ্যে লালাবাবু উড়িষ্যায় ফিরিয়া আসেন, ভাসিয়া পড়েন কর্ম্মজীবনের স্রোতে।

এ সময়ে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসে, পিতৃদেব প্রাণকৃষ্ণ সিংহ পরলোকে গমন করিয়াছেন। পিতার এই বিয়োগ ব্যথা তাঁহার বুকে শেলের মত আসিয়া বিঁধে। মনে পড়িয়া যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহে অর্থ দানের কথা। সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া চিরতরে তিনি ঘর ছাড়িয়া আসেন। পিতা পরে অনুতপ্ত হইয়া কত কাঁদিয়াছেন, বারবার স্নেহপুত্তলি লালাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন—একটি বার সে যেন দেখা দেয়। কিন্তু সে আশা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। অভিমানী পুত্র দূরেই সরিয়া রহিয়াছেন।

লালাবাবুর সে দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। পুরাতন দিনের কথা স্মরণে আসে আর নয়নে ঝরে অশ্রুধারা।

পিতার পারলৌকিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করার জন্য এবার তিনি কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হন। মহাসমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হয়।

পিতামহ ও পিতা যে বিরাট জমিদারী ও ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন লালাবাবুই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ সব বিষয়-আশয় রক্ষা করিতে হইবে। তাছাড়া, সংসারের যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহাও কম নয়। তাই এখন হইতে লালাবাবু উড়িষ্যার বাস দেন, স্থায়ীভাবে কলিকাতাতেই অবস্থান করিতে থাকেন।

জীবন প্রবাহ এবার বহিয়া চলে যুগ্মধারায়। বাহিরে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী, বৈষয়িক কাজকর্ম্ম ও বিলাসব্যসনে থাকেন সদা ব্যস্ত। আর একদিকে বহিয়া চলে ভক্তির প্রচ্ছন্নধারা। প্রায়ই দেখা যায়—বিগ্রহ সেবা, পুরাণ ভাগবত শ্রবণ ও দানধ্যানের মধ্য দিয়া জীবন তাঁহার চরিতার্থতা খুঁজিয়া ফিরে।

এমনি সময়ে, সেদিনকার এক পরম লগ্নে ধীবর-কন্যার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে হয় তাঁহার চৈতন্যোদয়। আসক্তির ডোর অজানিতে কখন স্খলিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে লালাবাবু উপনীত হন কৃষ্ণধাম শ্রীবৃন্দাবনে।

ভক্তের প্রিয় ধন এই বৃন্দাবনধাম। এই মহাতীর্থের রজ কৃষ্ণ-চরণ স্পর্শে চির পবিত্র হইয়া আছে। দিব্য জীবনের স্মৃতি জড়াইয়া আছে এখানকার অরণ্যে পর্ব্বতে, যমুনাপুলিনে আর আকাশে বাতাসে। শুধু তাহাই নয়, আজো রাধামাধবের অপ্রাকৃত লীলা এখানে রহিয়াছে অব্যাহত। প্রাকৃত বৃন্দাবনের প্রতি অণুপরমাণুতে ওতপ্রোত রহিয়াছে অপ্রাকৃত চিরমধুর বৃন্দাবন। সেই দিব্য দর্শনই যে মনে প্রাণে কামনা করেন লালাবাবু।

ত্যাগতিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রব্রতময় সাধনজীবন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নিয়াছেন। সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই তাঁহার কাটিয়া যায় ভজনে ও জপে। একবার কোন এক ফাঁকে বাহির হইয়া মাধুকরী সারিয়া নেন। ঝুলিতে সামান্য যাহা কিছু সংগৃহীত হয়, তাই দিয়াই করেন উদরপূর্ত্তি।

কলিকাতার প্রাসাদে প্রায়ই তাঁহার কাঙাল জীবনের নানা সংবাদ পৌঁছে। পত্নী কাত্যায়নী দেবী কাঁদিয়া আকুল হন। পুত্র নারায়ণচন্দ্র ও আত্মীয়স্বজনদের মনোকষ্টের অবধি নাই। অনেকেই বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে বুঝান, "ধামে থেকে ইষ্টদেবের সেবা-পূজায় সারা জীবন কাটিয়ে দিতে চান—বেশ তো, এ তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু প্রভুর

এই সেবার ব্যবস্থা তো সুষ্ঠুভাবে করা দরকার! সেদিকটা আপনি কেন ভাবছেন না?"

"আমি হচ্ছি কাঙাল মানুষ, প্রভুর সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার ক্ষমতা আমার কই? ভিক্ষান্ন যা জুটবে, তা দিয়েই রোজ কোনমতে দুটো ভোগ প্রসাদ নিবেদন করবো।"—ভক্ত লালাবাবু করুণ নয়নে উত্তর দেন।

দেওয়ানজী চাপিয়া ধরেন, "তা কেন হবে হুজুর? কৃপাময় প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র তো নিজের ব্যবস্থা নিজেই আগে থেকে ক'রে রেখেছেন। আপনাদের তিন পুরুষ ধরে যে বিত্তবৈভব সঞ্চিত হয়ে চলেছে, সে সবই যে পরম প্রভুর দান। কৃপা ক'রে নিজে থেকেই তিনি তাঁর সেবককে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন। নিজের ষোড়শোপচার সেবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। সে ব্যবস্থা কেন আপনি বিপর্য্যস্ত ক'রে দেবেন? ঈশ্বরের সেবকরূপে আপনি যে বিত্ত পেয়েছেন তা ইষ্ট-সেবায় কেন লাগাবেন না?"

লালাবাবু বেশ কিছুটা নরম হইলেন। ভাবিলেন, সত্যিই তো, প্রভুর প্রদত্ত অর্থে তাঁহারই নিজ সেবা অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাতে আপত্তি করার তো কিছু থাকিতে পারে না। তাছাড়া, বৃন্দাবনের এই সব ভগ্ন মন্দির দেখিয়া, শ্রীবিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগের দৈন্য দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রায়ই ধৈর্য্য ধরা কঠিন হয়। দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে। পুত্র ও পত্নীর নির্দ্দিষ্ট অংশ বাদ দিয়া তাঁহার নিজের ভাগে যে অর্থ পড়ে, তাহা দিয়া তো অনায়াসে কৃষ্ণ-সেবার আয়োজন তিনি করিতে পারেন। তাছাড়া, বৃন্দাবনের সেবা-অনুষ্ঠানের উজ্জীবনও আর একদিক দিয়া কাম্য। ইহার মাধ্যমে সারা দেশের ভক্তদের মধ্যে সেবাপূজার আগ্রহ বাড়িবে। জন-কল্যাণের দিক দিয়া ইহা কম কথা নয়। এ কল্যাণকর কর্ম্মে প্রভু কি তবে তাঁহাকেই নিয়োজিত করিতে চান?

লালাবাবুকে রাজী হইতে হইল। তবে স্থির রহিল, নিজের অন্ন

সংস্থানের জন্য রোজ করিবেন মাধুকরী। আর এষ্টেট হইতে আনীত প্রতিটি মুদ্রা ব্যয়িত হইবে প্রভুর সেবায়। শুধু মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহের সেবাপূজার ব্যবস্থাতেই নয়, ব্রজমণ্ডলের যেখানে যে পবিত্র সাধনপীঠ, কুণ্ড ও স্নানঘাট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, সেখানেই নিয়োজিত হইবে তাঁহার অর্থসম্ভার। প্রভু কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনের উন্নয়ন ও সেবাকার্য্যের জন্য সর্ব্ব অর্থ সামর্থ্য তিনি ঢালিয়া দিবেন।

লালাবাবুর সঙ্কল্প, এই মহা ধামে ইষ্টদেবের সুরম্য এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। আর এমন শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিবেন যাহা হইয়া উঠিবে মহা জাগ্রত। সেবাপূজার সঙ্গে প্রতিদিন এই মন্দিরে শত শত সাধু মহাত্মা ও দরিদ্র নরনারী পাইবে মহাপ্রসাদ। তাঁহার অন্নছত্র অন্ন যোগাইবে শত শত বুভুক্ষুর মুখে।

অল্পকাল মধ্যে বাংলা-উড়িষ্যার জমিদারী হইতে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা তাঁহার কাছে আসিয়া পৌঁছে। এই বিপুল অর্থের সদ্ব্যয়ের জন্য রচিত হয় এক বিরাট পরিকল্পনা।

পুরাণশাস্ত্র ও সিদ্ধ মহাত্মাদের বর্ণনা অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের লীলাবিজড়িত স্থানসমূহ লালাবাবু প্রথমে চিহ্নিত করিয়া নেন। তারপর এই সব পবিত্র তীর্থ নিজের আয়ত্তে রাখার জন্য ব্রজমণ্ডলের চুয়াত্তরটি পরগণা একে একে তিনি ক্রয় করেন।

বৃন্দাবন হইতে শুরু করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি ঢোলসহরৎ করিয়া জানানো হয়, প্রভুজীর দীন সেবক লালাবাবু শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাপূত স্থান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যে কেহ এই সব জমি হস্তান্তর করিতে চান, তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা হইবে।

বিক্রেতা জুটিতে দেরী হইল না এবং লালাবাবুর কর্ম্মচারিগণ সোৎসাহে প্রচুর জমিজমা ও সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই

জমিজমা ও তাহার অর্জ্জিত আয়কে লাগানো হইল বিগ্রহ স্থাপন, মন্দির-ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও দেবসেবার কাজে।

লালাবাবুর জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি স্থানীয় একদল লোকের মনঃপুত হয় নাই। ঈর্ষাযুক্ত হইয়া লালাবাবুর বিরুদ্ধে লোককে তাহারা উত্তেজিত করিয়া তোলে। দুর্নাম রটায়,—ছলে বলে কৌশলে তিনি বিপুল পরিমাণ ভূমি ব্রজমণ্ডলে সংগ্রহ করিতেছেন এবং অনেকে ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

একথা লালাবাবুর কাণে যায়। তখনি তিনি আদেশ জারি করেন "আবার রামেশ্বর সেতুবন্ধ অবধি ঢোলসহরৎ করে সবাইকে জানিয়ে দাও, যাঁরা লালাবাবুর কাছে জমিজমা বিক্রি করেছেন, তাঁদের যদি ধারণা হয়ে থাকে যে জমির উপযুক্ত মূল্য তাঁরা পাননি, তবে এখনি আগেকার সেই মূল্য নিয়ে লালাবাবু তা ফেরৎ দেবেন। এ সম্পর্কে কেউ যেন কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করেন।"

এই বিজ্ঞপ্তির পরে লোকের সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়। অতঃপর একটি বিক্রেতাও মূল্য ফেরৎ নিবার জন্য উপস্থিত হয় নাই।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া, গোড়ার দিকে লালাবাবু ভরতপুর প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভরতপুরের মহারাজা তাঁহার পুরাতন বন্ধু। তাঁহার গৃহত্যাগ এবং বৃন্দাবনে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পাইয়া মহারাজা সাগ্রহে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান। নিজ প্রাসাদে বসবাস করিতে দেন।

কিছুদিন পরের কথা। লালাবাবু এ সময়ে ইষ্ট বিগ্রহের জন্য এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইয়াছেন। জয়পুর অঞ্চল হইতে মূল্যবান প্রস্তরাদি আনানো হইতেছে। কার্য্যব্যপদেশে মাঝে মাঝে তাঁহাকে রাজপুতানায় যাইতে হয়, তাই সুযোগ পাইলেই ভরতপুর-রাজের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়া আসেন।

রাজা সাহেবের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা থাকার ফলে সে-বার এক

বিপদের জালে তিনি জড়াইয়া পড়েন। ইষ্ট-মন্দির নির্ম্মাণের প্রাক্কালে এ বিপদ উপস্থিত হয় ইষ্টদেবেরই এক পরীক্ষারূপে।

এ সময়ে রাজপুতানার রাজাদের সহিত ইংরেজদের একটি সন্ধি-চুক্তির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ভরতপুরের রাজা ছিলেন প্রস্তাবিত স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম। কিন্তু কি এক কারণে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে তিনি অসম্মত হন। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহারা মহাবিপদে পড়িয়া গেলেন।

একদল ইংরেজ কর্ম্মচারীর মনে এসময়ে এক সন্দেহ জাগিয়া উঠে। তাহাদের ধারণা হয়, ভরতপুর-রাজের পশ্চাদপসরণের মূলে রহিয়াছে তাঁহার বন্ধু লালাবাবুর কুমন্ত্রণা।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে স্যর চার্লস মেটকাফ তখন দিল্লী দরবারের রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত। সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীরা মেটকাফকে বুঝাইলেন, রাজা তো স্বাক্ষর দিতে রাজীই ছিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাঁহাকে বাধা দিয়াছেন।

মেটকাফ তো এ সংবাদে চটিয়া আগুন। আসল কথা জানার জন্য তখনি তিনি মথুরার জেলা শাসককে নির্দ্দেশ দিলেন। জেলা শাসক এক মহা উৎসাহী লোক। লালাবাবুকে বন্দী করিয়া তিনি তাঁহাকে দিল্লীতে চালান দিলেন। সেখানে বিচারের ব্যবস্থা হইল।

সারা ব্রজমণ্ডলে এই গ্রেপ্তারের সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে। হাজার হাজার নরনারী সেদিন এই ত্যাগব্রতী বৈষ্ণবের অনুসরণ করিতে থাকে।

দিল্লীতে প্রবেশ করার সময় দেখা গেল, জনতা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। লালাবাবুর এই জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখিয়া মেটকাফ সাহেব সেদিন চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অভিযোগ প্রমাণ করিতে হইবে, এজন্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি চাই। লালাবাবুর আগেকার কার্য্যকলাপের সংবাদও সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এ কাজের ভার স্যর চার্লস মেটকাফ অর্পণ করেন তাঁহার ফার্সি-লেখক, শান্তিপুরে দেবীপ্রসাদ রায়ের উপর।

রায় মহাশয়ের তদন্তের ফলে প্রকাশ পায়, লালাবাবু ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ চিরদিনই কোম্পানীর উপকার করিয়া আসিয়াছেন, সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে দিয়াছেন অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এবার মেটকাফের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, অভিযোগ তিনি তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করিয়া নেন।

লালাবাবুর ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া মেটকাফ খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। একদিন নিজ ভবনে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াও আনেন। কথা প্রসঙ্গে বলেন, "এতকাল দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত থেকে আপনি কর্ম্মবহুল জীবন যাপন করেছেন। সরকার ও সাধারণ মানুষের কত উপকার করেছেন। এবার কি সে সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন?"

লালাবাবু উত্তরে কহিলেন, "কই, কাজ তো আমি একেবারে ছাড়িনি! নূতন চাকুরি নিয়েছি যে!"

"সে কি? কার অধীনে?"

"সব চাইতে যে বড় মালিক তাঁর।"

"তিনি আবার কে? সব কথা ভেঙ্গে বলুন তো।"

কৌতুকোজ্জ্বল হাসি ছড়াইয়া লালাবাবু কহিলেন, "নূতন মালিকের নাম কৃষ্ণচন্দ্র। আর আমার নিরন্তর কাজ—তাঁর নাম গান করা, জপ ও ভজনে নিরত থাকা।"

মেটকাফ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইতেই তাঁহার মুন্সী বুঝাইয়া দিলেন, লালাবাবুর এই নূতন মালিক হইতেছেন স্বয়ং ভগবান—খৃষ্টানেরা যাঁহাকে পরমপিতা বলিয়া ধ্যান করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে লালাবাবু দীর্ঘদিন কাজ করিয়াছেন, বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় দেওয়ানের পদে থাকিয়া দক্ষতার পরিচয়ও কম দেন নাই। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাই খুসী হইয়া তাঁহাকে খেতাব

দানের জন্য দিল্লীর দরবারে সুপারিশ জানান। সম্রাট লালাবাবুকে মহারাজা উপাধি দান করিতে চাহিলে তিনি তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

অতঃপর লালাবাবু বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তোড়জোড় করিয়া শুরু করেন ইষ্টদেবের মন্দির নির্ম্মাণের কাজ। ধীরে ধীরে এই বিশাল মন্দির পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। গম্ভীরা গৃহে মহাসমারোহে স্থাপিত হয় মুরলীধর কৃষ্ণচন্দ্রমা-জীউর নয়নাভিরাম মূর্ত্তি।

মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য লালাবাবু ব্রজমণ্ডলের জমিদারীর আয়ের একটা বড় অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। অতিথিশালায় প্রসাদ বিতরণের জন্য থাকে উদার ব্যবস্থা। সেখানে প্রতিদিন শত শত লোকের জন্য অন্নের সংস্থান করা হয়। সাধুসন্ত ও দরিদ্র জনগণ সেবানিষ্ঠ এই মহা বৈষ্ণবের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠে। "লালাবাবুর অন্নের" প্রসিদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র।

এত কিছু আড়ম্বরপূর্ণ সেবাপূজার মধ্যে লালাবাবু কিন্তু দিন যাপন করেন কাঙাল বৈষ্ণবের মত। ইষ্ট বিগ্রহের ভোগ নিবেদিত হওয়ার পর দিনান্তে যৎসামান্য অন্নপ্রসাদ মুখে তুলিয়া দেন। তারপর সারাদিন চলে ঠাকুরের নামকীর্ত্তন আর ভজন গান।

ভক্ত লালাবাবুর অন্তরের বড় আশা—তাঁহার স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ অচিরে জাগ্রত হইয়া উঠুন। কৃপা তাঁহার ছড়াইয়া পড়ুক জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব মানবের উপর। এজন্য দিনের পর দিন মন্দিরে বসিয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন সকাতর প্রার্থনা। গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

এক একদিন কাঁদিয়া বড় আকুল হন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে থাকেন, "হে ঠাকুর, তোমার শ্রীবিগ্রহে তুমি নিত্য জাগ্রত, নিত্য লীলাপর, তা জানি। কিন্তু এই লীলা এ অধমকে একটিবার দেখাও। এ অন্ধ অভাজনকে কর চক্ষুষ্মান। কৃপাময়, সর্ব্বজনের সমক্ষে তুমি

জাগ্রত হয়ে ওঠো। তোমার কৃপার ধারা বিস্তারিত হোক দিকে দিকে। আর আমি তা দর্শন ক'রে ধন্য হই।"

লালাবাবুর এই ক্রন্দন ও আকুল আবেদনে ঠাকুর সাড়া দেন। অচিরে তাঁহার প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণচন্দ্রমা বিগ্রহের মধ্য দিয়া স্ফুরিত হয় প্রভুর দিব্য লীলা। এ লীলা যেমনি অলৌকিক. তেমনি অপূর্ব্ব করুণারসে পরিপূর্ণ।

মাঘ মাস। বৃন্দাবনে তীব্র শীত পড়িয়াছে। সকালবেলা হইতেই ষোড়শোপচারে সেদিন ঠাকুরের সেবা পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। মন্দিরের এককোণে দাঁড়াইয়া, প্রাণ ভরিয়া লালাবাবু দর্শন করিতেছেন নয়নলোভন শ্রীমূর্ত্তি। ভাবাবেশে সারা দেহ তাঁহার কণ্টকিত। গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে নয়নবারি।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতেই অন্তরে তাঁহার এক অদ্ভুত চিন্তা খেলিয়া গেল। নিষ্ঠাভরে মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া পূজারী তো বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একবার তবে পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাক্ না, সত্য সত্যই ঠাকুরের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে কিনা।

তখনি ভোগরাগের উপকরণ হইতে একতাল মাখন তুলিয়া নিলেন। পূজারীর হাতে দিয়া কহিলেন, "এই মাখনটুকু শ্রীমূর্ত্তির মস্তকের তালুর উপর বসিয়ে দিন তো। আমার কৃষ্ণচন্দ্রমা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন কিনা, আমার সেবা পূজা সার্থক হয়েছে কিনা, আজ তা পরখ্ ক'রে দেখতে চাই।"

পূজারী চমকিয়া উঠেন। লালাবাবু কি প্রকৃতিস্থ, না ভাবের ঘোরে এই প্রস্তাব করিতেছেন? সসঙ্কোচে কহিলেন, "আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করবো। কিন্তু এ ধরণের পরীক্ষা কেউ করেছে বলে জানিনে। শুনিওনি কখনো।"

"পূজারী ঠাকুর, বিগ্রহ যদি চৈতন্যময় হয়েই থাকেন তবে তাঁর জড় দেহেও কেন থাক্‌বেনা সে চৈতন্যের চিহ্ন? কেন থাকবেনা সে দেহে উত্তাপ ও প্রাণের স্পন্দন?"—প্রতিপ্রশ্ন করেন লালাবাবু।

পূজারী বুঝিলেন, আর বাক্যব্যয় করা বৃথা। মাখনের তালটি তখনি তিনি বিগ্রহের শিরে স্থাপিত করিলেন। পূজা অর্চ্চনা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই সর্ব্বজন সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল এক বিস্ময়কর দৃশ্য! দেখা গেল, ঠাকুরের মস্তকস্থিত মাখনপিণ্ড ধীরে ধীরে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সারা দেহ হইতেছে মাখনলিপ্ত।

উপস্থিত সকলেই বুঝিলেন, এই দুঃসহ শীতে স্বাভাবিকভাবে মাখন গলিতে থাকিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয় কোন অলৌকিক কারণে বিগ্রহের ব্রহ্মতালু উষ্ণ হইয়াছে, নতুবা এমনতর কাণ্ড কখনো ঘটিতে পারে না।

মন্দিরের পূজারী ও সেবকগণ ঐ দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

লালাবাবুর সারা দেহ মন দিব্য আনন্দের রসে উদ্বেল। ভাবাবেশে কাঁপিতে কাঁপিতে মন্দিরের মেঝেতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

আর এক দিনকার কথা। সেদিন লালাবাবুর মাথায় আবার এক নূতন ঝোঁক চাপিয়া গেল। শ্রীমূর্ত্তির মস্তকের তালুতে যদি উত্তাপ সঞ্চারিত হয়, তবে নাসিকাতেই বা নিশ্বাস বহিবেনা কেন? একবার দেখাই যাক্‌না, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

নির্দ্দেশ মত মন্দিরের সেবকেরা তখনি কিছুটা তূলা সংগ্রহ করিয়া আনিল। লালাবাবু পূজারীকে কহিলেন, "আপনি এবার দয়া ক'রে শ্রীবিগ্রহের নাসিকার নীচে এই তূলাপিণ্ড কিছুকাল ধরে রাখুন। শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা, তা প্রত্যক্ষ ক'রতে চাই।"

স্মিতহাস্যে পূজারী মন্তব্য করেন, "সেদিন শ্রীমূর্ত্তির ব্রহ্মতালুতে মাখনপিণ্ড গলিয়ে তবে ছেড়েছেন। দেখ্‌ছি, এখনো আপনার অন্তরের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়নি।"

"এ অধম দীর্ঘদিন যাপন করেছে বিষয় কীড়া হ'য়ে। সংশয় তাই

এখনো কাটেনি। আসেনি প্রভুর পদে স্থির বিশ্বাস। তাই বারবার জাগে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দর্শনের কৌতূহল। যেটুকু কৌতূহল এখনো অবশিষ্ট আছে, তা ক্রমে নিবৃত্ত হয়ে যাক্। আপনি দেখুন, নিশ্বাস সত্যাই বইছে কিনা।"

তূলাখণ্ড নাসিকার নীচে আগাইয়া দিতেই দেখা গেল, প্রস্তর-বিগ্রহের নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইতেছে জীবদেহেরই মত নিশ্বাস। হস্তধৃত তূলা ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।

ঠাকুরের এই কৃপালীলা দর্শনে লালাবাবুর উল্লাসের সীমা রহিল না। প্রেমপ্রমত্ত হইয়া মন্দিরের নাট্যশালায় বারবার গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে বসিয়া ভজনানন্দে আর ধ্যান জপে লালাবাবুর দিন কাটিতেছে। ইষ্টদেব একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। কহিলেন, "লালা, তোমার সেবা অঙ্গীকার করার পর থেকে আমি আনন্দেই আছি। বিরাট মন্দির, পূজা-ভোগরাগের সুব্যবস্থা, অন্নছত্র সবই তো রয়েছে। আরো রয়েছে তোমার দৈন্য ও ভক্তি। কিন্তু এতো কিছুর পরেও আমার যে আরো চাই। আমায় আরো কিছু ভিক্ষা দাও তুমি।"

লালাবাবু চমকিয়া উঠিলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি প্রভু, তাঁহার শ্রীমুখে এ আবার কি কথা? উত্তর দিলেন, "প্রভু, আর যাই বল, ভিক্ষার কথা তোমার মুখে সাজেনা। আমায় ভাঁড়িওনা। আসল কথাটি কি, মুখ ফুটে বল।"

"কেন গো, তুমি কি জানোনা আমি জাত-ভিখারী? নিত্য আমি যে জীবের দোরে দোরে প্রেম ভিক্ষা ক'রে বেড়াই। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমার জন্য এবার তোমায় আর একটা নূতন মন্দির গড়তে হবে।"

"নূতন মন্দির? প্রভু, যে পঁচিশ লাখ তোমার সেবার জন্য দেশ

থেকে আনিয়েছি, তা সবই যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সর্ব্বস্ব দিয়ে দিয়েছি। আবার আর এক মন্দির তুলবো কি ক'রে ?"

"লালা, যে মন্দিরের কথা আমি বল্‌ছি তা যে গড়ে উঠে সাধকের দেবার পালা শেষ হবার পরে।"

লালাবাবু ভাবিতেছেন, এ আবার কি প্রহেলিকাময় কথা ?

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "লালা, সর্ব্বস্ব দান ক'রলে তবেই তো আপনা হতে গড়ে ওঠে ভক্তহৃদয়ের শ্রীমন্দির। সেই মন্দিরই যে আমার পরমপ্রিয় স্থান। এবার তোমার হৃদয় বেদীতে আমার জন্য তৈরী কর চিরস্থায়ী প্রেমের মন্দির। এবার এই ভিক্ষাটি চেয়ে নেবার জন্যেই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।"

"কৃপাময় ! নিজেই তবে ব'লে দাও, এ অধমের হৃদয়পুরে কি ক'রে কোরবো তোমায় চির-অধিষ্ঠিত।"

"তুমি তাড়াতাড়ি গোবর্দ্ধনে চলে যাও। সেখানকার মহাপবিত্র ভূমি আর নির্জ্জনতা হবে তোমার শেষ পর্য্যায়ের ভজনের পক্ষে অনুকূল, এগিয়ে আসবে পরম প্রাপ্তি।"

মধুর বৃন্দাবন ছাড়িয়া, ইষ্টবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রমাকে ছাড়িয়া গোবর্দ্ধনে যাইতে হইবে। লালাবাবুর হৃদয়ে কান্না গুমরিয়া উঠে। ঠাকুরকে নিবেদন করেন, "প্রভু, কৃপা ক'রে আমার স্থাপিত এই শ্রীমূর্ত্তিতে তুমি জাগ্রত হয়ে উঠেছো। এ ছেড়ে কোথায় আমি যাবো, বলতো ?"

"এ আবার কি কথা গো ? আমার লীলা-বিলাস কি শুধু তোমার স্থাপিত এই বিগ্রহেই নিবদ্ধ ? এ লীলা যে রূপায়িত সর্ব্ব বিগ্রহে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। তাছাড়া, ভাবো দেখি, যে সব আবিষ্কৃত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের আলোতে, যে সব জাগ্রত হয়ে উঠেছে রূপ সনাতন প্রভৃতি মহাবৈষ্ণবের সাধনায়—তা আরো কত বেশী জাগ্রত! তুমি আগে ব্রজমণ্ডলের সবগুলো তীর্থে পরিব্রাজন কর, তারপর গোবর্দ্ধনে গিয়ে ডুবে যাও আপন তপস্যার গভীরে।"

লালাবাবু আর বিলম্ব করেন নাই। একে একে ব্রজমণ্ডলের সমস্ত তীর্থ দর্শনেব পর তিনি গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হন। এখন হইতে নিত্যকার প্রধান কর্ম্ম হয় গিরিগোবর্দ্ধনের পরিক্রমা। তারপর সারাদিন মৃত্তিকা গোফার অভ্যন্তরে বসিয়া ভজন ও জপধ্যান চলে। সারাদিনে একবার মাধুকরীতে বহির্গত হন। দরিদ্র ব্রজমায়ীরা যৎসামান্য ভিক্ষা যাহা দেয় তাহাতেই দিন চলিয়া যায়।

ভজন ও কৃচ্ছ্র সাধনের যে মহিমা এ সময়ে লালাবাবুর জীবনে ফুটিয়া উঠে তাহা দেখিয়া শুধু স্থানীয় গৃহস্থেরাই নয়, বৈষ্ণব সাধকদের অনেকেও বিস্ময় মানেন।

গোবর্দ্ধনে তখন ঘোর বর্ষা নামিয়াছে। সেদিন সকাল বেলায় গিরি প্রদক্ষিণ করার পর হইতেই লালাবাবুর অন্তরে অভিলাষ জাগিয়াছে, শ্রীবিগ্রহের বৈকালিক ভোগপ্রসাদ তাঁহাকে পাইতে হইবে। তবে মাধুকরীতে বাহির হওয়ার আর কি প্রয়োজন? বরং সারাদিন কাটাইয়া দিবেন নাম-জপ আর ভজনানন্দে।

পবিক্রমা সমাপ্তির পর মন্দির-পূজারীকে জানাইয়া গেলেন, রাত্রে প্রভুজীর প্রসাদ তাঁহার নিকট যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এদিকে মন্দিবের আরতি ও ভোগ রাগের পব দেখা দিল মহা দুর্যোগ। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে কাহারো বাহির হওয়ার উপায় নাই। পূজারী পড়িলেন মহা বিপদে। ভক্ত লালাবাবু সেই কখন হইতে ভোগপ্রসাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কিন্তু এই ঝড়জলে কে উহা তাঁহার ভজন-গোফায় পৌছাইয়া দিবে?

গভীর রাত্রিতে প্রকৃতি অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল। পূজারী আর দেরী না করিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রসাদ নিয়া এখনি তাঁহাকে লালাবাবুর কাছে ছুটিতে হইবে—ঠাকুরের মহাভক্ত সারাদিনই যে রহিয়াছেন অনাহারে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদান্নের থালা

বিগ্রহের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল, তাহাতো নাই! কে উহা অপসারিত করিল? রাত্রে পূজারী একলাই এ মন্দিরে থাকেন। এই দুর্যোগে আর কোন লোকই তো নির্জ্জন গিরিশিখরে উপস্থিত হয় নাই!

অগত্যা ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল পূজারী একটা নূতন মাটির ভাণ্ডে সাজাইয়া নিলেন। ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হইলেন ভজনগোফায়।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে লালাবাবু কহিলেন, "সে কি পূজারী ঠাকুর! এই তো আমায় দিয়ে গেলেন প্রভুজীর থালাভর্ত্তি ভোগ প্রসাদ। আবার এসব সাজিয়ে এনেছেন কার জন্য?"

"এ আপনি কি ব'লছেন, লালাজী? আপনার জন্য প্রসাদ নিয়ে আসবো বলে সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি। কিন্তু কি করবো বলুন, এই ঝড়জলে যে এতক্ষণ বার হতে পারিনি।"

গোফার এক কোণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লালাবাবু কহিলেন, "দেখুন, ঐ যে ঠাকুরের প্রসাদী থালা এখনো পড়ে আছে। আপনি নিজ হাতে এগুলো দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন তাড়াতাড়ি ভোজন সমাধা করার কথা। আমি কি পাগল হয়েছি যে, সব কিছু এরই মধ্যে বিস্মৃত হবো।"

পূজারী করজোড়ে কহিলেন, "প্রভুজীর নামে শপথ ক'রে বলছি, এর আগে মন্দির থেকে আজ আমি বাইরে আসিনি। তাছাড়া, ঠাকুরের প্রসাদান্নের থালা খুঁজে না পেয়ে বাধ্য হয়ে এই মাটির ভাঁড়ে এগুলো সাজিয়ে এনেছি। এখন দেখছি, মন্দিরের থালা অলৌকিকভাবে আগে থাকতেই আপনার কাছে এসে গিয়েছে।"

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তপ্রবর লালাবাবুর সারা দেহে ফুটিয়া উঠে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। হতচেতন হইয়া তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়েন।

কিছুকাল পরে সম্বিৎ ফিরিয়া পান। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে থাকেন, "হায় প্রভু! অধমকে কি এমনি ক'রে ছলনা করতে হয়! পূজারীর রূপ ধরে এসে, নিজে আমায় এই ভোগ-প্রসাদ বিতরণ ক'রে

গেলে, আর মোহাচ্ছন্ন, অন্ধ, আমি একটুও চিনতে পারলাম না! কৃপাময় এবার নিজরূপে একবারে আবির্ভূত হও। দেখা দিয়ে দুর্ভাগার জন্ম সার্থক কর।"

গুরুকরণের ইচ্ছা লালাবাবুর মনে বহুদিন যাবৎ জাগ্রত হইয়াছে। এজন্য ব্রজমণ্ডলের বিশিষ্ট সাধুদের কাছে ঘোরাঘুরিও কম করেন নাই। কিন্তু বারবারই তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছে সেই একই কথা—সময়মত সদ্গুরুর আবির্ভাব তাঁহার জীবনে ঘটিবে, এজন্য অযথা ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই।

গোবর্দ্ধনের এবারকার কঠোর তপস্যার কালে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণের জন্য লালাবাবু আরো ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

সাধক মহলে মথুরার কৃষ্ণদাস বাবাজীর তখন খুব প্রসিদ্ধি। ভক্তমালের বাংলা অনুবাদ করিয়া বহু পূর্ব্বে বৈষ্ণব জনসমাজে তিনি সুপরিচিত রহিয়াছেন। তদুপরি রহিয়াছে আধ্যাত্মিক জীবনের ঐশ্বর্য্য। নিগূঢ় বৈষ্ণবীয় সাধনায় তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। দেশ বিদেশের বহু সাধক এই মহাত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া লাভ করিতেছেন প্রেমভক্তি-রসের আস্বাদন।

সে-বার কৃষ্ণদাস বাবাজী গিরি-গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে আসিয়াছেন। লালাবাবু তাঁহার সম্মুখে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। দৈন্যভরে কহিলেন, "প্রভু, আমার অন্তরাত্মা থেকে কেবলি উঠ্ছে করুণ আর্ত্তি—গুরুকরণের জন্য জেগেছে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। আর বহুদিন যাবৎ আপনাকেই মনে মনে বরণ ক'রছি সদ্গুরুরূপে। এবার আমায় আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

কৃষ্ণদাস সম্মত হইলেন। কহিলেন, "উত্তম কথা, আমি তোমায় দীক্ষা দেবো। কিন্তু তোমায় আরো কিছুকাল কঠোর সাধন ভজন করতে হবে। বিষয়ী জীবনের সূক্ষ্ম সংস্কার এখনো সামান্য কিছুটা রয়ে গিয়েছে। তীব্র বৈরাগ্যের অনলে তা পুড়িয়ে ফেলতে থাকো

শুভ লগ্ন উপস্থিত হলে, আমি নিজেই উপস্থিত হবো, তোমায় দীক্ষা দেবো। আমার কাছে বারবার ছুটে আসতে হবে না।"

এবার জীবন পণ করিয়া লালাবাবু শুরু করেন তাঁহার নূতনতর সাধনা। কৌপীন আর কাস্থাকরঙ্গ সম্বল করিয়া ব্রজের এক একটি তীর্থে উপস্থিত হন, অল্প কিছুদিন অবস্থান করার পরই আবার করেন স্থান পরিবর্ত্তন। দিনের পর দিন, চরম ত্যাগ তিতিক্ষা ও দৈন্যের মধ্য দিয়া বহিয়া চলে তাঁহার অধ্যাত্মসাধনা। বাসনার সূক্ষ্ম অঙ্কুর একটি একটি করিয়া বিনষ্ট হইতে থাকে।

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু তবুও গুরুকৃপা লাভের পরম সৌভাগ্য লালাবাবুর হইলনা। অন্তরের আর্ত্তি তাঁহার পৌঁছিল চরমে।

সে-বার লালাবাবু কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। দিন রাতের বেশীর ভাগ সময় তাঁহার জপধ্যানে অতিবাহিত হয়। কখনো বা ইষ্টবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রমাজিউর ভুবনমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকেন ভাবাবিষ্ট। দিনান্তে অল্পক্ষণের জন্য গাত্রোত্থান করেন, শহরের পথে পথে করেন মাধুকরী। সামান্য ভিক্ষা যাহা মিলে তাহাতেই কোনমতে হয় জীবন ধারণ।

সেদিন বারবারই তাঁহার মনে পড়িতেছে পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজীর কথা। লালাবাবুকে তিনি অশ্বাস দিয়াছিলেন, উপযুক্ত সময়ে নিজেই তাঁহার সকাশে আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু আজো সে সৌভাগ্য লালাবাবুর হয় নাই, গুরুকৃপার সঞ্জীবনী সুধা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

অন্তরে তাই শুরু হয় আত্মবিশ্লেষণ। নিজ জীবনের কোন্ দোষ ত্রুটি, কোন্ সংস্কার বা মায়িক বন্ধন এজন্য দায়ী, বারবার তাহা অনুসন্ধান করিতে থাকেন।

হঠাৎ লালাবাবুর মনে পড়িয়া যায়, বৃন্দাবনের কত কুঞ্জে, কত

মন্দিরেই তো তিনি মাধুকরী করিতে যান। কিন্তু কই, শেঠের মন্দিরের দিকে তো কখনো পা বাড়ান নাই? মঠ মন্দির নির্ম্মাণ, বিগ্রহসেবা, দানধ্যান প্রভৃতির দিক দিয়া শেঠেরা লালাবাবুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। জমিদারীর স্বত্বস্বামীত্ব নিয়াও উভয় পক্ষে সংঘাত কম বাধে নাই। মনান্তরও অনেকবার ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেকার সে জীবন লালাবাবু ত্যাগ করিয়াছেন, এখন তিনি ডোরকৌপীন পরিহিত এক কাঙাল বৈষ্ণব। কিন্তু আগেকার দিনের সে দ্বেষ ও বিতৃষ্ণা কি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে? এখনও সূক্ষ্মাকারে রহিয়া যায় নাই? তাহাই যদি না হইবে, তবে কেন আজ অবধি শেঠের মন্দিরে ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই?

এই চিন্তা খেলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লালাবাবু শেঠের মন্দির অভিমুখে রওনা হইলেন।

মন্দিরে সেদিন রহিয়াছে অজস্র ভিখারীর ভীড়। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, খঞ্জনি বাজাইয়া লালাবাবু মৃদুস্বরে শুরু করিলেন কৃষ্ণনাম গান। কনককান্তি, দীর্ঘদেহ এই বৈষ্ণবকে বৃন্দাবনের অনেকেই চিনে। তাড়াতাড়ি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এ সংবাদ প্রেরিত হয়। প্রাক্তন প্রতাপশালী ভূস্বামী লালাবাবু সর্ব্বত্যাগী কাঙালের বেশে তাঁহাদের দুয়ারে দাঁড়ানো। এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য করিতেছেন মাধুকরী। এ যে শেঠদের কল্পনারও অতীত। মন্দির চত্বরে সেদিন মহা আলোড়ন পড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ শেঠজী স্বয়ং ভিক্ষাদানের জন্য আগাইয়া আসিলেন। হাতে তাঁহার এক ভোজ্য পাত্র। চাল, ডাল ও ফল মূলের সহিত তাহাতে সাজানো একশত একটি স্বর্ণমুদ্রা।

সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া শেঠ কহেন, "বাবুজী, আপনার পদস্পর্শে আজ এ দীনের কুটির পবিত্র হলো। কৃপা ক'রে, এ থালাটি গ্রহণ করুন, আমরা কৃতার্থ হই।"

লালাবাবু উত্তর দেন, "আমি মাধুকরী ক'রতে এসেছিলাম শেঠজী।

কৃষ্ণনাম শোনানো হয়েছে—এবার চাই এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা। কিন্তু যা আপনি সাজিয়ে এনেছেন তাকে তো ভিক্ষা বলা যায় না।"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন, আপনাকে ভিক্ষে দেবো, সে সাধ্য আমার কই ? এ হচ্ছে নজরানা। রাজা লালাবাবু আজ রাজভিখিরি হয়ে আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন। তাই এ নজরানা।"

"তা হয়না শেঠজী। বৈষ্ণবকে যে চিরকাঙাল হয়েই থাকতে হয়। আপনার ঐ স্বর্ণথালা তো আমি স্পর্শ করতে পারবো না। তা থেকে এক মুষ্টি চাল আমার ঝুলিতে ঢেলে দিন। তাতেই আজকের জন্য উদরপূর্ত্তি হয়ে যাবে। আর একটা ভিক্ষা আমায় দিন। জানিত ও অজানিতভাবে যদি কখনো কোন আঘাত বা মনস্তাপ আপনাদের দিয়ে থাকি, সে জন্য আমায় মার্জ্জনা করুন। সবাই মিলে আশীর্ব্বাদ করুন, এই অভাজনের হৃদয়ে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির যেন উদয় হয়।"

পুলকাঞ্চিত দেহে দুই বাহু বাড়াইয়া ভক্ত লালাবাবু তাঁহার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শেঠকে আলিঙ্গন দেন। দুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে প্রেমাশ্রুর ধারা। এই ভাবাবেগ ও প্রেমোচ্ছ্বাস সেদিন চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান নরনারীর মধ্যেও সংক্রামিত।

শেঠের মন্দির হইতে লালাবাবু ধীর পদে বাহির হইয়া আসেন। সন্নিহিত গলিপথ দিয়া অগ্রসর হন নিজের ভজন কুটিরের দিকে। এ সময়ে সম্মুখে আবির্ভূত হন মহাবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বাবাজী।

বাবাজী মহারাজের চোখে মুখে এক অপরূপ প্রসন্নতার দীপ্তি। লালাবাবু ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিতেই সস্নেহে তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। কহিলেন, "লালা, এবার সময় হয়েছে। দ্যাখো আমিও তাই এসে গিয়েছি। প্রতিদ্বন্দ্বী ধনকুবের, শেঠজীর কাছে এতদিন তুমি মাধুকরী করতে যাওনি। অন্তরের গোপন গভীরে জেগে ছিল সূক্ষ্ম অহমিকা। আজ তা উৎপাটিত হয়েছে। ক্ষেত্র তোমার প্রস্তুত, এবার দীক্ষাবীজ রোপণের পথে আর কোন অন্তরায় নেই, বৎস।"

কয়েকদিনের মধ্যেই এক শুভ লগ্ন দেখিয়া কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। নবদীক্ষিত শিষ্যের সাধনজীবন এবার হইতে বহিয়া চলিল গভীরতর খাদে।"

নিগূঢ় বৈষ্ণব সাধনের পন্থাদি প্রদর্শন করার পর গুরু কহিলেন, "বৎস, এবার তোমায় করতে হবে সর্ব্বস্ব পণ। চরম কৃচ্ছ্র অবলম্বন ক'রে সাধনায় ব্রতী হতে হবে। আবার তুমি গিরিগোবর্দ্ধনের সাধন-গোফায় গিয়ে বাস কর। সেখানে বসেই হবে তোমার ইষ্টদর্শন ও পরম প্রাপ্তি। অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়া অবধি ভজন গোফার নিভৃতিতেই করবে জীবন যাপন। আর ততদিন কোন মানুষের মুখ তুমি দর্শন করতে পারবেনা।"

গোবর্দ্ধনে লালাবাবু এ সময় হইতে যে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণব সাধক ও স্থানীয় জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা থাকেনা।

কয়েক বৎসরের মধ্যে তপস্যা তাঁহার সার্থক হইয়া উঠে। ইষ্ট বিগ্রহের দর্শন ও লীলারস ভুঞ্জনে হন পূর্ণমনস্কাম। ব্রজমণ্ডলের অন্যতম বৈষ্ণব মহাপুরুষরূপে লালাবাবু অর্জ্জন করেন চিরপ্রসিদ্ধি।

এই সময়ে সিন্ধিয়ার অধিপতি পারেখজী একবার বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে আসেন। বিশিষ্ট তীর্থ ও লীলাস্থলসমূহ দর্শন করিতে করিতে পারেখজীর অন্তরে অধ্যাত্মজীবন যাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। ব্যগ্র হইয়া ভাবিতে থাকেন, ব্রজমণ্ডলের কোন্ মহাত্মার কাছে আশ্রয় মাগিবেন? কাহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হইবেন কৃতার্থ? লোকপরম্পরায় শুনিলেন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ লালাবাবুর সুখ্যাতি। তাই সদলবলে সেদিন গোবর্দ্ধনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

লালাবাবুর নিভৃত তপস্যার পর্য্যায় কিছুদিন যাবৎ শেষ হইয়াছে। এ সময়ে স্বেচ্ছামত মাঝে মাঝে দুই একটি সাধনকামী মানুষের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিতে থাকেন। ভজনের নির্দ্দেশও কিছু কিছু দেন।

পারেখজীর আবেদনের উত্তরে কহিলেন, "মহারাজ, দীক্ষাদান সম্পর্কে আমি আমার গুরুজীর অনুসৃত পন্থাই অনুসরণ ক'রে থাকি। তা মেনে নিয়েই আপনাকে আমার কাছে আসতে হবে।"

"সে পন্থাটি কি, কৃপা ক'রে একটু খুলে বলুন।"

"গুরু শুধু তখনি আমায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, যখন আমি বিষয় এবং বিষয়ের অভিমান দুই-ই ত্যাগ ক'রে, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ ক'রতে পেরেছি। শ্রীভগবানকে পেতে হলে তাঁকে ধরতে হবে দু'হাতে আগ্‌লে। এক হাতে সংসারকে আঁকড়ে থাকবো, আর এক হাতে করবো ভগবানের চরণ স্পর্শ, তা কখনো হয় না।"

"প্রভু, আপনি তা হ'লে কি আমায় করতে বলেন ?"

"মহারাজ, কৃষ্ণসাগরে ঝাঁপ দিতে হলে আপনাকে দুই কূলের বন্ধন একেবারে কাটাতে হবে—সর্ব্বত্যাগী, কৌপীনবন্ত হয়ে আসতে হবে এই গোবর্দ্ধনের গোফায়। তা কি পারবেন ?"

সিন্ধিয়া অধিপতি করযোড়ে কহিলেন, "আপনার কথা যথার্থ। এখন বুঝেছি—এমন কৃচ্ছ্রসাধন, এমন ত্যাগবৈরাগ্যের পথ আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এজন্য চাই পূর্ব্বজন্মের সাধনা আর বিপুল সুকৃতি।"

অতঃপর ভক্তিভরে লালাবাবুর চরণ বন্দনা করিয়া তিনি গোবর্দ্ধন ত্যাগ করেন।

লালাবাবুর বৈরাগ্য, সাধনা ও সিদ্ধির খ্যাতি তখন সারা ব্রজমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৃন্দাবন-ধামে যে-ভক্তই উপস্থিত হয়, গোবর্দ্ধনের গোফাবাসী এই মহাত্মাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ফলে ভীড় কেবলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এই খ্যাতির বিড়ম্বনা লালাবাবুর কাছে অসহ্য। মনে মনে সেদিন সঙ্কল্প করিলেন, এবার গোবর্দ্ধন ছাড়িয়া কোন নিভৃত অরণ্যে প্রবেশ করিবেন, বাকি জীবন কাটাইয়া দিবেন ভজনানন্দে।

গিরিগোবর্দ্ধনের পথে প্রান্তরে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এ সুযোগে, লোকের অজ্ঞাতসারে লালাবাবু স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় গোকার অনতিদূরে সংঘটিত হয় এক মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা। গোয়ালিয়র হইতে আগত একদল যাত্রী অশ্বারোহণে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছে। হঠাৎ তাহাদের একটি অশ্ব ক্ষুর দিয়া লালাবাবুর পা মাড়াইয়া দেয়। অল্পকাল মধ্যে এই আঘাত পরিণত হয় এক দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতে।

ভক্ত ও সেবকদের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লালাবাবুকে তাঁহারা বৃন্দাবনের মন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। দীর্ঘদিন চলে এই দুঃসহ রোগভোগের পালা।

ভক্তেরা প্রশ্ন করেন, "প্রভু, আপনার প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রমার সান্নিধ্যে আপনাকে এনে রাখা হয়েছে। তবুও কেন চলছে এই অসহনীয় রোগ যন্ত্রণা? এই দুঃখের দহন?"

পরম ভাগবৎ লালাবাবুর রোগপাণ্ডুর আনন মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "তোমরা তো আমার প্রভুজীর দেওয়া এই দেহ-রোগই দেখছো। দেখনি তাঁর দেওয়া দিব্য অমৃতের আলো; সে আলোকে যে সদা ঝলমল ক'রছে আমার হৃদয়মঞ্চ। কৃষ্ণচন্দ্র আর রাধারাণীর মধুর লীলাবিলাস চলছে সেখানে অবিরাম। কোন্ পাল্লা ভারী বলতো—দুঃখের না আনন্দের?"

ভক্ত ও সেবকেরা নীরব হন, হার মানেন সিদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে।

লালাবাবুর মরজীবন ধীরে ধীরে এবার আসিয়া পড়ে চিরবিরতির সীমানায়। ইঙ্গিত বুঝিয়া ভক্তেরা তাড়াতাড়ি যমুনার তীরে তাঁহাকে বহন করিয়া আনেন। যুগল-লীলার অনন্ত বৈচিত্র্য দর্শন করিতে করিতে তিনি ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস।

সারা ব্রজমণ্ডল এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষের শোকে সেদিন মুহ্যমান হয়। সাধকেরা বলাবলি করেন,—বৈষ্ণব-আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আজ স্খলিত হইয়া গেল।

আর সাধারণ মানুষ মাথায় কর হানিয়া করে মর্ম্মান্তিক বিলাপ কারণ, তাহারা জানে—লালাবাবু ছিলেন ব্রজের মানুষের দুঃখদৈন্যময় জীবনের পরমাশ্রয়, তিনি ছিলেন তাঁহাদের—সত্যকার রাজর্ষি!

পওহারী বাবা

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গাজীপুরে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী আছেন—এই সংবাদ পাইয়া অযোধ্যা তেওয়ারী মহা ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া যান।

শহরের উপকণ্ঠে, কুর্থা গাঁয়ে, গঙ্গাতীরের এক আশ্রমে ভ্রাতা লছমীনারায়ণ বসবাস করিতেছেন। অর্দ্ধ শতাব্দী আগে একদিন জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর হইতে কুর্থার এই নিভৃত অরণ্যে আসিয়া তিনি উপস্থিত হন। তারপর দীর্ঘদিন চলে নিভৃত তপস্যা। সাধনা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তিনি অর্জ্জন করেন এ অঞ্চলের নরনারীর অপরিসীম শ্রদ্ধা।

ভ্রাতা এক স্বনামধন্য সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাই তাঁহার প্রতি অযোধ্যাজীর ভক্তি বিশ্বাস অপরিসীম। সুযোগ পাইলেই গাজীপুর অঞ্চলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া যান।

বৃদ্ধ লছমীনারায়ণ এখন একেবারে চলচ্ছক্তিহীন, চোখ দুইটিও সম্প্রতি অন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটি তরুণ ব্রহ্মচারী শিষ্য কাছে থাকিয়া সর্ব্বদা দেখাশুনা করেন। কিন্তু আশ্রমের কাজের চাপ নিতান্ত কম নয়। পূজা অর্চ্চনা, ভোগরাগ ও অতিথি সৎকারের কাজে ভোর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরত তাহাকে খাটিতে হয়। ফলে গুরুজীর সেবার কাজ তেমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে না।

অযোধ্যা তেওয়ারী এবার প্রস্তাব করিলেন, বৃদ্ধ মহারাজের সেবা শুশ্রূষার জন্য নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাকে এ আশ্রমে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু মহারাজ কিছুতেই রাজী হইতে চাহেন না। তারপর বহু সাধ্য সাধনার পর এক সময়ে হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "বেশ তো

যদি নিতান্তই কাউকে পাঠাতে চাও, তবে পাঠিয়ে দাও তোমার ছোট ছেলে হরভজনকে।”

“সে কি! সে যে দশ বৎসরের বালক মাত্র। আপনার সেবা, আশ্রমের কাজ—এত সব এই ছেলে কি ক'রে পারবে?

প্রবীণ তপস্বীর মুখে ফুটিয়া ওঠে মৃদু হাসি। বলেন, “না অযোধ্যা, যা ভাবছো তা নয়। তোমার ঐ ছেলেই পারবে আমার সকল ভার নিতে। সেবা মানে শুধু এই দেহেরই সেবা, তা ভাব্ছো কেন? বালক হরভজন পরম শুদ্ধ আধার। শুধু আমাদের বংশেরই নয়, সারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে সে। আমার এবং আমার এই আশ্রম, দুয়েরই জন্য তাকে দরকার। মনে দ্বিধা না রেখে তুমি প্রেমপুরে ফিরে যাও, তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো।”

কথা তো দিয়া আসিলেন। কিন্তু এখন বালক, হরভজনের মাকে কি করিয়া সম্মত করানো যায়? কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার অঞ্চলের নিধি। দেখিতেও সে সুগৌর, সুঠাম এক দণ্ড তাহাকে না দেখিলে মা অস্থির হইয়া পড়েন। বালকও সারাদিনই ঘুরে মায়ের পিছে পিছে। যত কিছু আদর, আবদার, চলে শুধু মায়েরই সঙ্গে।

শৈশবে, বসন্ত রোগে হরভজনের দক্ষিণ চক্ষুটি হঠাৎ একদিন নষ্ট হইয়া যায়। এ কি দুর্দৈব নামিয়া আসিল এই শিশুর জীবনে? পিতামাতা সেদিন মুষড়িয়া পড়েন।

সে-বার গাজীপুরে অগ্রজের কাছে এই দুঃসংবাদটি অযোধ্যাজী নিবেদন করেন। প্রবীণ সাধক আশ্বাস দেন, “অযোধ্যা, এজন্য তোমরা কেউ দুঃখ করো না। জান তো, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিত সিং-এরও ডান চোখ ছিল না। দেখে নিয়ো, উত্তরকালে তোমাদের এই পুত্র হবে আর এক ধরণের রাজা দেশের লোকের কাছ থেকে পাবে অসীম সম্মান।

লছমীনারায়ণের নূতন প্রস্তাবের কথা জননী শুনিলেন, মাথায় তাঁহার আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

এই কচি বয়সে তাহাকে সাধু পিতৃব্যের সেবায় লাগানো হইবে? আশ্রমের সকল দায়িত্ব থাকিবে তাহার উপর? গৃহে সে যে সবার আদরের দুলাল। কি করিয়া এত সব কাজ করিতে পারিবে? আর পিতামাতাকে ছাড়িয়া আশ্রমের নিভৃতবাসেই বা কি করিয়া থাকিবে? এ কেমন নিষ্ঠুর প্রস্তাব?

জননী ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠেন। কোনমতেই মন তাঁহার সায় দিতে চায় না।

কিন্তু অযোধ্যা তেওয়ারী অনন্যোপায়। বৃদ্ধ তপস্বী লছমীনারায়ণ শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নন, গুরুর মতই তাঁহাকে তিনি শ্রদ্ধাভক্তি করেন। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধানে তাঁহারই নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া নেন। তাছাড়া, অন্তরে একথা তিনি ঠিকই বুঝিয়া নিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতৃব্যের সেবা উপলক্ষ করিয়া বালকের সম্মুখে খুলিয়া যাইতেছে এক নূতন জীবনের দ্বার। নাঃ, কোন দিক দিয়াই এ সিদ্ধান্ত আর ফিরাইবার উপায় নাই।

শেষ অবধি সাধু লছমীনারায়ণের কথা অমান্য করা হরভজনের মাতার সাহসে কুলায় নাই। আঁচলে নয়ন মুছিয়া কোলের ছেলেটিকে সেদিন তিনি বিদায় দেন।

চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া অযোধ্যা তেওয়ারীর পুত্র প্রবেশ করে কুর্থার সাধন-আশ্রমে।

উত্তরকালে, সেখানকার ত্যাগ তিতিক্ষাময় পথে তাহার উত্তরণ ঘটে এক মহাপুরুষরূপে। ইনিই ভারতবিশ্রুত পওহারী বাবা।

জৌনপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম প্রেমাপুর। ভক্তিমান ও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বলিয়া এই গ্রামের তেওয়ারীদের সেকালে খুব সুনাম ছিল। এই বংশে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পওহারীবাবা ভূমিষ্ঠ হন। পিতার তিনি দ্বিতীয় সন্তান।

দশ বৎসর বয়সে জননীর স্নেহ সান্নিধ্য হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হন।

তারপর পিতৃব্যের আশ্রমে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মাঝখানে পিতা অযোধ্যা তেওয়ারী শুধু একবার তাঁহাকে গৃহে নিয়া গিয়াছিলেন। তখন ছিল বালকের উপনয়ন পর্ব্ব। অতঃপর আবার তাঁহাকে আশ্রমে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

নূতন ব্রহ্মচারীর বেশে হরভজনকে বড় সুন্দর দেখায়। মুণ্ডিতশির, গৈরিক পরিহিত, গলে বিলম্বিত যজ্ঞসূত্র। ফাঁক পাইলেই বিচরণ করেন আশ্রম সন্নিহিত অরণ্যে। জাহ্নবীর কূলে কূলে আপন মনে ভজন গাহিয়া বেড়ান। কখনো বা চাহিয়া চাহিয়া দেখেন স্রোতস্বিনীর অপরূপ তরঙ্গলীলা।

বালকের সারা অঙ্গে লাবণ্যের শ্রী। চোখে মুখে জড়ানো স্বপ্নালু ভাবময়তা। যেন এ লৌকিক জগতেরই কেউ নয়। গ্রামের লোক বলাবলি করে,—এ বালক-সাধু, এ যুগের ধ্রুব।

সেবার উদ্দেশ্যে হরভজনকে আনানো হইলেও লছমীনারায়ণ তাঁহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে ভুল করেন নাই। আশ্রমের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে সুযোগ করিয়া দেন তাঁহার ধ্যানভজন ও শাস্ত্রপাঠের।

লছমীনারায়ণ নিজে শুদ্ধাচারী কঠোরতপা সাধক। রামানুজী সম্প্রদায়ের এক সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়াছেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার মধ্য দিয়া হইয়াছেন আপ্তকাম। নিজের পরীক্ষিত এই সাধন পথেই বালক হরভজন যাহাতে অগ্রসর হয়, চরম সার্থকতা খুঁজিয়া পায়, ইহাই তিনি চান।

লছমীনারায়ণ বংশানুক্রমে রামানুজী সম্প্রদায়ের বড়গল শাখার অন্তর্ভুক্ত। রামানুজীদের প্রধান দুইটি শাখার নাম—বড়গল ও তুইঙ্গল। সম্প্রদায়ের এই শাখাগত বিভেদ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা বড় কৌতূহলোদ্দীপক :

বহুদিন আগেকার কথা। সেদিন শ্রীরঙ্গমে এক পূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। অদম্য উৎসাহ আর

উদ্দীপনা ভক্ত নরনারীর চোখে মুখে। রঙ্গনাথজীর রথ চলিয়াছে এক বিরাট শোভাযাত্রাসহ।

ভক্তেরা ব্যগ্রভাবে অপেক্ষমান। প্রভুজীর দর্শন লাভের পর ভক্তিভরে প্রণাম জানাইয়া তাহারা ঘরে ফিরিবে।

রাস্তার পাশেই পড়ে এক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মঠ। এখনকার প্রধান আচার্য্যও এসময়ে ভক্তজন পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বাদ্যভাণ্ড সহকারে রথ সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। আচার্য্য তাকাইয়া দেখিলেন, তাঁহার এক বিশিষ্ট শিষ্য শশব্যস্তে ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু একি! প্রবীণ শিষ্যের ললাটস্থিত ত্রিপুণ্ড্রক চিহ্ন তখনো যে রহিয়াছে অসমাপ্ত।

আচার্য্যের ক্রোধের সীমা রহিল না। শুদ্ধাচারী রামানুজী সাধুর পক্ষে এ যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ!

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "প্রভুর সেবকের চিহ্ন ধারণ করতে যার এতো শৈথিল্য, বৈষ্ণব ব'লে পরিচয় দেওয়া তার সাজে না। এই ত্রিপুণ্ড্রক যথাযথভাবে 'অঙ্কিত না ক'রে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা আজ কি ক'রে ক'রলে? এর উত্তরে কি বল্‌বার আছে, বল?"

শিষ্য যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "আচার্য্যবর, রঙ্গনাথজীর পূজোর আয়োজন নিয়েই তো এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। ললাটে তিলক এঁকে আসনে বসতে যাবো, এসময়ে কাণে গেল শোভাযাত্রার এই সোরগোল। ভাব্‌লাম, যাঁর জন্য এত আয়োজন, ভাগ্যগুণে তিনি নিজেই এসে পড়েছেন রথারূঢ় হয়ে। তবে আর পূজো অনুষ্ঠানের কি দরকার? তাই তো অধীর হয়ে ছুটে এলাম।"

একটু পরেই অপর প্রধান শিষ্য ধীরপদে আসিয়া উপস্থিত। ততক্ষণে রথ ও শোভাযাত্রা চলিয়া গিয়াছে।

আচার্য্য রোষে ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "মঠের ভেতরে, মোহান্তের মত গদীয়ান হয়ে বসে আছো, আর এদিকে প্রভু রঙ্গনাথজী চলে গেলেন দ্বারের পাশ দিয়ে। একবারটি তাঁর চরণে প্রণাম

নিবেদনেরও প্রয়োজন বোধ করলে না ! ভক্তিমার্গের সাধন নিয়ে উত্ত
আচরণই তোমরা শিখ্ছো ।"

"আচার্য্যবর, আপনিই তো ব'লে দিয়েছেন, উপাস্যের কৃপালাভ
হয় উপাসনা দ্বারা। সেই উপাসনায়ই এতক্ষণ মগ্ন ছিলাম, উপাস্যকে
দেখবার জন্য ছুটে আসা আর সম্ভব হয়নি। তাতে যদি কোন অপরাধ
হয়ে থাকে, নিজগুণে আমায় মার্জ্জনা করুন।"

আচার্য্যের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে অপার প্রসন্নতা। এই দুই
শিষ্যকেই সানন্দে দেন আলিঙ্গন।

কথিত আছে, আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে এই দুই বিশিষ্ট শিষ্যকে
চিহ্নিত করা হয়—বড়গল ও তুইঙ্গল নামে। পরবর্ত্তীকালে রামানুজীদের
এই দুই শ্রেণীর পার্থক্য সূচিত হইতে দেখা যায় তিলকের বৈশিষ্ট্য
দ্বারা। এক শ্রেণীর সাধকেরা ললাটে আঁকেন ত্রিশূলাকৃতি তিলকের
রেখা। অপর শ্রেণীর তিলকসজ্জা থাকে সারা নাসিকা জুড়িয়া।

ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, পওহারীবাবা ছিলেন প্রথমোক্ত বড়গল
শাখার অন্তর্ভুক্ত।

দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়া বড়গল রামানুজীরা বিশিষ্টাদ্বৈত-
বাদী। ভক্তি সাধনার পদ্ধতি ইহাদের বড় কঠোর। শাস্ত্রচর্চ্চা
একৈকনিষ্ঠা, শুদ্ধাচারের উপর ইঁহারা অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেন।
পিতৃব্য লছমীনারায়ণজীর অভিভাবকত্বে পওহারীবাবার জীবনধারা
সম্প্রদায়ের ঐ চিরাচরিত পথটি বাহিয়াই চলিতে থাকে।

শেষ রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া বালক ব্রহ্মচারী গঙ্গাস্নান সমাপন
করেন, তারপর চলে পূজা অর্চ্চনা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রাত্যহিক কৃত্যাদির
শেষে তাঁহাকে ভোগ রাঁধিতে হয়। ইষ্টদেবের ভোগপ্রসাদ নিবেদন
করার পর তাহা পরিবেশন করেন বৃদ্ধ পিতৃব্য ও তাঁহার মন্ত্রশিষ্যকে।
সর্ব্বশেষে নিজে আহার্য্য গ্রহণ করেন।

আশ্রমের কাজকর্ম্মের সঙ্গে হরভজনের শিক্ষাও আগাইয়া চলে।

পিতৃব্যের সুব্যবস্থায় নিতে থাকেন সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার পাঠ।

কৈশোরে পা দিতে না দিতেই হরভজন চিহ্নিত হইয়া উঠেন এক প্রতিভাধর শিক্ষার্থীরূপে। গাজীপুরের বেচন পণ্ডিত ও পিতৃব্য লছমীনারায়ণজী তাঁহার প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরু। তা'ছাড়া, মাঝে মাঝে আশ্রমে আগত অন্যান্য পরিব্রাজক আচার্য্যদের কাছেও তিনি শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ নিতে থাকেন। অচিরে বহু দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়।

হরভজনের বয়স তখন ষোল বৎসর। এসময়ে সেদিন তাঁহার জীবনে নামিয়া আসে প্রচণ্ড আঘাত। অল্প কিছুদিন রোগ ভোগের পর লছমীনারায়ণ পরলোকে গমন করেন। পিতৃব্য তাঁহার অভিভাবক ও ধর্ম্মজীবনের পথদর্শক। যে মমতা, স্নেহ ও ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া এ কয়টি বৎসর তিনি তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কখনো ভুলিবার নয়। তাঁহার প্রয়াণে হরভজন বড় মুষড়িয়া পড়েন।

সমাধি দানের পর মহা আড়ম্বরে ভাণ্ডারা সম্পন্ন হয়। এসব কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া গেলে হরভজনের জীবনে আসে নির্ব্বেদ। কোন কিছুতেই মন তাঁহার আর বসিতে চায়না। শিক্ষক ও দীক্ষাগুরু পিতৃব্য তাঁহার তরুণ জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিলেন। এবার তাঁহার বিহনে সবই যেন শূন্য বোধ হয়। এ পরিবেশ আর ভাল না লাগায় ভাবিলেন, কিছুদিনের জন্য একবার তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিবেন।

পিতৃব্যের এক মন্ত্রশিষ্য থাকেন আশ্রমে। তাঁহার উপর সেবা-পূজার ভার দিয়া তরুণ সাধক একদিন পথে বাহির হইয়া পড়েন। প্রধান প্রধান সকল তীর্থই তিনি দর্শন করেন। পরিব্রাজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাপ্ত হন বহু সাধু মহাত্মার তপস্যাপূত জীবনের সান্নিধ্য।

ঘুরিতে ঘুরিতে সেবার দ্বারকায় আসিয়াছেন। রণছোড়জী বিগ্রহ দর্শনের পর হরভজন গির্নার পাহাড়স্থিত তীর্থগুলি দেখিতে গেলেন।

মন বড় ব্যাকুল। এত তীর্থ, এত বিগ্রহ এবং সাধুসন্ত দর্শন করিলেন, কিন্তু কই, সত্যকার পথপ্রদর্শক তো আজো তাঁহার ভাগ্যে জুটিল না! সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভের জন্য, নূতন আলো ও নূতন পথের জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।

একদিন লোকমুখে শুনিলেন, কয়েক মাইল ব্যবধানে অরণ্যময় পর্ব্বতের এক গুহায় একজন শক্তিধর বৃদ্ধ যোগী বাস করেন। আপন তপস্যার গভীরে তিনি সদা মগ্ন, লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই বেশী অভ্যস্ত। তাই সহসা কেহ তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহসী হয় না।

মহাত্মার কথা শোনামাত্র, কি জানি কেন, হরভজনের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্থির করিলেন, যে করিয়াই হোক, তাঁহার চরণতলে আশ্রয় নিবেন, মাগিবেন মন্ত্রদীক্ষা।

পরদিন প্রত্যূষে, সঙ্গীদের কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, একাকী সেই পর্ব্বত গুহায় উপস্থিত হইলেন।

ভাগ্যক্রমে গুহার দ্বারপথেই মিলিল মহাত্মার দর্শন। দৃঢ়সমুন্নত মহিমময় মূর্ত্তি। শিরে দীর্ঘ জটাজাল। একেবারে দিগম্বর। আয়ত নয়ন দুইটিতে দিব্যালোকের প্রশান্তি। দর্শনমাত্রেই শ্রদ্ধাভরে হরভজন চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আমি নিতান্ত অধম, তদুপরি নিরাশ্রয়। মূর্খ আমি, তাই ভেলা বেয়ে দুস্তর সাগর পার হবার চেষ্টা ক'রছি। আমায় আপনি কৃপা করুন, আপনার চরণতলে রেখে যোগদীক্ষা দিন।"

যোগী কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর আশীর্ব্বাদ জানাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "বেটা, কেঁও তুম্ বেকার ইয়ে জঙ্গলমে ঢুঁড় রহে হো? যাও, গঙ্গা কিনারমে ব্যয়ঠ যাও। ওহি তুমহারা আস্থান হ্যায়।"—অর্থাৎ, বাবা, কেন শুধুশুধু এই জঙ্গলে ঘুরে মরছো। যাও, গঙ্গাতীরে আসন নিয়ে বসে পড়ো, সেখানেই তোমার সাধনার স্থান।

হরভজন অসহায় বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। "না বাবা, কৃপা না করলে এখান থেকে এক পা-ও আমি নড়ছিনে। আমরণ অনশন ক'রে আপনার সামনেই প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।"

যোগীবর কিছুটা নরম হইলেন। এবার যাহা কহিলেন তাহার মর্ম্ম—'বেটা, দীক্ষা আমি সহজে কাউকে দিই না। তাছাড়া, তোমার গুরু রয়েছেন অন্যত্র। তবে তোমার ব্যাকুলতা দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি! আমি তোমায় কিছু যোগসাধন দেবো, তাতে তোমার প্রকৃত কল্যাণ হবে।'

মহাত্মার পদতলে বসিয়া হরভজন কয়েকটি নিগূঢ় যোগসাধন গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন এখানে অতিবাহিত করার পর পাহাড় হইতে যখন নীচে অবতরণ করিলেন তখন তিনি এক নূতন মানুষ।

মহাযোগীর কৃপায় সাধনজগতের অজানা তত্ত্বের আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন, মিলিয়াছে অতীন্দ্রিয় লোকের আলোক সন্ধান। অনাস্বাদিত অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে।

আরো কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া হরভজন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। চেহারায় ও আচরণে এ সময়ে তাঁহার মধ্যে আসিয়াছে বিরাট পরিবর্ত্তন। তপঃসিদ্ধ এই নবীন সাধককে দেখার জন্য সেদিন কুর্থার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গাজীপুর ও কুর্থা অঞ্চলে সাধু লছমীনারায়ণের আশ্রমের খুব সুনাম ও প্রতিষ্ঠা ছিল। এখন হইতে ইহার পরিচালনার ভার পড়িল হরভজনের উপর।

শুধু দেব-বিগ্রহের সেবাপূজা ও অতিথিদের অভ্যর্থনাই নয়, শত শত গ্রামবাসীর ধর্ম্মজীবনের অভিভাবকত্বও এই আশ্রমের পরিচালককে করিতে হয়। হরভজন যে এ গুরু দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ রহিল না।

ভক্ত ও মুমুক্ষুদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ হয়।

সমাজ ও ধর্ম্ম জীবনের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য লোকে তাঁহার নিকট আসিতে থাকে।

গির্নারের যোগীর পুণ্যসঙ্গ ও সাধন নির্দ্দেশ পাইবার পর হইতেই হরভজনের সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে এক আলোকময় রাজ্য, সাধনজীবনে যুক্ত হইয়াছে এক নূতনতর ধারা। আশৈশব তিনি রামানুজপন্থী বৈষ্ণবসাধনা অনুসরণ করিয়া আসিযাছেন। গ্রহণ করিয়াছেন শাস্ত্রনিষ্ঠা, শরণাগতি ও কৃচ্ছ্র ব্রত। এবার তাহাতে আসিয়া মিলিয়াছে যোগ-সাধনার শক্তি। অনুভূতি ও সিদ্ধির নব নব স্তর একটির পর একটি তিনি পার হইয়া চলিয়াছেন।

পওহারীবাবার অন্যতম জীবনীকার শ্রীগগনচন্দ্র রায় এ সময়কার একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—

"এই সময় একদিন অপরাহ্ণে তিনি স্বহস্তে ডাল রুটি প্রস্তুত করিয়া জ্যেষ্ঠতাত-শিষ্যের জন্য পরিবেশন করিয়া নিজে ভোজনার্থ উপবেশন করেন। কিন্তু রুটি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—আর আমি ভোজন করিব না। সেই থালার সহিত ডাল রুটি একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া জ্যেষ্ঠতাত-শিষ্যের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে বিল্বপত্র বাটা ও সেই সঙ্গে অর্দ্ধপোয়া, কোনও দিন এক পোয়া, দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কেবলমাত্র বিল্বপত্র বাটা খাইয়া থাকিতে লাগিলেন। এখন হইতে সাধারণে তাঁহাকে পওহারীবাবা বলিতে আরম্ভ করে।

"আট নয় মাস কাল তিনি ৫০টি মরিচ প্রতিদিন জল দিয়া বাটিয়া বস্ত্র খণ্ডে ছাঁকিয়া এক ঘটি সেই সরবৎ পান করিয়া থাকিতেন। মরিচ-রস পানের পরে এক পোয়া দুগ্ধ পান করিতেন।"

যোগশক্তির উচ্চতর স্তরগুলি অতিক্রম করিতে থাকিলেও পওহারীবাবার জীবনে বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও নিরভিমানতার অভাব কখনো দেখা যায় নাই। সাধনার দিক দিয়া তিনি ছিলেন মধুকর-বৃত্তি গ্রহণের

পক্ষপাতী। যেখানে যে প্রবীণ ও সমর্থ সাধকের সন্ধান পাইতেন তাঁহারই নিকট হইতে অপার নিষ্ঠায় সংগ্রহ করিতেন অধ্যাত্ম-জীবনের পরম পাথেয়।

তাই দেখা যায়, শুধু সাধু লছমীনারায়ণ ও গির্নারের যোগীর পদপ্রান্তে বসিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আকুল হৃদয়ে বারবার ছুটিয়া গিয়াছেন অপরাপর শক্তিধর মহাত্মাদের সমীপে। ইঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট হইতেছেন গাজীপুরের সন্নিহিত মোহনা-ওল গ্রামের গুহাবাসী এক মহাত্মা এবং কাশীর খ্যাতনামা যোগী নিরঞ্জন-স্বামী।

পওহারীবাবার সাধনজীবনের কিছুটা মূল্যবান তথ্য আমরা স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় পাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"ইতিমধ্যে এই মহাত্মার বিশেষত্বসমূহ দিন দিন অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল! বারাণসীর সন্নিকটবাসী তাঁহার গুরুর মত তিনিও ভূমিতে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক ঘণ্টা ধরিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি আহার সম্বন্ধে অতি ভয়ানক কঠোর সংযম আরম্ভ করিলেন। সারাদিন তিনি নিজের ছোট আশ্রমটিতে কার্য্য করিতেন—তদীয় পরম প্রেমাস্পদ প্রভু রামচন্দ্রের পূজা করিতেন, উত্তম খাদ্য রন্ধন করিয়া (কথিত আছে, তিনি রন্ধন বিদ্যায় অসাধারণ পটু ছিলেন) ঠাকুরের ভোগ দিতেন, তাহার পর সেই প্রসাদ বন্ধুবান্ধবগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের সেবা করিতেন। তাহারা সকলে যখন শয়ন করিত, তখন এই যুবক গোপনে সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া উহার অপর তীরে যাইতেন। তথায় সাধন ভজনে সারারাত কাটাইয়া উষার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে জাগাইতেন এবং পুনর্ব্বার সেই নিত্যকার্য্য আরম্ভ করিতেন, আমরা যাহাকে ভারতে 'অপরের সেবা বা পূজা' বলিয়া থাকি।"

পওহারীবাবা কঠোরতপা শক্তিমান সাধক। কিন্তু তাঁহার চোখে মুখে সদাই মাখানো থাকিত অপূর্ব্ব দৈন্য ও মধুর ভাবময়তা। দর্শনার্থী

নরনারীর দৃষ্টি সমক্ষে নিজেকে সদাই তিনি তুলিয়া ধরিতেন সেবানিষ্ঠ ভক্তরূপে। নিজেকে সদাই উল্লেখ করিতেন 'দাস' বলিয়া।

তাঁহার বৈষ্ণবীয় আদর্শ, জীবপ্রেম ও সেবাব্রতের নানা মনোরম কাহিনী রহিয়াছে।

সে-বার প্রয়াগের মাঘমেলায় বাবাজী মহারাজ তীর্থ স্নান করিতে চলিয়াছেন। সঙ্গে স্বগ্রামবাসী একদল ব্রাহ্মণ ও রাজপুত।

তীর্থদেবতা ও তীর্থযাত্রী এই দুয়েরই সেবাকার্য্যে ছিল তাঁহার অপাব নিষ্ঠা। পথ চলিতে চলিতে আগে হইতেই সঙ্গীদের কাছে জানিয়া রাখিতেন, যাত্রাপথের কোন্ অবধি গিয়া সকলে সেদিন বিশ্রাম নিবেন। তারপর দেখা যাইত, অন্যের অলক্ষ্যে, এক সুযোগে হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। দ্রুতপদে কণ্টকময় বন-ঝাঁদাড় ভাঙ্গিয়া সোজা পথ দিয়া তিনি ধাবিত হইতেন। যে কোন প্রকারে সঙ্গীদের আগে গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার পৌঁছান চাই। সঙ্গীরা তো বিশ্রাম ঘাঁটিতে গিয়া অবাক! পওহারী বাবা তাহাদের অনেক আগেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সকলের জন্য রন্ধন করিতে হইবে, তাহার যোগাড়ের জন্য মহাব্যস্ত। গোময় দিয়া সারা জায়গাটা লেপন করিয়াছেন। উনুন পাতা অনেক আগেই শেষ হইয়াছে। সঙ্গীরা সেখানে পৌঁছানোর পর মুখে বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া শুচিভাবে রান্না করিতে বসিলেন। সবাইকে ভোজন করাইয়া তবে তাঁহাব স্বস্তি।

এদিকে পওহারী বাবার নিজের আহারের ব্যবস্থা কিন্তু বড় অদ্ভুত। দলের প্রত্যেকটি লোকেব ভোজনের পর তিনি স্নান সমাপন করিয়া আসিতেন। এসময়ে তাঁহার আহার্য্যের প্রধান উপকরণ মাত্র—তিন চারিটি বিল্বপত্র। মাঝে মাঝে আরও একটি খাদ্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। হাতের তেলোতে যৎসামান্য উষ্ণ ঘৃত ঢালিয়া নিয়া উহাতে তিনি একটা বিশেষ দ্রব্য মিশ্রিত করিতেন। এই দ্রব্যটি পাইয়াছিলেন গির্নারের প্রাচীন যোগীব নিকট। তিনি বলিতেন, এই মিশ্র বস্তুটি গলাধঃকরণ করার পর সেদিনকার মত ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন

চিহ্ন আর থাকিতনা। দিনের পর দিন এমনি সেবানিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিত পওহারী বাবার দিনচর্য্যা ও আত্মিক সাধনা।

কুর্থার আশ্রমে সেবার এক মৃত্তিকাগুহা নির্ম্মাণ করার পর বাবাজী মহারাজ কঠোরতর ভজন সাধনে রত হন। বহিরঙ্গ জীবনের জাল গুটাইয়া আনিয়া ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন সাধনার গভীরতর স্তরে। সমকালীন সাধন জীবনের চিত্রটি শ্রীগগনচন্দ্র রায়ের লেখা হইতে আমরা পাই—

“গুহা নির্ম্মিত হইলে পওহারীবাবা প্রথমে এক ঘণ্টা, পরে দিবস, শেষে সপ্তাহ অবধি গুহার মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করেন। পূজা-অর্চ্চনা আহার পান কিছুই করিতেন না। সাধন পূর্ণ হইলে যখন কুটিরের দ্বার- উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিতেন, তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ হইতে যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইত। সুপুষ্ট উন্নত দেহে তিনি অসীম বল ধারণ করিতেন।

“তিনি উপনয়ন উপলক্ষে শৈশবকালে একবার মাত্র মস্তক মুণ্ডন করেন, তাহার পর কখনও মস্তক মুণ্ডন করেন নাই। ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া থাকিত। পূর্ণ যৌবনে ঘন শ্মশ্রু শোভিত সুন্দর মুখ-মণ্ডলের শোভা ও গাম্ভীর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ হইয়াছিল।

“পওহারীবাবা সাধারণ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় অঙ্গে ভস্ম বা ধূলি লেপন করিতেন না, কিম্বা মস্তকে জটাভারও ধারণ করেন নাই। অতি শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, মস্তকে সুবাসিত তৈল সিঞ্চন করিয়া কেশ-কঙ্কতী দ্বারা কেশরাশি পরিচ্ছন্ন করতঃ মস্তকের সম্মুখভাগে চূড়ার আকারে নিবদ্ধ করিতেন। দীর্ঘ কেশরাশি পরিচ্ছন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে দধি ও মরিচ গুঁড়া দিয়া মধ্যে মধ্যে ধুইয়া ফেলিতেন।

“পরিধানে কৌপীন ও তদুপরি মলিদার ঝুল (আলখাল্লা) চরণ

অবধি আবৃত করিয়া থাকিত, লোকে কেবল মুখখানি দেখিতে পাইত। দৈবাৎ হস্ত বা স্কন্ধদেশ হইতে আলখাল্লা একটু সরিয়া পড়িলে তপ্ত স্বর্ণেব ন্যায় দেহকান্তি প্রকাশ পাইত।”

পূজা অর্চ্চনা যোগ তপ সব কিছুই পওহারীবাবা নিষ্ঠাভবে কবিয়া চলিয়াছেন। সাধনলোকেব দিব্য অনুভূতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন বারবার। কিন্তু তবুও মন তাঁহার ভরিয়া উঠে কই? পরম প্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে জাগে তীব্র আকুতি। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চরম সাধনার মহাসমুদ্রে তিনি নিমজ্জিত হইয়া যাইতে চান। অভীষ্ট সাধনেব এ আকাঙ্ক্ষা ক্রমে দুর্নিবার হইয়া উঠে।

কিন্তু কোথায় সেই মহাসমর্থ গুরু যাঁহার আশ্রয়ে এ জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে? কে দিবে তাঁহার সন্ধান?

হঠাৎ মনে পড়ে গির্নারেব মহাত্মাব কথা। নিগূঢ় যোগসাধনার নির্দ্দেশ দিয়া একবাব তিনি অপাব কৃপা করিয়াছেন। আবাব তাঁহার চবণ ধবিয়া পড়িলে, কাঁদাকাটি করিলে, তিনি কি কৃপা কবিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন না?

অন্তবে অদম্য আশা নিয়া পওহারীবাবা আশ্রম ত্যাগ করিলেন। লক্ষ্যস্থল গির্নারের পাহাড়।

ঘুরিতে ঘুরিতে অযোধ্যায় আসিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে দুই চোখে দেখিলেন অন্ধকার। গির্নারের মহাত্মা আব ইহজগতে নাই, সম্প্রতি মরলীলা সংবরণ কবিয়াছেন।

এবাব তবে উপায়? দুর্ভাগ্যক্রমে উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনিও ঠিক করিয়াছেন, সঙ্কল্প সিদ্ধ না হওয়া অবধি আশ্রমে আব ফিরিয়া যাইবেন না। মহা দুশ্চিন্তায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

অযোধ্যায় থাকিতেই হঠাৎ একদিন তিনি শুনিলেন, রামানুজী সম্প্রদায়ের কোন উচ্চকোটি সাধক গঙ্গাতীরেব এক আশ্রমে নিভৃতে

তপস্যারত রহিয়াছেন। অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"ওরে ইনিই তোর পরিত্রাতা, তোর বহু আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষাগুরু। ইঁহারই চরণে শরণ গ্রহণ কর্।'

সেদিন প্রত্যূষে এই নবাগত সাধুর ভজন-গোফায় গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন, সকাতরে চাহিলেন পরমাশ্রয়।

ঐ কঠোরতপা বৈষ্ণব তাপসের কাছে পওহারীবাবা দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুদিন তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যে দিন যাপন করিয়া ফিরিয়া আসেন কুর্থা-গাজীপুরের আশ্রমে। কৃচ্ছ্র ব্রত ও দুশ্চর তপস্যার মধ্য দিয়া বহিয়া চলে তাঁহার শেষ পর্য্যায়ের সাধনা।

দীক্ষাদাতা মহাত্মার নাম কখনো জানা যায় নাই, গুরুর পরিচয় পওহারী বাবা চিরদিন গোপন রাখিয়া গিয়াছেন।

পিতৃব্যের আদর্শে পওহারী বাবা অনুপ্রাণিত। তাই কৈশোর কাল হইতেই অতিথি ও সাধুদের সেবায় তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এবার নিজের আশ্রমে সেবাব্রতকে পূর্ণাঙ্গ করার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা এ কাজে তাঁহার সহায়ক হইয়া উঠিল।

বাবাজীর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা অপরিসীম। গৃহস্থেরা লাঙল প্রতি পাঁচ সের করিয়া শস্য তাঁহার আশ্রমে পাঠাইয়া দেয়। জমিদার, ব্যবসায়ীরা যে টাকাকড়ি ও আটা চিনি ঘৃত ইত্যাদি ভেট দেয় তাহার পরিমাণও প্রচুর।

অতিথি অভ্যাগতের সেবা ছাড়া বড় বড় ভাণ্ডারার ব্যবস্থাও পওহারীবাবা করিতেন। শত শত দীন দরিদ্র ও সাধু সন্ন্যাসীকে এসময়ে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করানো হইত।

আর্থিক দিক দিয়া এই গুরু দায়িত্বের ভার বহন করা বড় সহজ কথা নয়। তাই বুঝি একাজে প্রকৃতি দেবী আগাইয়া আসেন তাঁহার দাক্ষিণ্য নিয়া। মহাবৈষ্ণবকে সঙ্কল্প উদ্‌যাপনের জন্য ব্যস্ত হইতে দেখিয়া দেবী জাহ্নবী পাশে আসিয়া দাঁড়ান।

আশ্রমের সম্মুখেই প্রসারিত এক হাঁয়সা বন, এ বন আশ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত। উহার গা ঘেঁষিয়া বহিয়া চলিয়াছে জাহ্নবীর খরস্রোত। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করা গেল, নদী গতিপথ পরিবর্ত্তন করিতেছে। অল্পকাল মধ্যে সেখানে এক প্রকাণ্ড চড়া পড়িয়া গেল। আইন অনুসারে এই ভূমি আশ্রমের। জল হইতে সদ্য উত্থিত হওয়ায় প্রচুর শস্য এস্থানে উৎপন্ন হইতে থাকে। আশ্রমের সদাব্রত ও ভাণ্ডারায় প্রতি বৎসর যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইত, তাহার অনেকটা যেন আপনা হ ইতেই এভাবে আসিয়া যায়।

আশ্রমের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্ম বহুবিধ, দায়িত্বভারও কম নয়। কিছুদিন পর হইতে পওহারী বাবা এ সব কাজের ভার বাঁটিয়া দিতে থাকেন নবীন ভক্তদের উপর। নিজের অন্তর্ম্মুখীন ভাব দিন দিন বাড়িয়া যায়। এখন হইতে কুটিরের অভ্যন্তরেই বেশীর ভাগ সময় তিনি কাটাইতে থাকেন।

গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থেরা ভক্তিভরে তাঁহার জন্য ভেট নিয়া আসে। দর্শন অনেক সময়ই হয়তো মিলে না। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উপর রামনাম লেখা কাগজ আঁটিয়া তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। এই রামনামের পত্র গায়ে আঁটা না থাকিলে বাবাজী কখনো এই সব ভেট স্পর্শ করিতেন না।

দীর্ঘকাল সূর্য্যালোকবিহীন কুটিরে ও ধ্যানগুহায় পওহারী বাবা অতিবাহিত করেন। ফলে দেহটি তাঁহার পুষ্পের মত কোমল হইয়া উঠে। রং হয় তুষার-শুভ্র। এ অবস্থায় একবার মাঘ মেলা উপলক্ষে তিনি প্রয়াগে যান, ত্রিবেণীর নিকট বালুচরে এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন।

এতদিন পরে সূর্য্যতাপ ও বায়ুর সংস্পর্শে আসার ফলে বাবাজীর দেহের চর্ম্ম স্থানে স্থানে উঠিয়া যায়। প্রবল জ্বরে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। এই সঙ্গে দেখা দেয় আর এক বড় উপসর্গ, স্বরভঙ্গ। সকলে চিকিৎসার জন্য মহাব্যস্ত। কিন্তু বাবাকে নিয়া হইয়াছে বিপদ,

কাহারো কথায় তিনি কর্ণপাত করিতে চাহেন না, ঔষধ খাইতেও একেবারে অনিচ্ছুক।

প্রয়াগের কয়েকটি শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বড় ভক্তি করেন। রোগের কোন উপশম হইতেছে না দেখিয়া একদিন তাঁহারা খুব চাপিয়া ধরিলেন। বাবাকে এবার ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতেই হইবে। এ ধরণের স্বরভঙ্গ রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে যে গলক্ষত রোগের আশঙ্কা রহিয়াছে!

তাঁহারা সকাতরে অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন, "মহারাজ, দেহের প্রতি আপনার নিজের কোন মমতা নেই, একথা ঠিক। কিন্তু আমাদের জন্য তো আপনার বাঁচার প্রয়োজন আছে। আপনাকে ঔষধপথ্য খেতেই হবে।"

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়ানো গেলনা। বাবাজী কহিলেন, "আচ্ছা, বেশতো, আপনারা এ দাসকে কি ঔষধ দেবেন—দিন।"

নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে 'দাস' বলিয়াই সর্ব্বদা তিনি উল্লেখ করিতেন।

বৈদ্যের ব্যবস্থামত তখনি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আনা হইল। বাবাজী সহাস্যে কহিলেন, "বাবা-সকল, ঔষধ তো আপনারা দিচ্ছেন, কিন্তু এ দাসকে কি পথ্য কিছু দেওয়া হবেনা?

পণ্ডিত ভক্তদের আনন্দের সীমা নাই। যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আপনি নিজে মুখ ফুটে খেতে চাইছেন, এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য। একটু সবুর করুন। এখনি আমরা সব কিছুর ব্যবস্থা করছি।"

কয়েকজন তখনি সোৎসাহে গৃহের দিকে ছুটিয়া গেলেন। থালা ভর্ত্তি উৎকৃষ্ট পেঁড়া, বরফি আনিয়া জড়ো করা হইল।

বাবাজী যৎসামান্য দুগ্ধ ও বিল্বপত্র খাইয়াই বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দেন, আর আজ পথ্য উপলক্ষ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যও ভোজন করিতে চাহিয়াছেন। পেঁড়া যাহা আনা হইয়াছে, পরিমাণে প্রচুর

সকলেই এবার কৌতূহলভরে কৃচ্ছ্রব্রতী সাধকের এই নূতন কাণ্ড দেখিতেছেন।

বাবাজী কিন্তু ঔষধ পথ্য কিছুই তখন গ্রহণ করিলেন না। দুইটি ভাণ্ডে সযত্নে এগুলি রাখিয়া কহিলেন, "বাবা-সকল, এই দাসের প্রতি আপনাদের দয়ার অন্ত নেই। ভাব্‌ছি, এগুলো আমি রাত্রি বেলাতেই ব্যবহার করবো। এখন কিছুক্ষণ এমনিভাবেই থাক্।" এ কথার পর তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন।

ভক্ত ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ কিছুটা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। বাবাজী তাঁহাদের সম্মুখে নিছক একটা অভিনয় করিতেছেন না তো? সত্য সত্যই এগুলি ভোজন করিবেন, না ফেলিয়া দিবেন, কে জানে? পরামর্শের পর ঠিক হইল, তাহার উপর লক্ষ্য রাখা হইবে।

তখন নিশীথ রাত। আশ্রমিকদের সবাই নিদ্রামগ্ন? এমন সময় পওহারী বাবা চুপিচুপি ঔষধ ও পথ্যের ভাণ্ড হাতে নিয়া গঙ্গাতটের দিকে আগাইয়া গেলেন। কয়েকজন পণ্ডিত ভক্ত তখনি অলক্ষিতে তাঁহার পিছু নিয়াছেন। সবিস্ময়ে তাঁহারা দেখিলেন, ভাণ্ড দুইটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া বাবাজী স্নান সমাপন করিলেন, তারপর নিজ পর্ণ কুটিরে গিয়া বসিলেন ধ্যানাসনে।

পরদিন ভোর বেলায়, ভক্তেরা তাঁহাকে খুব চাপিয়া ধরিলেন। অনুযোগের স্বরে কহিলেন, "বাবা, আমরা কাল রাতে স্বচক্ষে দেখেছি, আপনি ঔষধ পথ্য কিছুই খাননি। আমরা এত দৌড়ঝাঁপ ক'রে বৈদ্য আনালাম, ঔষধ পথ্য সংগ্রহ করলাম, আর আপনি অবলীলায় তা গঙ্গায় ফেলে দিলেন? যদি এটাই মনে ছিল, তবে এমন ক'রে শুধু শুধু গরীবদের পয়সা নষ্ট করালেন কেন? ঔষধ কিছুতেই খাবো না—একথা বললেই তো সব চুকে যেত?"

পওহারীবাবা সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "বাবা সকল, শুধু শুধু আপনারা দাসের প্রতি এত বিমুখ হচ্ছেন। এ দাস কিন্তু সত্যই কোন অপরাধ করেননি। রোগের জন্য ঔষধ পথ্য আপনারা যা দিয়েছিলেন

দাস তা রোগকে দিয়ে দিয়েছে। এই দেখুন, দাসের এই দেহে রোগের চিহ্নমাত্র নেই।”

আশ্চর্য্য হইয়া সকলে দেখিলেন, তাইতো, সত্য সত্যই যে মহারাজের রোগ একেবারে নিরাময় হইয়া গিয়াছে! স্বরভঙ্গ সারিয়া গিয়াছে, জ্বরের উত্তাপ একটুও নাই। সারা গায়ে রক্তবর্ণের যে স্ফীতি, ফোস্কা ছিল, তাহাও মিলাইয়া গিয়াছে।

এই অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত ভক্তদের আর বাক্স্ফূর্ত্তি হইল না।

আশ্রমে যে কত রকমের অতিথি অভ্যাগত আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সেবার এক উন্মাদ পরিব্রাজক এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাবাজী আজকাল প্রায়ই মৌনী। আশ্রমের এক কোণে, নিজের কুটিরে বসিয়া একমনে ধ্যানজপে নিবিষ্ট থাকেন। আবার কখনো কখনো দেখা যায়, আগন্তুক ভক্তদের উপর কৃপা হইয়াছে, দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সস্নেহে কত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। সেদিন কয়েকজন নবাগত ভক্তের সম্মুখে বসিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রসঙ্গে রত আছেন, এমন সময় ঐ উন্মাদ সাধুটি কি জানি কেন, তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসে। শুরু করে জঘন্য গালাগালি ও চীৎকার। উত্তেজিত অবস্থায় একটা কাঠের গুঁড়ি হাতে নিয়া পওহারী বাবাকে সে মারিতে যাইবে, এমন সময়ে ভক্তেরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে। টানিতে টানিতে নিয়া যায় আশ্রমের এক প্রান্তে।

বাবার গায়ে হাত দিতে যায়! এতবড় দুঃসাহস! হোক্ না পাগল, আজ আচ্ছা শিক্ষা দিয়া তাহাকে ছাড়া হইবে।

সকলে একেবারে মারমুখী। প্রচুর উত্তম মধ্যম দিয়া উন্মাদকে আশ্রম হইতে বাহির করার জন্য তাহারা উদ্যত।

মহাপুরুষের মুখে কিন্তু ফুটিয়া উঠে করুণার আভা। কহেন, “ওকে প্রহার ক'রে বা আশ্রমের বাইরে ঠেলে দিলে কি লাভ হবে, বল তো?

রোগতো ওর থেকেই গেল। আহা বেচারা! আচ্ছা ওকে একটিবার আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দাও তো।”

ধরাধরি করিয়া উন্মাদকে উপস্থিত করা হইল, স্থিরনেত্রে তাহার চোখের দিকে বাবাজী মহারাজ তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করা গেল পাগল সাধুটির অদ্ভুত রূপান্তর। পূর্ব্বেকার অর্থহীন দৃষ্টি আর নাই, হুঙ্কার ও প্রলাপোক্তিও কমিয়া আসিল। পরদিন হইতেই তাহার রোগের কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই।

পওহারীবাবার নিরভিমানতা ও বৈষ্ণবীয় দৈন্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। সে-বার আশ্রমে গুরুধাম অযোধ্যা হইতে এক ভেকধারী বৈষ্ণব সাধু আসিয়া উপস্থিত। গুরুর আখড়ার এক প্রবীণ সাধক ইনি। বাবাজী তাই বিশেষভাবে তাঁহাকে নানা সম্মান দেখাইতে লাগিলেন।

সাধুটি কিন্তু বড় আত্মম্ভরি। তাছাড়া, পওহারী বাবার দৈন্য ও বিনীত ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠে। সারা আশ্রমে তিনি মহা উপদ্রব শুরু করিয়া দেন।

প্রথমেই জানাইয়া দেন, রোজ তাঁহার আফিম সেবনের অভ্যাস। তবে আফিমের জন্য কোন চিন্তা নাই, ঝুলিতে এ বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার জন্য প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ ও মিষ্টান্নের যোগাড় রাখা চাই।

নিতান্ত বশংবদের মত পওহারীবাবা তখনই এ সম্পর্কে উপযুক্ত নির্দ্দেশাদি সবাইকে দিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে সাধুটি কহিলেন, “ভাখো বাবাজী, আমি স্থির ক'রে ফেলেছি, শিগ্‌গীরই চার ধাম দর্শন ক'রতে বেরুবো। তোমার এই আশ্রম থেকেই শুরু হবে আমার পরিব্রাজন। এজন্য যে টাকা লাগবে অবিলম্বে তুমি তার বন্দোবস্ত ক'রে দাও।”

বাবাজী করজোড়ে কহিলেন, “প্রভু, আপনার এ আদেশ দাসের

শিরোধার্য্য। চেষ্টা আমি যথাসাধ্যই ক'রবো, কিন্তু ফলাফল নির্ভর ক'রছে আপনার কৃপাদৃষ্টির উপর।"

প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু আশ্রমের নিজস্ব সঙ্গতি বলিতে তখন কিছুই নাই। তাড়াতাড়ি গ্রামাঞ্চলের কয়েকটি ভক্তের কাছে খবর পাঠানো হইল। নগদ টাকাকড়ি কিছুই সংগৃহীত হইল না। পাওয়া গেল শুধু একখান বস্ত্র।

ভেকধারী সাধুটির ক্রোধের সীমা রহিল না। নানাভাবে নিজের উষ্মা তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে আশ্রমের সবাই এই কপট বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিয়া নিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাকে পরোক্ষে গালিগালাজ ও টিটকারী দিতেও ছাড়িতেছে না।

নবাগত সাধুটি অতি চতুর। প্রকাশ্যে ঐ আশ্রমিকদের তিনি কিছু বলিলেন না, মনের রোষ মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে একদিন পওহারী বাবাকে নিভৃতে ডাকিয়া নিলেন। আশ্রমিক বা ভক্তেরা নিকটে কেহ নাই, এ তাঁহার পক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ। ভ্রুকুটি-কুটিল চোখে তাকাইয়া কহিলেন, "বাবাজী, প্রথমটায় তোমায় ভালো মানুষই ভেবেছিলাম। এখন দেখছি, তা তুমি মোটেই নও। দেশশুদ্ধ লোক তোমায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এই আশ্রম ও সদাব্রত এমন সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছো, অথচ বল্‌তে চাও যে, হাতে কোন টাকা নেই? দেখ্‌ছি, তুমি কপটী, ঘোর মিথ্যাবাদী। তোমার কাছে সঞ্চিত বহু টাকা যে রয়েছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

পওহারী বাবা সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "প্রভু, সত্যিই এ দাসের কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই। ভক্ত গৃহস্থেরা আপনা থেকে যা কিছু শস্য ঠাকুরকে এনে দেয়, তাই দিয়েই নির্ব্বাহ হয় আশ্রমের কাজ। থাকবার মধ্যে এখানে আছে শুধু ঠাকুরের একপ্রস্থ সোনার অলঙ্কার। এ দিয়ে যদি প্রয়োজন মিটে তো সবটা আপনি নিয়ে যান।"

"না বাবাজী, তা দিয়ে আমার কাজ নেই। চতুরতা রেখে এবার খুলে বল দেখি, তোমার নিজের হাতে কত টাকা জমেছে? আর তা থেকে কি আমায় দিতে পার?"

"প্রভু, এ দাস যে বড়ো কাঙাল, একেবারে কপর্দ্দকহীন।"

সাধু ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "তবে শুধু শুধু ঢং ক'রে এই আশ্রম সাজিয়ে বসে আছো কেন? ভণ্ড কোথাকার?"

"তাহলে এ দাস কি ক'রবে, আজ্ঞা করুন।"

"আশ্রম, সদাব্রত আর এত কিছু আড়ম্বর দিয়ে তোমার মত কাঙালের কি কাজ? দীন বৈষ্ণব হয়েই যদি থাক্‌তে চাও, তবে বৃথা বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? এখান থেকে সরে পড়ো তুমি। আজই এ আদেশ পালন ক'রবে।"

এ আদেশ তামিল করিতে বিন্দুমাত্র দেরী হয় নাই। নীরবে ইষ্টবিগ্রহের সম্মুখে তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া পওহারী বাবা রাজপথে নামিয়া আসিলেন। একটিবারের জন্যও প্রাণপ্রিয় আশ্রমের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না।

পরদিন ভোরবেলায় দেখা গেল, ভজন কুটিরের দ্বারে তালা বন্ধ। চাবির গোছা সামনেই ধূলায় পড়িয়া আছে, বাবাজীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

ভক্তেরা মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাইতো, বাবাজীর তো কোথাও যাইবার কথা নয়। কাহাকেও কিছু বলিয়াও যান নাই।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে সংবাদ রটিয়া যায়, পওহারী বাবা আশ্রম ত্যাগ করিয়া অনির্দ্দেশ্যভাবে রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। দলে দলে লোক ছুটিতে থাকে আশ্রমের দিকে, বহিরাঙ্গন লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়।

বাবাজী এ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের দুর্দ্দিনের ভরসা, ইহ-পরকালের পরমাশ্রয়। তাঁহার অদর্শনে সকলেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা বোধ করিতেছে। জনতার উপর নামিয়া আসিয়াছে করুণ বিষাদের

ছায়া সকলেরই মুখে এক কথা—'বাবাজী আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন ? তাঁর চরণে আমরা কোন্ অপরাধ ক'রেছি ?'

আশেপাশের গ্রামে ও বনে জঙ্গলে অনুসন্ধান করিয়া কোন ফলোদয় হইল না।

কয়েকটি ভক্তের হঠাৎ সন্দেহ জাগিল, অযোধ্যার সাধুটি তো এই কাণ্ডের সাথে জড়িত নাই ? লোকটি অতি দাম্ভিক ও অসৎ। তাহার বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হইয়া কি বাবাজী আশ্রম ছাড়িলেন ?

ভেকধারী সাধুটি আগে হইতেই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার গতিক সুবিধার নয় দেখিয়া সবার অলক্ষ্যে আশ্রমের পিছন দিক দিয়া সে সরিয়া পড়ে। দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও আর তাঁহাকে ধরা যায় নাই।

এ দিকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া পওহারী বাবা শ্রীক্ষেত্রের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রভু জগন্নাথের দর্শনান্তে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবেন।

কিন্তু গন্তব্য স্থলে যাওয়া আর তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। পথে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। অবশেষে মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুর গ্রামে আসিয়া বেশ কিছুদিন তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়।

রোগমুক্তির পর এক ভক্ত পওহারী বাবার জন্য নদীতীরে একটি সাধনকুটির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাবাজী পরমানন্দে এখানে সাধন ভজনে রত হইয়া পড়েন।

প্রায় এক বৎসর কাল এ ভাবে অতিবাহিত হয়। এই অঞ্চলে বাস করার ফলে বাবাজী বাংলাভাষায় পারদর্শী হন। এ সময়ে চৈতন্য-চরিতামৃত ও অন্যান্য বাংলা ভক্তিগ্রন্থ তাঁহার বড় প্রিয় হইয়া ওঠে।

বাবাজীর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা এতদিন তাঁহার জন্য ভারতের বিভিন্ন তীর্থে অনুসন্ধান চালাইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারা গেল, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন। এসংবাদে

ভক্তদের আনন্দের অবধি রহিল না, বহু সাধ্যসাধনার পর বাবাজীকে তাঁহারা গাজীপুরে ফিরাইয়া আনিলেন।

আশ্রমে ফিরিয়া আসার পর হইতে পওহারী বাবা আরও বেশী অন্তর্মুখীন হইয়া পড়েন। ভজন কুটির বা ভিতরকার আঙিনা ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা অবস্থান করেন না। শুধু বিশেষ বিশেষ পুণ্যদিনে দুয়ার খুলিয়া তিনি বাহির হন, শত শত ভক্ত এই দিনটির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। বাবাজীর দর্শনের জন্য আশ্রমের দ্বারদেশে ভীড় লাগিয়া যায়।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, তিনি আর লোকলোচনেব সম্মুখে মোটেই আসিতেছেন না। ধীবে ধীরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেছেন নিস্তরঙ্গ অধ্যাত্ম-জীবনের গভীরে।

এ সময়ে দীর্ঘদিন জনসাধারণ আর তাঁহার সাক্ষাৎ বা কোন সংবাদাদি পায় নাই। আশ্রমিক ভক্তদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া লোকে ভাবিতে থাকে—হয় বাবাজী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, অথবা তিনি আব এ আশ্রমে নাই।

রুদ্ধদ্বাবের অন্তরালে, মৃত্তিকা গোফার অভ্যন্তরে এ সময়ে বাবাজী একাদিক্রমে চার বৎসর অতিবাহিত করেন। তবে মাঝে মাঝে কৃপাপরবশ হইয়া ভিতর হইতেই অন্তরঙ্গ ভক্ত বা আগন্তুক সাধকদের সাথে কথাবার্ত্তা বলিতেন।

কয় বৎসর গুহাবাসের পর মহারাজ সেদিন দুয়ার খুলিয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়ান। সারা গাজীপুর অঞ্চলে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠে। দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া আশ্রম দুয়ারে জড়ো হয় সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধ নরনারী।

বাবাজী এ সময়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, দেশ দেশান্তর হইতে উচ্চকোটি সাধু মহাত্মাদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হোক এবং তাঁহার আশ্রমে অনুষ্ঠিত হোক সমারোহপূর্ণ ভাণ্ডারা।

ভক্তেরা সবাই মহা উৎসাহী। মাস ছয়েকের মধ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। রাজা ও জমিদার, কৃষাণ ও শ্রমজীবী সকলেই হাত লাগায় এই বিরাট কাজে। ভাণ্ডারার সঙ্গে শুরু হয় যজ্ঞ ও দানব্রত। দূর দূরান্ত হইতে সহস্র সহস্র সাধু সন্ত ও পুণ্যকামী দর্শক এখানে সমবেত হন। কুর্থা গ্রামে দেখা যায় এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পওহারীবাবা উত্তর ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর সাধকদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেন।

গাজীপুর অঞ্চলে সেবার চোরের খুব উপদ্রব। একদিন গভীর রাত্রে পওহারীবাবার আশ্রমেও একদল চোর প্রবেশ করে। দেওয়ালে সিঁদ কাটিয়া সবেমাত্র তাহারা ঠাকুর ঘরে পা দিয়াছে, থালাবাসন ঝুলিতে পুরিতেছে, এমন সময় ভজন-গুহা ছাড়িয়া বাবাজী সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া তো দুষ্টদের চক্ষুস্থির। দূর হইতে এই সর্ব্বজনমান্য মহাপুরুষকে ভয় ভক্তি তাহারাও যথেষ্ট করে। ভীত, লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহারা বাসনপত্রগুলি নামাইয়া রাখিল। তারপর হুড়মুড় করিয়া ছুটিল দরজার দিকে।

বাবাজী কিন্তু তস্করদের পলায়নের সুযোগ না দিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। যুক্তকরে, মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা-সকল কৃপা ক'রে যদি এ কুটিরে এসেই পড়েছেন, এ দাস কিছুতেই আপনাদের আজ নিরাশ হয়ে ফিরতে দেবে না। যা কিছু তৈজসপত্র আছে, আপনারা ইচ্ছেমত নিয়ে যান। নইলে বুঝবো, এ দাসের কোন গুরুতর অপরাধ আছে, তাই সে আপনাদের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারলোনা।"

চোরেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছে। বাবাজীর নির্দ্দেশ অমান্য করার সাহস তাহাদের নাই। আবার এই দেবপ্রতিম পুরুষের সম্মুখে, তাঁহার আশ্রমের দ্রব্যাদিই বা কিরূপে সরাইবে?

পওহারীবাবাও কিছুতেই আজ তাহাদের ছাড়িবেন না, বারবার সকাতরে কত অনুনয় জানাইতেছেন।

চোরের দল আরো ভয় পাইয়া গেল। ভাবিল, তাইতো, শেষটায় বাবাজীর কণ্ঠস্বরে আশ্রমের লোকজন যদি জাগিয়া উঠে, তবে আর কাহারো রক্ষা থাকিবেনা।

অগত্যা তাড়াতাড়ি তাহারা ঘরের দ্রব্যাদি সব কুড়াইয়া নেয় এবং বাবাজীও সানন্দে দরজা ছাড়িয়া দেন।

আশ্রমের বাহিরে আসিয়াই তস্করেরা মাথার বোঝা নামাইয়া ফেলে। তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে অরণ্যের দিকে। এমন বিপদে জীবনে আর কখনো তাহারা পড়ে নাই।

এদিকে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাবাজীও ছুটিয়াছেন তাহাদের পিছে। কাতরকণ্ঠে কেবলি বলিতেছেন, "বাবা-সকল, এ দাসকে এমন অপরাধী ক'রে যাবেন না, আপনারা একবারটি ফিরে আসুন। দয়া ক'রে এসব সঙ্গে নিয়ে যান।"

কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? তস্করেরা ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

আর একদিনের কথা। কুটিরের এক প্রান্তে বসিয়া পওহারীবাবা ভজন করিতেছেন। হঠাৎ কোথা হইতে একটি ইঁদুর লাফাইয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর বসে। এটিকে কোলে নামাইয়া আনিয়া সযতনে নিজের লম্বা আলখাল্লা দিয়া তিনি ঢাকিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফোঁস ফোঁস শব্দে আগাইয়া আসে এক ক্রুদ্ধ বিষধর সাপ। মুহূর্ত্ত মধ্যে ফণা উঁচাইয়া বাবাজী মহারাজকে উহা দংশন করিয়া বসে। সাপটি ঐ ইঁদুরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। বাবাজী সেটিকে বস্ত্রান্তরালে আশ্রয় দিয়াছেন তাই সে ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিয়া ফেলিয়াছে।

ছোবল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পওহারীবাবা অচেতন হইয়া কক্ষ-

মধ্যে ঢলিয়া পড়েন। মুমূর্ষু বাবাজীকে নিয়া আশ্রমে মহা সোরগোল পড়িয়া যায়।

ওঝার চিকিৎসা, হোম পূজা সব কিছুই করা গেল, কিন্তু কোন ফল হইল না। ভক্তেরা প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন বটে, কিন্তু বাবাজী যে প্রাণে বাঁচিবেন এ ভরসা তাহাদের কাহারো নাই।

দুইদিন জ্ঞানশূন্য অবস্থায় থাকার পর দেখা গেল এক অলৌকিক দৃশ্য! আপনা হইতেই ধীরে ধীরে তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, বিষক্রিয়ার কোন চিহ্নই তাঁহার দেহে নাই। পূর্ব্বেকার মতই তিনি স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষটি। মনে হয় যেন গভীর ঘুম হইতে এইমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছেন।

ভক্তেরা এসম্পর্কে প্রশ্ন করিলে বাবাজী সবিনয়ে কহিয়াছিলেন, "সাপ-বাবার সত্যিই কোন দোষ নেই, এ দাস ইঁদুর-বাবাকে আশ্রয় দিতে গিয়েছিলো, তাইতো তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া, ইনি তো আমার অশুভ কামনা নিয়ে আসেননি। এসেছিলেন পাহুন-বাবারূপে—এক প্রিয় কুটুম্বেরই মত এসেছিলেন দীর্ঘদিন পরে। এ দাস এ দুদিন তাঁর সেবা করেছে দেহের ভোগ দিয়ে। এবার তিনি স্বস্থানে চলে গিয়েছেন।"

ভক্তেরা অবাক বিস্ময়ে, নির্নিমেষে, এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পওহারীবাবা ছিলেন একাধারে সিদ্ধ যোগী ও প্রেমিক মহাপুরুষ। সাধারণভাবে তাঁহার দেহে কোন ব্যাধির প্রকোপ দেখা যাইত না। তবে কখনো কখনো কৃপাপরবশ হইয়া আশ্রিতদের রোগ তিনি নিজ দেহে আকর্ষণ করিয়া নিতেন এবং কিছুদিন তাহা নির্ব্বিকার চিত্তে ভোগ করিতেন।

এ সময়ে রোগের কথা উল্লেখ করিয়া বাবাজী কহিতেন, "এবার

এই দাসকে কিছুকালের জন্য গুহার ভেতরে ঢুকতে হবে—পাহুন-বাবার ডাক এসে গিয়েছে !”

দেহরোগকে প্রিয় কুটুম্ব জ্ঞানে সেবা করা ছিল তাঁহার অন্যতম ব্রত। এ সম্পর্কে তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, “গৃহস্থাশ্রমীরা কুটুম্বের সেবা যত্ন ক'রে ধন্য হয়। এই ব্যাধিও হচ্ছে তেমনি এক পাহুন বা কুটুম্ব বিশেষ। এ কুটুম্বের সেবা ক'রলে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হন।”

যোগশক্তি ও বৈষ্ণবীয় প্রেমৈশ্বর্য্য এই দুইয়েরই এক অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল পওহারীবাবার সাধনজীবনে। তাই দেখা যায়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সাধকরূপে তিনি পরিচিত থাকিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর সাধক ও দর্শনার্থী তাঁহার আশ্রমে ভীড় করিত। তৎকালীন সমাজ ও ধর্ম্মজীবনের বহু বিশিষ্ট নেতাই তাঁহার দর্শন ও উপদেশ লাভের জন্য গাজীপুরে উপস্থিত হইতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মজুমদার, পণ্ডিত আদিত্যরাম, শিবনাথশাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি দল ও মত নির্ব্বিশেষে সকল জিজ্ঞাসু, মুমুক্ষু ও অধ্যাত্মরসপিপাসু মানুষের হৃদয়েই পওহারীবাবা সিঞ্চন করিতেন তাঁহার কল্যাণবারি।

স্বামী বিবেকানন্দের সাধনজীবনের গোড়ার দিকে পওহারীবাবার প্রভাব কিছুটা পতিত হইয়াছিল। এই মহাত্মার নিকট তাঁহার ঋণের কথা স্বামীজী অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শীতকাল। এ সময়ে একদিন কাশী হইতে রওনা হইয়া বিবেকানন্দ গাজীপুরে পৌঁছিলেন। আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য, বহুখ্যাত পওহারীবাবার দর্শন।

উত্তর ভারতের সাধক সমাজে এই মহাত্মার তখন প্রচুর খ্যাতি। কিন্তু শুধু সাধুদর্শনের কৌতূহল নিয়াই স্বামীজী এখানে আসেন নাই, এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া অমৃতময় জীবন লাভ করা যায় কিনা, তাহাও তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর হইতেই স্বামীজীব হৃদয়ে জ্বলিতেছে দুঃসহ বিরহেব অনল। তাছাড়া, সাধন জীবনের স্থিতিও তখন অবধি অর্জ্জিত হয় নাই। চঞ্চল হইয়া উত্তর ভারতের মঠ মন্দির, তীর্থসমূহে বারবার এ সময়ে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। পওহারা-বাবাকে দর্শনেব সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীর অন্তরে জাগিয়া উঠিল দিব্য আনন্দের তরঙ্গ। মহাপুরুষের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তাঁহার চরিত্রের অনুপম মাধুরী ও সাধনৈশ্বর্য্য এই নবীন সাধকের প্রাণমন কাড়িয়া নিল।

গাজীপুরে দশ বার দিন অবস্থানের পরই এখানকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কাশীর প্রমদাদাস বাবুকে স্বামীজী লিখিতেছেন: বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটেনা।"

দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পওহারী বাবা আগে হইতেই জানিতেন। এবার তাঁহার প্রধান শিষ্যকে নিকটে পাইয়া তিনি পরম পুলকিত হইয়া উঠিলেন। শুদ্ধসত্ত্ব, তেজোদৃপ্ত, নবীন সাধক স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে বাবাজীর স্নেহ অধিকার করিতে দেরী হয় নাই। অল্পকাল মধ্যে উভয়ের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

পওহারী বাবার মৃত্তিকা-গুহার সম্মুখে গিয়া স্বামীজী প্রায়ই উপবেশন করিতেন। সাধনা সম্পর্কিত নানা সমস্যার সমাধান এই বহুদর্শী মহাপুরুষের নিকট হইতে তিনি জানিয়া নিতেন।

এক একদিন স্বামীজীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত প্রবল আলোড়ন। তাইতো, প্রভু রামকৃষ্ণের এতো কৃপা, এতো স্নেহ তিনি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কই, অধ্যাত্মজীবনের পরম সম্পদ তো আজ অবধি তাঁহার করায়ত্ত হইল না? কোথায় মোক্ষপথ? কে দিবে তাহার পথ-সন্ধান?

অধ্যাত্মজীবনের স্থিতি হওয়ার আগেই গুরুর পরমাশ্রয় স্বামীজী হারাইয়াছেন। এবার কোথায় কাহার কাছে দিগ্‌দর্শন মিলিবে, সেই চিন্তায়ই তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

আশার আলোক এক একবার অন্তরে ঝলকিয়া উঠে। উচ্চকিত হইয়া উঠেন—তবে কি অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া ঠাকুরই তাঁহাকে গাজীপুরের এই মহাত্মার পদপ্রান্তে আনিয়া ফেলিয়াছেন?

বড় দুর্নিবার আকর্ষণ পওহারী বাবার। ভক্তি, যোগসামর্থ্য আর জ্ঞানের অপরূপ সমন্বয় এই মহাপুরুষের সাধনায়। স্বামীজীর হৃদয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিল, পওহারী বাবার চরণতলে বসিয়াই শুরু করিবেন তিনি মোক্ষসাধনা। বিশেষ করিয়া বাবাজীর কাছ হইতে নিগূঢ় যোগ সাধন গ্রহণ করিয়া হইবেন কৃতার্থ।

প্রার্থনা নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাজী তাঁহার ভার নিতে সম্মত হইলেন। কিছুদিন পরে যোগদীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল।

স্বামীজীর অন্যতম চরিতকার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এ সময়কার এক চিত্র দিয়াছেন,—

"গভীর নিশীথে স্বামীজী পাওহারী বাবার গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ না পওহারী বাবা?' এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়-দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালবাসা, সস্নেহ ব্যবহার, পর্য্যায়ক্রমে উদিত হইয়া তাঁহার ব্যথিত চিত্ত আত্মধিক্কারে ভরিয়া উঠিল!

"সহসা তাঁহার অন্ধকারময় কক্ষ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বামীজী অশ্রুসজল নেত্র তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আদর্শ দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দাঁড়াইয়া! তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত নেত্রদ্বয়ে স্নেহসকরুণ-ব্যথিত ভর্ৎসনা। বিবেকানন্দের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, প্রহরকাল প্রস্তরমূর্ত্তির মত ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত দর্শন তিনি মস্তিষ্কের

দৌর্ব্বল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া আগামী রজনীতে পুনরায় পওহারীবাবার নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সেদিনেও সেই পূর্ব্বদৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তেমনিভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! এইরূপে সপ্তবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদিন মর্ম্ম-বেদনায় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'না আমি আর কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌর্ব্বল্যের অপরাধ ক্ষমা করো, প্রভো!"

শেষ পর্য্যন্ত এই যোগদীক্ষা গ্রহণ করা ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু পওহারীবাবার পুণ্যময় সঙ্গ ও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তরুণ সাধক বিবেকানন্দের জীবনে সেদিন এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। অশান্ত হৃদয়ে আনয়ন করে শান্তির প্রলেপ।

স্বামীজীর একনিষ্ঠা শিষ্যা, নিবেদিতা এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "ইনিই সেই সাধু যাঁহাকে স্বামীজী চিরকাল শ্রীরামকৃষ্ণের নীচেই আসন দিতেন। তথায় (গাজীপুরে) তিনি যে অমূল্যধন লাভ করিলেন, তাহা অপর সকলের সহিত একত্রে সম্ভোগ করার জন্য তিনি দুই মাস পরেই ফিরিয়া আসিলেন।"

সাধন ভজনের নিষ্ঠার উপরই বাবাজী সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। বলিতেন, "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি"—অর্থাৎ সিদ্ধি আর সিদ্ধির উপায়, এ দুই-ই সমান আদরের। শেষ বয়স অবধি তাঁহার নিজ জীবনে এই তত্ত্ব প্রতিফলিত হইতে দেখা গিয়াছে।

ভক্তি-সাধনা ও যোগসিদ্ধির উচ্চ চূড়ায় আরোহিত বাবাজীর দিনচর্য্যায়, ইষ্ট বিগ্রহের সেবা পূজায়, এক দিনের তরেও কোন ত্রুটি বা শৈথিল্য কেহ কখনো দেখে নাই। ইষ্টদেব রামচন্দ্রজীর পূজায় তাঁহার যে অপার নিষ্ঠা ছিল, তাম্রকুণ্ড মার্জ্জনের মত নগণ্য কাজেও সেই নিষ্ঠা ফুটিয়া উঠিত।

কুর্থার আশ্রমে দূরদূরান্ত হইতে উপনীত হয় অগণিত মুমুক্ষু সাধক ও পুণ্যকামী দর্শনার্থী। আর বাবাজী থাকেন সাধনগুহার অভ্যন্তরে, গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে উপবিষ্ট। সেখান হইতে মধুর কণ্ঠে সবাইকে উপদেশ বর্ষণ করেন। বলিতে থাকেন, "বাবা, তোমরা ষোল আনা বিশ্বাস ক'রো শ্রীভগবানকে। সব কিছুতে নির্ভর ক'রো তাঁর ওপর, স্থির শান্ত হয়ে বসে থাকো। মার্জ্জারী যেমন আপন স্নেহে তার শিশুকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি তিনিও নিয়ে যাবেন সবাইকে তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে।"

সর্ব্ব পাশ নাশ না হইলে সর্ব্বময় প্রভুর দর্শন কখনো মিলে না—এই পরম তত্ত্বটি বাবাজী বারবার ভক্তদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। ভাবগদগদ কণ্ঠে বলেন, "হৃদয়প্রভু ভগবান যে হচ্ছেন অকিঞ্চনের ধন। তাদের কাছেই তিনি ধরা দেন, তুচ্ছতম জাগতিক বস্তুটি অধিকার করার ইচ্ছাকেও যারা দিয়েছে বিসর্জ্জন। যারা নিজের আত্মাকে পর্য্যন্ত আমার বলে ভাবতে চায় না, চায় না এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের কোন কিছু—তারাই প্রভুর পরমাত্মীয়।"

আত্মত্যাগের উপমা দিতে গিয়া পওহারী বাবা ভরতের কথা টানিয়া আনিতেন। কহিতেন, "এ দাস লক্ষ্মণের চাইতে ভরতের প্রেমভক্তিকে আরো বড় বলে মনে করে। রামজী বনে যাচ্ছেন, লক্ষ্মণ বলে বস্‌লেন—দাদাকে ছাড়া তিনি প্রাণে বাঁচবেন না। তিনিও বনবাসী হলেন। ভরতকে রাম আদেশ দিলেন, 'তুমি আমার হয়ে রাজ্য পালন করতে থাকো।' ভরত তখনি তা করলেন শিরোধার্য্য। বল্লেন—'বেশ, মহারাজ, তাই হবে। আপনার বিচ্ছেদে যদি আমার প্রাণও যায়, তবুও আমি এই কর্ত্তব্য সাধনই করবো। আমার নিজের ইচ্ছেকে বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার ইচ্ছে অনুযায়ীই চালিয়ে যাবো এই রাজত্ব। সকলের কটূক্তি সয়েই তা করবো।' ভরতের এই ত্যাগই তো হচ্ছে আসল আত্মত্যাগ। তার সাধন ছিল উচ্চতম স্তরের—প্রভুর ইচ্ছানুসারে নিজের সব ইচ্ছা তিনি দিয়েছিলেন বিসর্জ্জন।"

পওহারী বাবাকে একবার প্রশ্ন করা হয়, "বাবাজী মহারাজ, আপনি ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ—যোগবিভূতিসম্পন্ন বিরাট সাধক। অথচ আপনি কেন রঘুনাথজীর পূজার খুঁটিনাটি নিয়ে, হোমকর্ম্ম ইত্যাদি নিয়ে, এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন? আপনি সর্ব্বকর্ম্মের অতীত—আপনার কেন নবীন সাধকদের মত আচরণ?"

বাবাজী শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, "সব সাধকই নিজের কল্যাণের জন্য কর্ম্ম করবে, এটা আপনারা ধরে নিচ্ছেন কেন? একজন কি অপর কারুর জন্য কর্ম্ম উদ্‌যাপন করতে পারে না?"

নিরভিমানতার মূলকে পওহারী বাবা এমন করিয়াই উৎপাটন করিয়াছিলেন যে, কাহাকেও সাক্ষাৎভাবে উপদেশ দিতে বা শিষ্যত্বে বরণ করিতে সহজে তিনি রাজী হইতেন না। আচার্য্যের পদ বা মর্য্যাদাকে সতর্কভাবে এড়াইয়া চলা ছিল তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস। তবে কখনো কখনো কথা বা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইত, আর আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িত সাধনসমুজ্জ্বল জীবনের রত্নরাজী।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার প্রশ্ন করেন, "বাবাজী, সাধনা ও সিদ্ধির এই বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে আপনি কেন জগতের কাছ থেকে এমন ক'রে লুকিয়ে থাকবেন? কৃপা ক'রে আপনি গুহা থেকে বেরিয়ে আসুন, মানব সমাজে ছড়িয়ে দিন আপনার অমূল্য অবদান।"

বাবাজীর আননে খেলিয়া যায় চকিত হাসির ঝলক। স্বামীজীকে তিনি এক হাস্যরসাত্মক গল্প শুনাইয়া দেন—

একবার একটি দুষ্ট লোক গর্হিত কাজ করিতে গিয়া ধরা পড়ে। গ্রামের সবাই মিলিয়া জোর করিয়া তাহার কাণ কাটিয়া দেয়। লোকটির তো মহা বিপদ! এই কাটা কাণ নিয়া কোন্ লজ্জায় সে লোকালয়ে চলাফেরা করিবে? অবশেষে সে স্থির করিল, জনসমাজে আর থাকা নয়, এবার বসবাস করিবে কোন নিভৃত স্থানে।

ব্যাঘ্র চর্ম্মের আসন বিছাইয়া লোকটি বনের ধারে বসিয়া থাকে।

আর কাহাকেও দেখিলে, চোখ বুজিয়া ধ্যান জপের ভান করে। বলা বাহুল্য, এই মৌনী, কাণকাটা সাধুর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হয় নাই। দূর দূরান্ত হইতে দর্শনার্থীরা এই নির্জ্জন বনে আসিয়া জড়ো হইতে থাকে।

কয়েক বৎসর পরে এক ভক্ত যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। মৌনী মহাত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া সে সাধন ভজন করিতে চায়, কোনমতেই এই উৎসাহীকে নিরস্ত করা গেল না।

কাণকাটা সাধু এবার তাহার মৌন ভঙ্গ করে। মৃদুস্বরে যুবকটিকে বলে, "বৎস, কাল ভোরবেলায় অভীষ্ট তোমার পূর্ণ হবে একখানা ধারালো ক্ষুর নিয়ে এখানে উপস্থিত হ'য়ো।"

নির্দ্দেশ মত যুবকটি পরদিন আসিয়া উপস্থিত। কাল বিলম্ব না করিয়া সাধু তাহাকে বনের এক নিভৃত কোণে নিয়া যায়। ধারালো এক ক্ষুর দিয়া চকিতে ছেদন করে তাহার নাসিকা। তারপর সান্ত্বনার সুরে কহিতে থাকে, "ওহে এই পন্থা অনুসরণ ক'রেই আমি এই আশ্রমে দীক্ষিত হয়েছি। আজ তোমায় যেমন ক'রে দীক্ষা দিলাম, তেমনি ক'রে তুমিও এবার হতে আর সবাইকে দীক্ষা দাও।"

যুবকটি ততক্ষণে লজ্জায় ক্ষোভে মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে। চূড়ান্ত বোকামী সে করিয়াছে। কিন্তু এখন উপায়? কাহারো কাছে এই নাসা কর্ত্তনের কথা খুলিয়া বলারও যো নাই।

কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকার পর সেও অপর সাধন-কামীদের এমনিভাবে দীক্ষা দিতে থাকে। অচিরে গড়িয়া উঠে এক দূর বিস্তারী নাককাটা সাধুসম্প্রদায়।—

গল্প শেষ হয়। বাবাজী হাসিয়া স্বামীজীকে কহেন, "বাবা, এ দাসকেও কি এমনিতর এক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হয়ে বসতে হবে?"

স্বামীজী অনুযোগ দিয়া বলেন, "বাবাজী মহারাজ, ভগবৎ কৃপায় আপনি এমন বিরাট ঐশী শক্তির, ঐশী প্রেমের অধিকারী। তবে কেন প্রকাশ্যে জীবের কল্যাণে আপনি অবতীর্ণ হবেন না?"

শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে পওহারীবাবা উত্তর দেন, "বাবা কি তবে একথাটা ভাবতে পাবেন না যে, শরীর-নিরপেক্ষ হয়েও একটা মন তার চারদিককার অগণিত মানব-মনকে প্রভাবিত করতে পারে? দেখাতে পারে সত্যকার কল্যাণের পথ?"

১৩০৫ সনের জ্যৈষ্ঠমাস। রাত্রি সবে শেষ হইয়াছে। প্রত্যূষের আকাশ গাত্রে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে উদয়াচলের রক্তিম আভা। ভক্ত ও সেবকেরা প্রাতঃস্নানের জন্য তোড়জোড় করিতেছেন। হঠাৎ দেখা গেল, আশ্রমের ভিতরকার যে প্রকোষ্ঠ প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া বাবাজী নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হইতেছে।

সকলে মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অসতর্কতার ফলে ঘরে আগুন লাগে নাই তো!

দুই একটি ভক্ত রাত্রি থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা কহিলেন, যে ঘর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে তাহার পাশেই বাবাজীর ঠাকুর ঘর। সেখানকার চন্দন-ঘষা এবং পূজার আয়োজনের শব্দ তাঁহাদের কাণে আসিয়াছে। মনে হইতেছে, বাবাজী মহারাজ আজ বিশেষ কোন সঙ্কল্পিত পূজার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। আর সে কাজ শুরু হইয়াছে রাত্রি হইতে। তবে তিনি, যে নিরাপদে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেখিতে দেখিতে ধূমরাশি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আশ্রমিকেরা আঙিনায় জড়ো হইয়াছেন। গ্রাম হইতে বহু ভক্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। সবারই চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া। বাবাজীর হোমের ধোঁয়া এ তো নয়। নিশ্চয়ই ভিতরে অগ্নিকাণ্ড শুরু হইয়াছে।

পওহারীবাবার আদেশ ব্যতীত আশ্রমের অভ্যন্তরে কাহারো প্রবেশ করার যো নাই। কিন্তু বাবাজীর সেবক ও ভ্রাতুষ্পুত্র বদরী-প্রসাদ আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। পার্শ্বস্থ গৃহের

ছাদে উঠিয়া তিনি নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজানা আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। একি! সারা পূজার গৃহই যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এ সময়ে বাবাজী মহারাজ কোথায়? তাঁহাকে তো দেখা যাইতেছেনা! অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বিপন্ন হন নাই তো?

বদরীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মহারাজ আপনি কোথায়? নিরাপদে আছেন তো? কৃপা ক'রে আমাদের একবার ভেতরে ঢুকতে আজ্ঞা দিন। এ আগুন এখনি নিভিয়ে ফেল্‌ছি।"

কিন্তু বাবাজীর কোন সাড়াশব্দই নাই। বদরীপ্রসাদ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় বহির্ব্বাটির আলিসার সম্মুখে পায়চারী করিতেছেন। কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না।

এমন সময়ে ভীত চকিত নেত্রে দেখিলেন, পওহারীবাবা ধীর পদক্ষেপে অঙনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সদ্যস্নাত মহাপুরুষের দীর্ঘ কেশরাশি সারা পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত। যে আলখাল্লা দ্বারা দেহ সর্ব্ব সময়ে আবৃত থাকে আজ তাহা উন্মোচন করিয়া কাঁধে ফেলিয়াছেন। কোমরে জড়ানো রহিয়াছে কুশরজ্জুতে বাঁধা এক ফালি কৌপীন। অগ্নির আভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে বাবাজী মহারাজের মূর্ত্তি। সুঠাম, সমুন্নত দেহখানি ঘৃতে বিলেপিত হইয়া চক্‌চক্ করিতেছে। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। বড় রহস্যময়, বড় মহিমময় তাঁহার এ মূর্ত্তি।

কমণ্ডলু হাতে নিয়া বাবাজী ধীরপদে অগ্নির লেলিহান শিখার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশের দিকে কিছুক্ষণের জন্য করিলেন দৃষ্টিপাত। সম্মুখে আগাইতে যাইবেন এমন সময় সেবক বদরীপ্রসাদ দূর হইতে আকুলস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

একবারের জন্য তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাবাজী অবলীলায় প্রবেশ করিলেন সেই জ্বলন্ত কক্ষে।

সকলেই ব্যাকুলভাবে আগাইয়া আসিয়া দেখিলেন সে মর্ম্মান্তিক

দৃশ্য। কাহারো আর বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইল না। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে এই দৃশ্যের কথা শুনিয়া ভক্ত গগনচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন—

"পওহারী বাবা হোমকুণ্ডের সম্মুখে কম্বলের আসনে উত্তর মুখ হইয়া পদ্মাসনযোগে মগ্ন আছেন ও তাঁহার পবিত্র দেহ অগ্নিশখায় দগ্ধ হইতেছে। হস্তের অবলম্বন 'আশা', কাষ্ঠের যোগদণ্ড, নিকটে স্থাপিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ঘৃতের কলস ভাণ্ড, কর্পূর, ধূপধুনা এবং নানাবিধ হোমের দ্রব্য সকল সজ্জিত রহিয়াছে। ভক্ত ভৃগুনাথ এই দৃশ্য দেখিবামাত্র অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন আরও অন্যান্য লোক সকল সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে মহাযোগীর ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া গেল। পুরাকালের শরভঙ্গ ঋষি প্রভৃতির ন্যায় সাধনান্তে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়া স্বকৃত হোমাগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মহাযোগী মহাধামে চলিয়া গেলেন।"

মহাঋত্বিকের জীবনযজ্ঞ অনেকদিন আগেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের আগুনে সর্ব্বসংস্কার হইয়াছে ভস্মীভূত। এবার তাই নিজেই মরদেহটি নিজের রচিত হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। জীবনলীলার উপর টানিয়া দিলেন চিরবিরতির যবনিকা।

গাজীপুর অঞ্চলের সহস্র সহস্র মানুষ হারাইল তাঁহাদের এক পরমাশ্রয়কে। অগণিত ভক্ত ও সাধকের অন্তরে নামিয়া আসিল শোকের কৃষ্ণছায়া।

যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ

নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মচারী বেণীপ্রসাদ সে-বা রামেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মন্দির-চত্বরে পা দিয়াই হৃদয় তাঁহা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভারতের শৈব সাধকদের এক মহাতী এই রামেশ্বর। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। দেবাদিদেবের এ পুণ্যময় প্রতীক দর্শনের ইচ্ছা বেণীমাধবের বহুদিন যাবৎ রহিয়াছে সে ইচ্ছা এবার পূর্ণ হইল।

আরো মহা আনন্দের কথা—প্রভু রামেশ্বরের মন্দির ঘিরিয়া আ সমারোহের অন্ত নাই। বিশেষ পুণ্যযোগ উপলক্ষে এক বৃহৎ মেল এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। দূর দূরান্ত হইতে আসিয়াছে পুণ্যার্থ হাজার হাজার নরনারী। হাসি, আনন্দ, নাচ গানে চারিদিক ভরপুর মাঝে মাঝে গগন কাঁপাইয়া জনসংঘ হইতে উত্থিত হইতেছে রামেশ্ব মহাদেওজীর জয়ধ্বনি।

বেণীপ্রসাদের মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। ধূলা পায়ে তাড়াতাড়ি সোপান বাহিয়া উঠিয়া দেবদর্শন করিলেন। তারপর স্নান-তর্পণ শে মন্দিরের জগমোহনে গিয়া বসিলেন বিশ্রামের জন্য।

ক্ষুধার উদ্রেক খুবই হইয়াছে, গতকাল হইতে এক টুকরা ফল ব একমুষ্টি অন্ন জোটে নাই। অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছেন, তাই কাহারো কাছে খাদ্য চাহিবেন না। যাহা করেন বাবা রামেশ্বর—এই ভাবিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বসিলেন। দেহ বড় শ্রান্ত, নয়ন শীঘ্রই মুদিয়া আসিল।

"বেণীপ্রসাদ, বেটা, কাঁহে চুপচাপ ব্যয়ঠে হুয়ে হো? বহুৎ ভুখ্ লাগি হ্যায় না?"—শোনা গেল পাশের অলিন্দ হইতে গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ।

থতমত খাইয়া বেণীপ্রসাদ নয়ন মেলিলেন। তাই তো, এ বিদেশ

বিভুঁই-এ তাঁহার নাম ধরিয়া এমন করিয়া কে ডাকিল! ক্ষুধার্ত্ত কিনা, সে কথাই বা এমন স্নেহভরে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে?

এবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান এক বিরাটাকার উলঙ্গ সন্ন্যাসী। মানুষ নয়, এ যেন মৈনাক পর্ব্বত! বেণীপ্রসাদ বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া আছেন, মুখে একটি কথাও সরিতেছেনা।

সন্ন্যাসীর চেখে মুখে প্রসন্নতার ছাপ। কমণ্ডলুতে হাত দিয়া দুইটি সুপক্ক বেল বাহির করিয়া দিলেন। কহিলেন, "বেটা, ইহ্ ফল তো পহলে খা লো।"

ক্ষুধার তীব্রতা অস্বীকার করাব উপায় নাই। তাছাড়া, এই ভীমকায় সন্ন্যাসীর প্রদত্ত বস্তু প্রত্যাখ্যান করার সাহসই বা কই? বেণীপ্রসাদ অঞ্জলি পাতিয়া ফল দুটি গ্রহণ করিলেন। ভোজন শেষে শুরু হইল অন্তরঙ্গ আলাপ। সে আলাপের মর্ম্ম এইরূপঃ

"বেটা, তুমি আমায় চিনতে পারোনি, কিন্তু আমি তোমায় ঠিকই চিনেছি। আমি যে এই তীর্থে তোমার জন্যই এ ক'দিন অপেক্ষা ক'রছি। কাল তোমায় দীক্ষা দিয়ে তবে আমার ছুটি।"

"কিন্তু বাবা, আপনাকে যে আমি চিনতে পারছিনে। কৃপা ক'রে আপনার পরিচয় দিয়ে এ অধমের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।"

"বেণীপ্রসাদ, কনৌজে তোমার বাড়ী কিনা?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তোমার পিতা জীবেশ্বর তেওয়ারীর কাছ থেকে হিমালয়-তরাই'র এক মহাত্মা তোমায় নিয়ে গিয়েছিলেন—এতকাল তিনিই ছিলেন তোমার শিক্ষাগুরু। তাই নয়?"

"মহারাজ অন্তর্য্যামী! যা বলছেন তা ঠিক।"

"বিঠৌরে দেহত্যাগ করার সময় সেই মহাত্মা কি বলে যান নি, —তুমি রামেশ্বর তীর্থে পাবে তোমার দীক্ষাগুরুর সন্ধান, লাভ করবে ঈপ্সিত দীক্ষা?"

বেণীপ্রসাদের সব মনে পড়িল। সন্ন্যাসীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

রামেশ্বরেই তো তাঁহার দীক্ষালাভের কথা! এ যে তিনি এতদি
ভুলিয়াই ছিলেন। কিন্তু কে এই ভীমভৈরবকান্তি সন্ন্যাসী? এত কথ
ইনি কি করিয়া জানিলেন? ইনি যে মহাশক্তিধর, তাহাতে সন্দে
নাই। কিন্তু, ইনিই কি তাঁহার চিহ্নিত গুরু? ইঁহারই কাছে নিতে
হইবে দীক্ষাবীজ? ইহাই কি ঈশ্বরের নির্দ্দেশ?

সন্ন্যাসী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মধুর হাসিতেছিলেন
এবার কহিলেন, "বাচ্চা, তোমার শিক্ষাগুরু মহাত্মাজী আমায় সনির্ব্বন্ধ
অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছেন তোমায় আশ্রয় দেবার জন্য। কাল
প্রত্যুষে রয়েছে অতি শুভ লগ্ন। সমুদ্রে স্নান ক'রে তুমি তৈরী থেকো।
আমি তোমায় দীক্ষা দেবো।"

পরদিন একদল প্রবীণ সন্ন্যাসীর সমক্ষে বেণীপ্রসাদের দীক্ষা সম্প
হইয়া গেল। সুগৌর সুঠাম তনু, তেজঃদীপ্ত এই তরুণ ব্রহ্মচারীকে যে
একবার দেখে, সে-ই বোধ করে অপূর্ব্ব আকর্ষণ। অচিরেই তিনি
মেলাপ্রাঙ্গনে সুপরিচিত হয়ে উঠেন।

নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীর নাম হইল ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী।

পরদিন দীক্ষাদাতা সন্ন্যাসী বেণীপ্রসাদকে এক নিভৃত স্থানে নিয়
গেলেন। প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "বেটা, এবার থেকে কিন্তু শুরু হলে
তোমার নূতন জীবন। যে বীজ তোমার সাধনসত্তায় রোপিত হ'লো
কালে তা হয়ে উঠবে মহীরুহ। একান্ত নিষ্ঠায় এই বীজ জপ ক'রে
যাবে। যে নিগূঢ় সাধনপ্রণালী দেওয়া হোল তা মনপ্রাণ দিয়ে ক'রবে
অনুসরণ। আশীর্ব্বাদ ক'রছি, তুমি আপ্তকাম হও।"

রামেশ্বরের সেদিনকার এই ভীমকায় সন্ন্যাসী হইতেছেন
ভারতবিশ্রুত মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামী। উত্তরকালে কাশীধামের
সচল বিশ্বনাথ নামে যিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

রামেশ্বরের সেদিনকার মেলাক্ষেত্রে, বেণীপ্রসাদের কাছে স্বামীজী
নিজেই কৃপা করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। তরুণ সাধকের জীবনে
এই মহাসন্ন্যাসী আবির্ভূত হন এক চলমান ঐশী আশীর্ব্বাদরূপে।

নব দীক্ষিত এই বেণীপ্রসাদ উত্তরকালে পরিচিত হন যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী নামে। ঢাকার উপকণ্ঠে, স্বামীবাগে অধিষ্ঠিত হইয়া এই মহাত্মা অর্দ্ধ শতাব্দীরও উপর তাঁহার কৃপারশ্মি বিস্তারিত করেন, লীলাময় জীবনে প্রদর্শন করেন যোগবিভূতির অজস্র ইন্দ্রজাল। শত শত নরনারী তাঁহার কল্যাণ স্পর্শে উজ্জীবিত হইয়া উঠে, প্রাপ্ত হয় অধ্যাত্মলোকের দিগ্‌দর্শন।

কনৌজের জীবেশ্বর তেওয়ারী ছিলেন এক মহা ভাগ্যবান ব্যক্তি। শাস্ত্রবিদ্‌ ও সাধননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বহু রাজা মহারাজা তাঁহাকে গুরুর মত মান্য করিতেন। ইঁহাদের দান ও পৃষ্ঠপোষকতায় তেওয়ারীজীর সমৃদ্ধি দিনের পর দিন বাড়িয়া চলে। কয়েক লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তির তিনি অধিকারী হন।

ভগবৎ-সাধনা, সামাজিক মর্য্যাদা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি, কোন দিক দিয়াই জীবেশ্বর তেওয়ারীর জীবনে অভাব কিছু নাই। লক্ষ্মীমন্ত এই মানুষটির গৃহে পূজা অর্চ্চনা, দানধ্যান সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। কখনো কোন পুণ্যযোগ উপস্থিত হইলেই তেওয়ারীজীর উৎসাহের সীমা থাকেনা, পত্নী শিউ-পিয়ারীকে সঙ্গে নিয়া তীর্থধর্ম্ম করিতে বাহির হইয়া পড়েন।

সেবার তীর্থরাজ প্রয়াগে মাঘমেলার উৎসব চলিয়াছে। কল্পবাস ও স্নান তর্পণ উপলক্ষে তেওয়ারী দম্পতি সেখানে গিয়া উপস্থিত। হরপিয়ারী তখন আসন্নপ্রসবা। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, পুণ্যের লোভ তাঁহার বড় প্রবল। এ সুযোগ ছাড়িতে রাজী নন।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া স্থির করিলেন, ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁহারা একমাস কাটাইয়া আসিবেন।

জপ তপ, স্নান তর্পণে পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে। চারিদিকে সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীর ভীড়। প্রতি জমায়েতে চলিয়াছে ভাণ্ডারার উৎসব হুল্লোড়।

রোজকার পূজা পাঠ শেষ হইলেই জীবেশ্বর তেওয়ারী সাধুদের জমায়েত ও আখড়ায় মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান। সেদিন হঠাৎ ঝুঁসির তটে এক পূর্ব্বপরিচিত মহাত্মার সাথে তাঁহার দেখা। ইনি এক বিশিষ্ট যোগী। বহুপূর্ব্বে, কি জানি কেন জীবেশ্বর তেওয়ারীর উপর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাই এতদিনের ব্যবধানেও আজ অবধি তিনি তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই।

বিশ বৎসর আগেকার কথা। কনৌজের প্রাসাদোপম ভবনে জীবেশ্বর একদিন বসিয়া আছেন। বয়স্যদের সঙ্গে চলিতেছে নানা রঙ্গ রসিকতা। এমন সময় জটাজুটধারী, তেজঃপুঞ্জকলেবর এই যোগী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দর্শনমাত্রেই মনে হইল, ইনি এক উচ্চ স্তরের মহাত্মা।

জীবেশ্বর সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্রাম ও স্নান-তর্পণের পর পুরী মালপোয়া সহযোগে তাঁহাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করানো হইল।

যোগীবরের নিয়ম আছে, কোথাও তিনি রাত্রিবাস করেন না। সেইদিনই সন্ধ্যায় সবাইকে আশীষ জানাইলেন, তারপর প্রস্তুত হইলেন স্থান ত্যাগের জন্য।

বিদায়ক্ষণে তেওয়ারীজী যুক্তকরে কহিলেন, "বাবা, আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার মত মহাত্মার সেবার সুযোগ পেলাম। কিন্তু মনে আমার অভিলাষ জেগেছে, আপনাকে বড় রকমের কিছু ভেট দিই। শিউজির কৃপায় বিত্তবিষয়ের আমার অভাব নেই। আপনি এ থেকে কিছু গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন। আমার ইচ্ছে. আপনার সেবার জন্য একটা আশ্রম তৈরী ক'রে দিই। এজন্য জমি-জমা, টাকাকড়ি যা প্রয়োজন, হুকুম করুন।"

যোগী হাসিয়া কহিলেন, "তেওয়ারী, বেটা, পরমাত্মা তোমার মঙ্গল করুন। ধনের প্রকৃত সদ্ব্যবহার তুমি ক'রতে চাও, এতো ভাল

কথা। কিন্তু বেটা, আশ্রম বানিয়ে একটা বড় সংসারের ঝামেলা আমি কেন পোহাতে যাবো, বলতো? তবে হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকে দান আমি কিছু নেব। কিন্তু যখন তা চাইবো, দেবে তো?"

"বাবা, শিউজীর নামে শপথ ক'রে বলছি, আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। কি আপনি চান, দয়া ক'রে বলুন।"

"এখন নয় বেটা, সময় এলে আমার ভিক্ষের কথা আমি জানাবো। পরে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হবে। তখন জানাবো আমার ইচ্ছা। আর সে ইচ্ছা পূরণ করার মত শক্তিও পরমাত্মা তোমায় দেবেন।"

অতঃপর বনপথের ঘনায়মান অন্ধকারে যোগী ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। .

ইতিমধ্যে দীর্ঘ দিন কাটিয়া গিয়াছে। তেওয়ারীজীর ভাগ্যে মহাত্মার দর্শন লাভ আর হয় নাই। এতদিন পরে আজ হঠাৎ ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া পণ্ডিতের আনন্দের সীমা রহিল না। সোৎসাহে তাঁহাকে নিজের আবাসে নিয়া আসিলেন। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া, সস্ত্রীক ভক্তিভরে করিলেন অভ্যর্থনা।

যোগীবরের চোখমুখে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্নতার দীপ্তি। আশীর্বাদ জ্ঞাপনের পর কহিলেন, "বেটা, দেখতে পচ্ছি, তোমরা মঙ্গলমত আছো, বেশ আনন্দেও রয়েছো।"

যোগী একবার হরপিয়ারীর দিকে তাকাইলেন। তারপর স্মিত-হাস্যে কহিলেন "জীবেশ্বর, তোমায় একটা সুখবর আমি আজ দেবো। আমার মাঈজী পূর্ণগর্ভা। এই তীর্থরাজ প্রয়াগেই পরমাত্মার কৃপায় তিনি এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করবেন। এ পুত্র হবে অসামান্য যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ। আগামী পরশু মৌনী অমাবস্যার স্নান। ঐ দিনই মাঈজীর কোল জুড়ে আসবে সেই শিশু।"

স্বামী স্ত্রী উভয়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন মহাত্মার চরণতলে।

অতঃপর মহাত্মা যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া পণ্ডিত জীবেশ্বর ও
হরপিয়ারী চমকিয়া উঠিলেন।

প্রশান্ত স্বরে তিনি কহিলেন, "বেটা, তোমার বোধহয় মনে আছে
বহু বৎসর আগে কনৌজে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তুমি
আমায় ধনরত্ন ভেট দিতে চেয়েছিলে। একটা আশ্রম বানিয়ে দিতে
উৎসাহ দেখিয়েছিলে।"

তেওয়ারী যুক্তকরে কহিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমি সে সব কথা
আজো ভুলিনি।"

"আমি তখন বলেছিলাম, তোমার এ ভেট আমি পরে নেব।
এবার সময় হয়েছে, বেটা। তোমার নবজাত পুত্রকে আমি ভেটরূপে
গ্রহণ করতে চাই। এ জন্যই প্রয়াগতীর্থে আমার আগমন। আশা
করি তোমার মত ধর্ম্মনিষ্ঠ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তার কথার খেলাপ করবে
না। এই পুত্র তুমি আমার কাছে উৎসর্গ করবে। একে আমি গড়ে
তুলবো আমার যোগসাধনার উত্তরাধিকারীরূপে।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত জীবেশ্বর ও হরপিয়ারীর মন
বার বার দুলিতে লাগিল আশঙ্কায় ও নিরানন্দে।

উভয়ে শিবজীর আরাধনা করিয়াছেন, শিবকল্প পুত্র কামনা
করিয়াছেন। ভগবৎ কৃপায় এবার যদিই বা সে আশা পূর্ণ হইতে
যাইতেছে, ভাগ্য তাহাতে বাদ সাধিতে চায়। এমন সন্তান লাভ
করিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না? এ দুঃখ যে কোথাও
রাখার ঠাঁই নাই।

সন্ন্যাসীর কথা বারবার তাঁহাদের মনে আলোড়ন তুলিতে থাকে।
কোন সান্ত্বনাই খুঁজিয়া পান না।

শুভ লগ্নে হরপিয়ারী দেবী মৌনী অমাবস্যার দিন এক অনিন্দ্য-
সুন্দর শিশুপুত্র প্রসব করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা কয়েকটি
শিষ্যসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন।

নবজাতককে কাছে আনা হইলে মহাত্মা জীবেশ্বরকে কহিলেন, "বেটা, গীতার সেই পুণ্যশ্লোকটি স্মরণ কর—শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টাভিজায়তে। এ শিশু পূর্ব্বজীবনে ছিল এক বিশিষ্ট যোগী। তোমার ঘরে সে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু ভোগৈশ্বর্য্যের মোহে কোন দিনই জড়িয়ে পড়বে না। গৃহস্থাশ্রমে এ শিশুকে রাখতে যেয়োনা, তাতে এর কল্যাণ হবেনা। আর শোন, বেটা। তোমার কাছ থেকে আজ আমি এই শিশুকেই দান হিসাবে নিতে এসেছি। আমার হাতে একে সঁপে দাও। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন কর।"

একদিকে সত্য পালন, ধর্ম্মরক্ষা। অপর দিকে পুত্রস্নেহ। পত্নীর অশ্রুসজল নয়নের দিকে তাকাইয়া তিনি আরো বিপদে পড়িলেন। কিন্তু উপায় কি? অগ্নিশিখাতুল্য এই সন্ন্যাসীকে প্রত্যাখ্যান করার মত সাহস তাঁহার নাই। তাছাড়া, সারা জীবন একনিষ্ঠভাবে যে ধর্ম্মকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন, আজ সে ধর্ম্ম হইতে কি করিয়া বিচ্যুত হইবেন?

নিজের মনকে তিনি দৃঢ় করিলেন, পত্নীর কোল হইতে শিশু পুত্রকে টানিয়া নিয়া, স্থাপন করিলেন সন্ন্যাসীর অঙ্কে।

এক দৃষ্টে শিশুর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মহাত্মা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সঙ্গী সন্ন্যাসী শিষ্যদের কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল পরমাত্মার মহিমাসূচক স্তবগাথা।

কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ এই শিশুকে পণ্ডিতের কাছে ফিরাইয়া দিলেন। কহিলেন, "আজ থেকে এর ওপর তোমাদের কোন অধিকারই রইল না। সন্ন্যাসজীবনের জন্য, সর্ব্বত্যাগী যোগী-জীবনের জন্য, চিরতরে এ শিশু চিহ্নিত হ'য়ে থাকলো। তবে আজ তোমাদের কাছেই একে আমি গচ্ছিত রেখে গেলাম। সময় হলেই বৈদিক সংস্কারাদি ক'রে, একে আমার কাছে নিয়ে যাবো।"

সন্ন্যাসীরা প্রস্থান করিলেন। জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী কুটির দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন চিত্রার্পিতের মত।

প্রয়াগ সঙ্গমের উৎসব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সব শেষ হইয়া গেল। এবার পণ্ডিত জীবেশ্বরকে কনৌজে ফিরিতে হইবে। তখনকার দিনে গোশকট ছাড়া অন্য কোন ভাল যানবাহন ছিলনা। মালপত্র ও লোকলস্কর নিয়া দুইটি গাড়ীতে তিনি রওনা হইলেন।

দুই ধারে গহন বন, মধ্য দিয়া চলিয়াছে অপরিসর দীর্ঘ পথ। গোশকট ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। শিশুটিকে কোলে নিয়া হরপিয়ারী দেবী নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন। তেওয়ারীজীর চোখে কিন্তু ঘুম নাই। এই বনপথে চোর ডাকাতের বড় ভয়, তাই তাঁহাকে সারা রাতই জাগিয়া থাকিতে হইবে।

মাঝে মাঝে তাঁহার কাণে আসিতেছে গাড়োয়ান, বরকন্দাজদের কথাবার্ত্তা। কেহ বলিতেছে, "রাত্রে কিন্তু এ পথে চলা বড় কঠিন, দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতেরা বনের ঝোপঝাড় হতে কখন যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক নেই।" কেহবা আস্ফালন করিতেছে, "রেখে দে তোর কথা! কত ডাকাত দেখেছি, লাঠির চোটে ঢিট্ ক'রেছি কত ব্যাটাকে। ভয় কি রে? রোহিল খণ্ডিয়াদের চাইতে কনৌজ বালা কি কমজোর?"

কিছুক্ষণ পথ চলার পরই হঠাৎ শোনা গেল হা-রে-রে-রে বিকট চীৎকার। নিমেষমধ্যে লাঠিবল্লমধারী ডাকাতেরা পণ্ডিতের গাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল।

রোহিলখণ্ডিয়াদের হটাইবে বলিয়া যে ভৃত্য ও বরকন্দাজেরা বাহ্বাস্ফোট করিতেছিল তাহারা বীরত্ব প্রকাশের আর সুযোগ পায় নাই। গাড়ীর মৃদু ঝাঁকুনির ফলে অনেকেই তন্দ্রায় ঢুলিতেছিল, অতর্কিত আক্রমণে আর লাঠিসোটা ধরার অবসর পায় নাই। ফলে মুহূর্ত্তে তাহারা ধরাশায়ী হইল।

ডাকাত সর্দ্দারকে ডাকিয়া জীবেশ্বর কহিলেন "ত্মাখো, মারামারি ধস্তাধস্তির কোন দরকার নেই। আমাদের কাছে যা কিছু টাকাকড়ি

আছে, এখুনি তা দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু বাবা, আছে অতি যৎসামান্যই। প্রয়াগতীর্থে একমাস বাস ক'রেছি সব যে প্রায় খরচ হয়ে গিয়েছে। যা আছে—এই যে, নিয়ে নাও।"

টাকাকড়ির বটুয়া সর্দ্দারের হাতে তুলিয়া দিয়া পণ্ডিত আবার কহিলেন, "বাবা, তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ। সঙ্গে রয়েছে একটি নবজাত শিশু। তার জন্য পথে হয়তো কিছু কেনাকাটার দরকার হতে পারে। সম্ভব হলে, এজন্য দু' চারটে টাকা আমায় তোমরা দিয়ে যেয়ো।"

"কই, দেখি তোমার বাচ্চাকে?" দস্যুসর্দ্দার আগাইয়া যায়। পর্দ্দা সরাইয়া মশালের আলো ফেলিতেই চোখে পড়ে এক সুগৌর সুঠাম শিশু। দেখিলে নয়ন ফিরানো যায় না।

ডাকাতসর্দ্দারের মন ভিজিয়া যায়। সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিতে থাকে "ওরে, এ বামুন বড় ধার্ম্মিক। আর চেয়ে ছাখ্ এই শিশুর দিকে। এ যেন এক দেবশিশু। নাঃ—বামুনের কোন লোকসান করা ঠিক হবে না। তোরা সবাই যা কিছু নিয়েছিস, সব ফিরিয়ে দে। দূরের পথ ওদের যেতে হবে, এ বাচ্চাটার যেন কোন রকম অসুবিধা না হয়।"

তেওয়ারীজী ও তাঁহার সঙ্গীরা এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যাওয়ার সময় এক ডাকাত সহাস্যে কহিয়া গেল, "ওরে, তোদের ভাগ্য দেখছি খুব ভাল। এই বাচ্চাটাকে দেখেই, কি জানি কেন, সর্দ্দার হঠাৎ বদলে গিয়েছে। নইলে কেউ প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারতিস্ নে। বাচ্চাটা সত্যিই পয়মন্ত।"

কয়েক দিন পর কনৌজে ফিরিয়া আসিয়া সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

জীবেশ্বর তেওয়ারীর প্রথম দুই পুত্রের নাম—জীবনারায়ণ ও নবজাত কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হইল বেণীপ্রসাদ।

শুভক্ষণে তাঁহার জন্ম। রাশি নক্ষত্রের বিচার করিয়া দেখা গেল, শক্তিধর পুরুষ বলিয়া সে খ্যাত হইবে। যদি গৃহে থাকে ও বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তবে সে বিপুল বিত্ত বিভবের অধিকারী হইবে। আর অধ্যাত্মজীবন গ্রহণ করিলে অর্জ্জন করিবে অপরিমেয় যোগসিদ্ধি। অসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া সে গণ্য হইবে।

পুত্রের বয়স পাঁচ বৎসর হইলে তেওয়ারীজী তাঁহার বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বৈদিক সংস্কার করাইয়া যথাসময়ে বেণীপ্রসাদের উপনয়নও দেওয়া হইল।

বেদ পুরাণে ব্যুৎপত্তি তেওয়ারী বংশের বড় বৈশিষ্ট্য। তাই গোড়া হইতেই ছেলেদের অধ্যয়নের উপর জীবেশ্বর জোর দেন। কিন্তু বালক বেণীপ্রসাদকে নিয়াই যত গোল। বইপত্র নিয়া এক দণ্ডও সে বসিতে চায় না। সারাদিন ঘুরিয়া বেড়ায় বন-জঙ্গলে আর নদীর তীরে তীরে।

এই সময়ে সেদিন তেওয়ারীজীর গৃহে আসিয়া দর্শন দেন পূর্ব্ব-পরিচিত সেই যোগীবর। সেই যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তারপর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মহাপুরুষের আর কোন সংবাদ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। দর্শনমাত্র স্বামী স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। পাদ্য অর্ঘ্য ভক্তিভরে দিলেন।

মনে মনে উভয়েই কিন্তু প্রমাদ গণিতেছেন। তীর্থরাজ প্রয়াগে বসিয়া যে প্রতিশ্রুতি যোগীবরকে দেওয়া হইয়াছিল, এবার তাহাই তিনি উত্থাপন করিয়া না বসেন।

বালককে স্নেহাশীষ জানাইয়া মহাত্মা জীবেশ্বরকে কহিলেন, "পুত্রের লেখাপড়া কিরূপ চল্‌ছে বল? তুমি নিজে পণ্ডিত, নিশ্চয়ই তার বিদ্যাভ্যাসের কোন ত্রুটি হতে দাওনি!"

"না মহারাজ, এ ছেলেকে নিয়ে আমি মহাসঙ্কটে পড়েছি, গ্রন্থের পাতা সে খুলতেই চায়না। সময় নষ্ট ক'রে হেলায় খেলায়।"

যোগীর আননে ফুটিয়া উঠে মৃদু মধুর হাস্য। কহেন, "তেওয়ারী,

পুত্রকে এ পরিবেশে রেখে তুমি মানুষ ক'রতে পারবে না। এখানকার মানুষ সে কিন্তু মোটেই নয়। আমি স্থির ক'রেছি, এবার বেণীপ্রসাদকে নিয়ে যাবো আমার আশ্রমে। প্রকৃতির কোলে বেড়িয়ে—অরণ্য, পাহাড়, উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে লাভ ক'রবে সে আত্মপরিচয়। পণ্ডিত, তোমার ভয় নেই; লৌকিক জীবনে যে শাস্ত্রবিদ্যার প্রয়োজন, আমার কাছে থেকে তাও সে অর্জ্জন ক'রতে পারবে।"

জীবেশ্বর ও হরপিয়ারী বজ্রাহতের মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন। একি মর্ম্মভেদী কথা তাঁহারা শুনিতেছেন!

যোগীর মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল। কহিলেন, "জীবেশ্বর তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, ধর্ম্মনিষ্ঠ আচার্য্য। যে প্রতিজ্ঞা আমার কাছে করেছিলে, তা কি আজ বিস্মৃত হলে, বৎস?"

তেওয়ারীজী মুহূর্ত্তে মন শক্ত করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্মপালন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। না—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোনমতেই তিনি করিবেন না। কহিলেন, "প্রভু, আপনার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক। এ পুত্র আজ থেকে আপনারই হোল।"

যোগীবর বেণীপ্রসাদকে নিকটে ডাকিলেন। স্নেহভরে কহিলেন, "বেটা, আমার সাথে যাবে তো তুমি? যেখানে আমরা যাচ্ছি, সে এক অপরূপ জায়গা। স্বেচ্ছামত তুমি বেড়াবে বনে জঙ্গলে, উধাও হবে প্রান্তরে পাহাড়ে, দেখবে রঙ-বেরঙের পাখী আর বনের হরিণ। পর্ণকুটিরে আমরা বাস করবো আর গাইবো ভগবানের নাম।"

বলিতে বলিতে প্রসন্ন মধুর হাসিতে মহাত্মার আনন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বালকের শিরে স্থাপন করিলেন তাঁহার কল্যাণ হস্ত তারপর ক্ষণপরে নয়ন দুটি মুদিলেন।

কি ইন্দ্রজাল আছে এই যোগীর স্পর্শে কে জানে? চঞ্চল বালক বেণীপ্রসাদ মুহূর্ত্তে নিশ্চল হইয়া যায়। অন্তরসত্তায় জাগিয়া উঠে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাত্ত্বিক সংস্কার। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় যোগীবরের দিকে নির্নিমেষে সে চাহিয়া থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে যোগীবরের চরণে লুটাইয়া পড়ে। নিবেদন করে, "প্রভু, আপনার আশ্রমেই আমি যাবো, কৃপা ক'রে আজই আমায় নিয়ে চলুন।"

অতঃপর বালক জননীর কাছে ছুটিয়া যায়, নানা প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিতে থাকে।

পিতার সত্যরক্ষার জন্য পুত্রও কৃতসঙ্কল্প। তাই যে সন্ন্যাসীর অনুসরণের জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে। হরপিয়ারীর আপত্তি করার আর কোন উপায় রহিলনা। সাশ্রুনয়নে বিধির নির্ব্বন্ধকে তিনি মাথা পাতিয়া নিলেন।

তেওয়ারী-ভবন অন্ধকার করিয়া, সবাইকে কাঁদাইয়া রাখিয়া বালক বেণীপ্রসাদ সেইদিনই যোগীবরের আশ্রমে চলিয়া গেল।

বড় রমণীয় এ আশ্রম। চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে সবুজের ঢেউ। কুটিরের সম্মুখ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে কলনাদিনী স্রোতাস্বিনী। ভোর হইতে না হইতেই রোজ পাখীর কাকলিতে ধ্বনিত হয় পরম প্রভুর বন্দনা গান। মুগ্ধ কুরঙ্গের মত বেণীপ্রসাদ এ গান কান পাতিয়া শোনে, এ স্বর্গীয় দৃশ্যপটের দিকে চাহিয়া থাকে। মন কোথায় উধাও হইয়া যায়।

এই বৃদ্ধ যোগীর স্নেহ ভালবাসা যেমনি মধুর, তেমনি অপার্থিব। চঞ্চল বেণীপ্রসাদকে এক দৃঢ় বন্ধনে তাহা বাঁধিয়া ফেলে।

প্রাতঃস্নানের পর যোগীবরের সেবা পরিচর্য্যা কিছুটা তাহাকে করিতে হয়। তারপরই শুরু হয় ছুটাছুটি। প্রাণবন্ত, চঞ্চল বালক কখনো বনের পশুপাখীর মধ্যে করে বিচরণ, কখনো বা পাহাড়ীদের সাথে তীরধনু নিয়া খেলায় মত্ত হয়।

প্রকৃতির কোলে, সহজ আনন্দময় পরিবেশে, বেণীপ্রসাদ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। ধীরে ধীরে শুরু হয় যোগীবরের অধীনে তাহার শিক্ষা ও সাধনা। শাস্ত্র পাঠের সাথে প্রাপ্ত হয় মহাত্মার সাধন উপদেশ।

যোগ-অভ্যাসের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাহার আত্মিক জীবনের উন্মেষ ঘটিতে থাকে।

আশ্রমের এই নিভৃত জীবনের বেণীপ্রসাদের প্রায় এগারো বৎসর অতিবাহিত হয়।

অসামান্য মেধা এই তরুণের। একবার যাহা কিছু সে কাণে শুনে, স্মৃতিপটে অক্ষয় হইয়া থাকে। উদ্ভাবনী বুদ্ধি ও বিচার বিশ্লেষণও তাহার বিস্ময়কর। অনায়াসে যে কোন শাস্ত্রবিদ্‌কে সে পরাস্ত করিতে পারে। পুত্রপ্রতিম ছাত্রের এই কৃতিত্ব দর্শনে যোগী মহা পুলকিত হইয়া উঠেন।

বেণীপ্রসাদ অনেকদিন দেশ ছাড়া। মহাত্মার স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া পরম আনন্দে তাহার দিন কাটিতেছে, কিন্তু এক একদিন সে বড় উন্মন হইয়া উঠে। মনে পড়ে পিতামাতা ও আত্মপরিজনের কথা, খেলার সাথীদের মধুর স্মৃতি মাঝে মাঝে মনের কোণে উঁকি দেয়। কনৌজের আবাল্য পরিচিত ঘরবাড়ী, পথঘাটের ছবি, মন উতল করিয়া তোলে।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া দেশের কথাই সে ভাবিতেছিল। মন ক্রমে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

এ ভাবান্তর যোগীবরের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। সস্নেহে বালককে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "বেটা, আমি ভাবছিলাম, দু'এক দিনের ভিতরই তোমায় নিয়ে কনৌজে যাবো। অবশ্য, তুমি যদি ইচ্ছে কর আজও আমরা রওনা হতে পারি। আমার দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে কোন অসুবিধা নেই, দণ্ড কমণ্ডলু হাতে উঠিয়ে নিলেই হ'ল। কি বল, আজই যাবে?"

বেণীপ্রসাদ সানন্দে ঘাড় নাড়িলেন। সেই দিনই উভয়ে পদব্রজে রওনা হইলেন কনৌজের পথে।

এতদিন পরে পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া জীবেশ্বর ও হরণিয়ারীর

আনন্দের অবধি নাই। বারবার মহাত্মার কাছে তাঁহারা কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন।

আরো আশ্বাসের কথা শোনা গেল মহাত্মার মুখে। প্রসন্নমধুর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "জীবেশ্বর, তোমার পুত্রের ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবার তাকে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। তুমি মনোমত পাত্রীর সন্ধান কর, তার বিবাহ দাও।"

ইহার চাইতে সুসংবাদ আর কি হইতে পারে? পণ্ডিত দম্পতি আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

একটু থামিয়া যোগী আবার কহিলেন, "আমার সেই পুরোনো কথাটা কিন্তু তোমরা দুজনেই স্মরণ রেখো। বেণীপ্রসাদের জীবন সংসারধর্ম্ম পালনের জন্য নয়। আরো বৃহত্তর দায়িত্ব নিয়ে ঐশীকর্ম্মের ভার নিয়ে সে এসেছে। কিছুদিন তাকে সংসার করতে হবে, তবেই ক্ষয় হবে প্রারব্ধের ভোগ। তারপর যথাসময়ে এসে আবার আমি তাকে নিয়ে যাবো। যোগ সাধনার পথে প্রাপ্ত হবে সে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার। জীবেশ্বর! তুমি শাস্ত্রবিদ্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সর্ব্বোপরি পিতা হিসাবে বেণীপ্রসাদের প্রকৃত কল্যাণকামী। এ ভরসাতেই তাকে আমি তোমার গৃহে রেখে যাচ্ছি।"

মহাত্মা সেই দিনই কনৌজ ত্যাগ করিলেন। যাওয়ার সময় বেণীপ্রসাদকে বলিয়া গেলেন, "বেটা, আমি কয়েক বৎসর হিমালয়ে পরিব্রাজন করবো। আমার সঙ্গে শিগ্‌গীর তোমার সাক্ষাৎ হবে না এবার কিছুদিন তুমি গৃহস্থাশ্রমে বাস কর, তারপর সময় হলে আমি তোমায় আহ্বান জানাবো।"

বেণীপ্রসাদের নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে। যুক্তকরে মহাত্মাকে মিনতি জানান, "প্রভু কৃপা ক'রে আমায় যদি আশ্রয় দিয়েছেনই, আবার তা থেকে বঞ্চিত ক'রছেন কেন? আবার আমায় আশ্রমে ফিরে যেতে দিন, নয়তো আপনার সঙ্গে নিয়ে নিন।"

নানাভাবে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া যোগী স্থানত্যাগ করিলেন।

বৎসর খানেকের মধ্যে বেণীপ্রসাদের বিবাহ হইয়া গেল। পত্নী গঙ্গাদেবীর বয়স তখন এগারো বৎসর। দেখিতে যেমন সুশ্রী তেমনি সুলক্ষণা। তদুপরি আপন সরল স্বভাবে অল্পকালের মধ্যে সকলেরই মন তিনি জয় করিয়া নিলেন।

বৎসরের পর বৎসর গড়াইয়া যায়। পিতা, মাতা, ভাই বন্ধুদের মধ্যে বেণীপ্রসাদের দিন ভালই কাটিতে থাকে। পত্নীর রূপগুণের তুলনা নাই, স্বামীর জীবনকে তিনি মধুময় করিয়া তুলিলেন।

কয়েক বৎসর পরের কথা। হঠাৎ সেদিন পণ্ডিত জীবেশ্বরের গৃহে শোনা গেল নারীকণ্ঠের আনন্দ কলরব ও হুলুধ্বনি। বেণীপ্রসাদের স্ত্রীর কোলে আবির্ভূত হইয়াছে এক অনিন্দ্যসুন্দর শিশু।

পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া জীবেশ্বর আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ধনী ও গণ্যমান্য লোক বলিয়া সে অঞ্চলে তিনি সুপরিচিত। তাই পদমর্য্যাদা অনুযায়ী উৎসব আড়ম্বর না করিলে চলিবে কেন? পূজা-অর্চ্চনা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পণ্ডিত ভবনে দেখা গেল নৃত্যগীত ও পান ভোজনের সমারোহ।

বেণীপ্রসাদ কেন যেন এই উৎসবে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতেছেন না। মন তাঁহার কেবলই উধাও হয় সেই শান্তিময় নিভৃত আশ্রমে। গহন অরণ্য আর তরঙ্গায়িত পাহাড়ের চূড়া হাতছানি দেয় বারবার। মনে পড়ে কল্যাণকামী যোগীবরের কথা। কৃপা করিয়া তিনি আশ্রয় দিয়াছেন, দিয়াছেন নিগূঢ় সাধন। সর্বোপরি এই মহামুক্ত পুরুষ তাঁহাকে বাঁধিয়াছেন মমত্ব ও প্রেমের বন্ধনে। সে স্বর্গীয় জীবনের স্মৃতি, সে প্রেম-মধুর আস্বাদ একটি দিনের তরেও বেণীপ্রসাদ ভুলিতে পারেন নাই।

আজ কেবলই তাঁহার মনে জাগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন—তিনি কি দিব্য জীবনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন? সংসারের মোহপাশ কি আষ্টেপৃষ্ঠে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিতেছে? নবজাত পুত্র কি তাঁহার এক নূতনতর বন্ধন?

অলীক, প্রপঞ্চময় সংসারজীবন নিয়া তিনি আনন্দে মাতিয়াছে গড়িতেছেন একের পর এক মায়া-সৌধ। কোথায় ইহার শেষ কোথায় পরমা মুক্তি? কে বলিয়া দিবে সন্ধান!

ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার অপার করুণা তিনি পাইয়াছিলেন। নিজ দোে তাহা হারাইয়া বসিয়াছেন। অযথা নিপতিত রহিয়াছেন এই বিষয়কূপে নাঃ। এ অসহনীয় অবস্থার অবসান তাঁহাকে ঘটাইতেই হইবে। ঘর সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবেন, খুঁজিবেন যোগীবরকে। নিবে তাঁহার একান্ত শরণ।

কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়? মহাত্মা যে নিজেই নির্দ্দেশ দিয় গিয়াছেন—প্রারব্ধ খণ্ডন না হওয়া অবধি বেণীপ্রসাদকে সংসারে ভোগ ভুগিতেই হইবে। তাঁহার ইঙ্গিত ছাড়া তো এক পা নড়িবা উপায় নাই। তবে উপায়?

মর্ম্মান্তিক দহনে বেণীপ্রসাদ পুড়িয়া মরিতেছেন, কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন, "হে প্রভু, এ সঙ্কটে আমায় উদ্ধার কর। দাও তোমার আলোক সঙ্কেত। বাঁচাও আমার প্রাণ।

সেই দিনই গভীর রাত্রে বেণীপ্রসাদ এক স্বপ্ন দেখিলেন, পাইলেন প্রত্যাদেশ। এ প্রত্যাশেদেরই মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনে দেখা দিল নূতন পট পরিবর্ত্তন।

জ্যোতির্ম্ময়, দিব্য মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! বেণীপ্রসাদ শিহরিয়া উঠিলেন। একি? ইনি যে তাঁহাবই সেই পরমারাধ্য যোগী, তাহার শিক্ষা-গুরু!

শিয়রে দাঁড়াইয়া মহাত্মা কহিতেছেন, "বেণীপ্রসাদ, বেটা, আর কতকাল এই তামস ঘুমে কাটাবে? ভোগবিলাসময় জীবনের আস্বাদ তো কতই পেলে, কিন্তু তাতে কি প্রকৃত শান্তি এসেছে? অমৃত কি লাভ ক'রতে পেরেছো? সাবধান! পুত্রমুখ দর্শন করার পর আরো কিন্তু জড়িয়ে পড়বে মায়ার বন্ধনে। ওঠো, জাগো। এবার বন্ধন কেটে

'বেরিয়ে এসো। অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করোনা, বেটা!"

কথা কয়টি বলার পরই স্বপ্নে দৃষ্ট এই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া যায়।

বারবার বেণীপ্রসাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে যোগীবরের প্রশান্ত মূর্ত্তি। কাণে বাজে সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। সেই তপোবন আর আশ্রমের স্মৃতি কেবলি তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে।

রাত্রির এই স্বপ্ন বেণীপ্রসাদের সংসার-জীবনকেও করিয়া তুলিয়াছে এক স্বপ্ন বিশেষ। দৃষ্টিসমক্ষে সব কিছুই হইয়া পড়িয়াছে অলীক, শূন্যগর্ভ। মুমুক্ষার আকুতি হৃদয়ে তুলিয়াছে হাহাকার।

প্রভাত হইতে না হইতেই বেণীপ্রসাদ পিতার কাছে গিয়া উপস্থিত হন। করজোড়ে বর্ণনা করেন স্বপ্ন বৃত্তান্ত। আরো কহেন, "বাবা, এই স্বপ্নাদেশকে আমি গ্রহণ ক'রেছি মহাত্মার নির্দ্দেশরূপে। নিজের দিক দিয়ে, মনে আমার কোন দ্বন্দ্ব নেই। আমি আজই গৃহত্যাগ করবো। মহাত্মার সন্ধানে যাবো তাঁর আশ্রমে। ঘরসংসার করা আর আমায় দিয়ে চলবে না। বিদায় নেবার আগে আপনার চরণধূলি আমায় একবার দিন।"

একি মর্ম্মান্তিক কথা পুত্রের! বিষাদখিন্ন পিতা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া আছেন। জননী শুনিয়াছেন সব কথা। আর্ত্তস্বরে কেবলি কাঁদিতেছেন, আর নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

পুত্রের সংকল্প কিন্তু টলিবার নয়। কহেন, "আমি ঘর ছেড়ে আজ যে আশ্রয়ে যাচ্ছি, তা তোমাদের অজানা নয়। যোগীবরের স্নেহ আর াদ থাকবে আমার রক্ষা কবচ হ'য়ে। ভগবানের কৃপা সতত ঝরবে মাথায়। তবে আমার জন্য তোমরা কেন কেঁদে ভাসাচ্ছো!"

জনক জননীর মুখে কোন কথা সরিতেছে না। নিশ্চল হইয়া তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন।

উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া বেণীপ্রসাদ কহিলেন, আজ আমার

মহা শুভদিন। ঈশ্বরভজনের পথে, মুক্তির পথে, আমি পা বাড়াবো। গোপনে, সবার অলক্ষ্যে আমি যেতে চাইনে। তোমাদের আশীর্ব্বাদ আর কল্যাণ কামনা নিয়েই যাবো। শান্ত মনে আমায় বিদায় দাও।”

অতঃপর আসিলেন পত্নীর কক্ষে। গঙ্গাদেবীর কাণে এই দুঃসংবাদ পৌঁছিতে দেরী হয় নাই। রুদ্ধ কান্নায় বুক তাঁহার ফাটিয়া যাইতেছে।

বেণীপ্রসাদ কহিলেন, “গঙ্গা, সবই তুমি শুনেছো। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, আদর্শ স্ত্রী। আমার এ ধর্ম্মজীবনের পথে তুমি আন্তরিক সাহায্য দেবে, চরম ত্যাগ স্বীকার ক'রবে, তা জানি। আমার এই ঘর সংসার, আর এই সন্তানের ভার আজ থেকে তোমার উপর ন্যস্ত রইলো। আমার কল্যাণের কথা ভেবে আমায় যেতে দাও, সঙ্কল্প সিদ্ধ করতে দাও।”

শোকাচ্ছন্না গঙ্গাদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, আত্মপরিজনের মায়া কাটাইয়া বেণীপ্রসাদ একবস্ত্রে আসিয়া দাঁড়ান রাজপথে। পিছনে পড়িয়া থাকে জনক জননীর দীর্ঘশ্বাস, আর পত্নীর হৃদয়ভেদী কান্না ও অশ্রুজল।

যোগীবরের সহিত সাক্ষাতের জন্য বেণীপ্রসাদ অধীর। দ্রুতপদে প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। হাঁটিয়া হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পথের ধারে একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিলেন। তারপর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলেন, হুঁস নাই।

হঠাৎ কাহার আহ্বানে বেণীপ্রসাদ জাগিয়া উঠিলেন। নয়ন মেলিতেই তাঁহার সারা অঙ্গে খেলিয়া গেল বিস্ময় আর আনন্দের ঢেউ। এ কি! যাঁহার উদ্দেশে আজ ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন, তিনিই যে সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত।

প্রণত শিষ্যকে যোগী আশীর্ব্বাদ জানাইলেন, কহিলেন “বেটা, তোমার ব্রহ্মানন্দ লাভ হোক্। ভালই হয়েছে, তুমি ঘর ছেড়ে এবার বেরিয়ে পড়েছো। কিছুদিন হ'লো আমার অন্তরেও জেগেছিলো

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা। দ্যাখো, পরমাত্মার কৃপায় তা কেমন পূরণ হয়ে গেলো।"

যোগীবরের কমণ্ডলুতে ছিল একটি কন্দমূল। খোসা ছাড়াইয়া বেণীপ্রসাদকে তখনি খাইতে দিলেন। তাঁহার ক্ষুধা মিটিবার পর উভয়ে বনপথ দিয়া আগাইয়া চলিলেন।

ঐ আশ্রমে বেণীপ্রসাদ বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। মহাত্মার কৃপায় নিগূঢ় যোগসাধনার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি তাহার আয়ত্ত হয়। প্রবীণ মহাপুরুষের কৃপায় উচ্চতর তত্ত্বসমূহ ধীরে ধীরে অন্তরসত্তায় উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

এখানে পরমানন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর মহাত্মার সঙ্গে শুরু করেন তিনি তীর্থপর্য্যটন।

নানা তীর্থ দর্শন করার পর উভয়ে সেদিন কানপুরের কাছেঁ বিঠৌরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পূতসলিলা গঙ্গা সমুখ দিয়া তর্ তর্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। স্থানটি বড় রমণীয়, পরিবেশও শান্তিপূর্ণ। আশেপাশে রহিয়াছে একদল সাধুর আস্তানা।

নদীতীরে, এক বিল্ববৃক্ষের তলে মহাত্মা তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু নামাইয়া রাখিলেন। বিশ্রামের পর বেণীপ্রসাদকে কহিলেন, "বেটা তোমায় একটা কথা বলছি, মন দিয়ে শোন। সংসারে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। বয়সও আমার ঢের হয়েছে। এ দেহের ভার আর বইবার ইচ্ছে নেই। এবার আমি এই মরদেহ ত্যাগ ক'রে যাবো। তোমায় আমার যা দেবার ছিল তার বীজ রোপণ ক'রে গেলাম। এখন থেকে নিজেই তুমি অভীষ্ট সাধনের পথে এগুতে পারবে। আমার অদর্শনে শুধুশুধু কাতর হয়োনা, বেটা। স্মরণ রাখবে আমি তোমার সাথেই সর্ব্বদা আছি।"

বেণীপ্রসাদ বড় মুষড়িয়া পড়িলেন। একি মর্ম্মভেদী কথা তাঁহার আশ্রয়দাতার মুখে! যাঁহার জন্য ঘর সংসার, আত্মপরিজন সব কিছু

ছাড়িয়া আসিয়াছেন তিনিই যদি অন্তর্হিত হন, তবে কোন্ অবলম্বন নিয়া আর বাঁচিয়া থাকিবেন ?

কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদেবের চরণে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন।

মহাত্মা প্রশান্ত স্বরে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "বেটা, তুমি অধীর হয়োনা। ভয় নেই। যিনি তোমার অধ্যাত্ম জীবনের ভার নিতে পারেন, ব্রহ্মসাক্ষাৎ করাতে পারেন, এমন মহাসমর্থ গুরু শীঘ্রই মিলবে। তিনিই দেবেন তোমায় সন্ন্যাস দীক্ষা। চৈতন্যময় মন্ত্র প্রাপ্ত হবে তাঁর কাছে। নিগূঢ় যোগসাধন দিয়ে এগিয়ে নেবেন তিনি পরম প্রাপ্তির দিকে। দাক্ষিণাত্যে, রামেশ্বর তীর্থে হবে তোমার সে সৌভাগ্যোদয়। তা ছাড়া, উত্তরখাণ্ডের এক মহাযোগীও হবেন তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান সহায়। শোক ত্যাগ কর, বেটা। আমার শেষকৃত্যের উদ্যোগ আয়োজন কর, এখানকার সাধু মহাপুরুষদের জানাও আমার আসন্ন বিদায়ের কথা।"

বেণীপ্রসাদ তখনি ছুটিয়া বাহির হন সাধুদের আস্তানার দিকে। এ সংবাদ শোনামাত্র একদল প্রবীণ তাপস সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। মহাত্মার শয্যা সকলে ঘিরিয়া দাঁড়ান।

সস্নেহে বেণীপ্রসাদকে কাছে ডাকিয়া যোগীবর তাহার শিরে হস্ত স্থাপন করেন, দেন আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। অতঃপর আসনে বসিয়া ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন মহাসমাধিতে। সমবেত সাধুদের বেদমন্ত্র ধ্বনির মধ্যে পরিত্যাগ করেন মরদেহ।

তরুণ সাধক বেণীপ্রসাদ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন, দুই নয়নে অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। কয়েকদিন পরে তিনি কিছুটা ধৈর্য্য ধারণ করেন এবং মহাত্মার নির্দ্দেশ স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়েন দক্ষিণ ভারতের পথে।

এই পর্য্যটনের কালেই রামেশ্বর তীর্থে তিনি দর্শন পান যোগীবর ত্রৈলিঙ্গস্বামীর। শক্তিধর এই মহাত্মার কাছে দীক্ষা নিবার ফলে জীবনে ঘটে মহা রূপান্তর। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম হয়—ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী।

ত্রৈলঙ্গস্বামী শিবকল্প মহাযোগী। স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র পুরুষ। কোন আশ্রম বা মণ্ডলী গঠন করা বা তথায় অবস্থান করার ইচ্ছা তাঁহার কোন কালেই নাই। মুক্ত বিহঙ্গের মত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান, দুই এক দিন কোথাও কাটানোর পরই আবার হন ভ্রাম্যমাণ। দুই তিন দিনের মধ্যেই তিনি রামেশ্বর ত্যাগ করেন। বিদায়ের কালে ত্রিপুরলিঙ্গকে কহেন, "বেটা, অব্ তুম পরিব্রাজন করতে রহো। চিন্তা মৎ করো। আখেরমে সব তুমকো মিল যায়গা।"

গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ দক্ষিণের অন্যান্য তীর্থগুলি দর্শনে বাহিরে হইয়া পড়েন।

প্রথমে যান কিষ্কিন্ধ্যা ও পম্পা সরোবরের দিকে। এখান হইতে পুণা, সাতারা, মুম্বাজী হইয়া নর্ম্মদা তীরে ত্র্যম্বকেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। সাধনার পক্ষে নর্ম্মদাব তীর বড় উপযোগী—এখানে তিনি কিছুদিন নিভৃতে অবস্থান করেন এবং ধ্যানজপে নিমগ্ন হইয়া পড়েন।

গুরুকৃপায় দিব্য অনুভূতি হৃদয়ে জাগিতেছে, লাভ করিতেছেন কত অলৌকিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু মন তাঁহার তৃপ্ত হইতেছে কই? প্রকৃত শান্তিতে, প্রকৃত আনন্দে জীবন তো ভরিয়া উঠিতেছে না? পরমাত্মার পূর্ণ কৃপা জীবনে মিলে নাই, এখনো যে তিনি হন নাই আপ্তকাম।

সেদিন পরিব্রাজনের পথে নর্ম্মদা তীরের এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলেন, বহু দরিদ্র নরনারী, বহু সাধু সন্ন্যাসী সেখানে ভীড় করিয়াছে। ব্যাপার কি? ত্রিপুরলিঙ্গ বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন।

প্রশ্নের উত্তরে এক সাধু কহিলেন, "বাবা, আমরা সবাই এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সমবেত হয়েছি। সময় প্রায় হয়ে এসেছে, ভোজ্যদ্রব্য সব এখনি এসে পড়বে। তুমি ইচ্ছে করলে এই পঙ্‌ক্তে বসে পড়তে পারো।"

সাধুর কথা শেষ হইতে না হইতে দেখা গেল এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বনান্তরাল হইতে একদল বাহক সারি বাঁধিয়া আগাইয়া আসিতেছে, কাঁধে তাঁহাদের ঝুড়িভর্ত্তি নানা জাতীয় খাবার।

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ জানিলেন, জ্যোতিস্বামী নামে যোগবিভূতিসম্পন্ন এক মহাত্মা এ খাদ্যসম্ভার রোজ এখানে প্রেরণ করেন। ভারে ভারে পুরি, হালুয়া, মালপোয়া প্রভৃতি আসে, আর সবাই তৃপ্তি সহকারে তাহা ভোজন করে।

পরম আশ্চর্য্যের কথা, এই যোগী মহাপুরুষ এসব যোগাড় করেন তাঁহার অসামান্য সিদ্ধাইর বলে। নর্ম্মদা তীরে একটি বটবৃক্ষ তলে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী চুপচাপ বসিয়া থাকেন। তাঁহার সম্বলের মধ্যে শুধু একটি বড় ভিক্ষার ঝুলি আর একটি চিম্‌টা। বৃক্ষশাখায় ঝুলিটি ঝোলানো থাকে। চিম্‌টা দিয়া উহা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীরা যে কোন সুস্বাদু খাদ্য খাইতে চায়, উহার অভ্যন্তরে আসিয়া তাহা জড়ো হয়। যোগী পরম আনন্দে এসব বিতরণ করেন।

ঋদ্ধি-সিদ্ধির এই লীলার মধ্য দিয়া মহাত্মার আকাঙ্ক্ষিত সাধুসেবা, দরিদ্র ভোজন রোজ অনুষ্ঠিত হয়। বালকেরা খেলা নিয়া যেমন উৎসাহ বোধ করে অলৌকিক শক্তিতে সঙ্ঘটিত এই ভাণ্ডারা নিয়াও ইঁহাকে তেমনি মাতিয়া উঠিতে দেখা যায়।

কৌতূহলী ত্রিপুরলিঙ্গ তখনি অদ্ভুতকর্ম্মা জ্যোতিস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন।

দিব্যকান্তি, সুগৌরতনু মহাপুরুষ প্রসন্ন মধুর হাসি ছড়াইয়া বৃক্ষতলে বসিয়াছেন। দেহটি অতি প্রাচীন, একেবারে লোলচর্ম্ম। ভুরু ও চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মস্তকের দীর্ঘ জটাজাল লুণ্ঠিত হইতেছে ভূতলে। ত্রিপুরলিঙ্গ শ্রদ্ধাভরে সাষ্টাঙ্গে চরণতলে পতিত হইলেন।

মহাত্মার প্রকৃত বয়স কত তাহা কিন্তু কেহই বলিতে পারে না। এখানকার অতিবৃদ্ধ সাধুরাও ছোটবেলা হইতে এইরকম চেহারাই

দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সুপ্রাচীন দেহের তটপ্রান্তে আসিয়া কালপ্রবাহ যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ বয়সেও দৃষ্টিশক্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পদব্রজে চলাফেরাতেও শ্রান্তির লক্ষণ কিছু প্রকাশ পায় না।

বসিয়া বসিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ যোগীবরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, যোগাভ্যাস দ্বারা এমনি ঋদ্ধি সিদ্ধিই তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। যত দীর্ঘ তপস্যাই লাগুক্, এই জন্মে এই দেহেই তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। নহিলে এই জীবন ধারণ বৃথা।

মনে আসিয়াছে আলোড়ন। নীরবে বসিয়া নিজের অধ্যাত্ম-সাধনার কথা, অভীষ্ট সিদ্ধির কথা তিনি ভাবিতেছেন আর আক্ষেপ করিতেছেন। এমন সময় জ্যোতিস্বামী মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাচ্চা, তুমি এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাও। জানতো, নর্ম্মদা মাঈর কোল হচ্ছে পরম শান্তির স্থান।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া দিলেন। বাহির হইয়া আসিল একগাদা গরম পুরী আর মালপোয়া। স্মিত হাস্যে ত্রিপুরলিঙ্গকে কহিলেন, "যাও' এবার নর্ম্মদাজীর তীরে বসে এগুলো ভোজন ক'রে এসো।"

এতগুলি টাটকা খাবার ঐ ঝোলা হইতে কি করিয়া বাহির হইল ত্রিপুরলিঙ্গ সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না।

আগাইয়া গিয়া তিনি জ্যোতিস্বামীর চরণ ঘেঁষিয়া বসিলেন। মনে প্রবল অনুসন্ধিৎসা। মহাত্মার ঝোলায় কি করিয়া বহু বিচিত্র খাদ্য আসে, কোথা হইতে আসে, এসব সিদ্ধাইর গোপন তত্ত্ব না জানিয়া আজ তিনি ছাড়িবেন না।

অন্তর্যামী জ্যোতিস্বামী তাঁহার মনোগত অভিলাষ বুঝিলেন। কহিলেন, "বাচ্চা, এসব বিভূতি বা অলৌকিক কার্য্য দেখে কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সৃষ্টির সূক্ষ্ম স্তরে যে মহাশক্তি নিহিত রয়েছে, তা থেকে মানুষ আহরণ ক'রতে পারে অপরিমেয় শক্তি। এই

তত্ত্বে বিশ্বাস জন্মাবার জন্যেই তো কোন কোন যোগী বিভূতিলীলা দেখিয়ে থাকেন। কারুর আবার বালসুলভ খেয়ালীপনাও থাকে। তবে, এতে সত্যকার বস্তু কিছু নেই।”

ত্রিপুরলিঙ্গ বুঝিলেন, এই প্রাচীন যোগী মহাশক্তিধর—সর্ব্বজ্ঞ। মনের যে কোন গূঢ় গোপন কথা ইনি মুহূর্ত্তে টানিয়া বাহির করিতে পারেন। তবে ইঁহার কাছেই সাহায্য চাওয়া যাক না কেন ?

যুক্তকরে কহিলেন, “বাবা, কৃপা ক'রে বলে দিন, কোন্ পথ ধরে আমি চলবো, কি ভাবে হবে অভীষ্ট সিদ্ধ। আপনার মত মহাপুরুষের কৃপাই যে আমার পরম পাথেয়।”

“শোন বেটা আসল কথা হচ্ছে,নিজে প্রস্তুত হও। যে সাধন পেয়েছো একাগ্রমনে তার অনুষ্ঠান কর। এগিয়ে চল একনিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষার পথে। সঙ্কল্প তোমার অচিরে পূর্ণ হবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনিই প্রকাশিত হয়ে উঠবে সত্যের আলো, তখন কিছুই আর থাকবে না অজ্ঞাত। নিজের ভেতরেই সারা বিশ্বের তত্ত্ব তুমি খুঁজে পাবে। লাভ করবে অমৃতময় জীবন।”

যোগীবরের সান্নিধ্যে বসিয়া, তাঁহার তত্ত্বোজ্জ্বলা বাণী শুনিয়া ত্রিপুরলিঙ্গের প্রাণমন ভরিয়া উঠিল। করজোড়ে কহিলেন, “বাবা, আমার বড় ইচ্ছে, আপনার পুণ্যসঙ্গ লাভ ক'রে ধন্য হই, কিছুদিন আপনার কৃপাদৃষ্টির সম্মুখে বসে সাধন ভজন করি।”

এ প্রার্থনায় জ্যোতিস্বামী রাজী হইলেন। সেবকদের ডাকিয়া বলিলেন, “নর্ম্মদাজীর তীরে, ঐ ছোট পাহাড়ের গায়ে যে সাধনগুহা আছে, তাতে এর থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও। দেশ দেশান্তরে বেটা অনেক ঘুরেছে। এবার কিছুদিন এই পবিত্র স্থানে চুপচাপ বসে তপস্যা করুক।”

পাহাড়ের নিভৃত গুহায় প্রবেশ করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ সানন্দে আসন পাতিয়া বসিলেন।

জ্যোতিস্বামীর কাছে যোগসাধনার উপদেশ নিয়া একনিষ্ঠভাবে

তাহাই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এ সময়ে যোগীবর প্রায়ই তাঁহার ধ্যানগুহায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন। যোগক্রিয়ায় নূতন নূতন পদ্ধতি দিতেন শিক্ষা।

একদিন গভীর রাত্রে নিভৃতে জ্যোতিস্বামী তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস ত্রিপুরলিঙ্গ, যোগ সাধনায় তোমার নিষ্ঠা, তোমার ধ্যানতন্ময়তা দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। আমি জানি, দুইটি শ্রেষ্ঠ মহাত্মা থেকে তুমি সাধনার নির্দ্দেশ ও বীজমন্ত্র পেয়েছো। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল ফলাতে হলে চাই সদ্‌গুরুপ্রদত্ত বীজ, আর চাই ঐকৈকনিষ্ঠ সাধনা। তা তোমার রয়েছে। তুমি ভাগ্যবান সাধক। কিন্তু বেটা, অধ্যাত্ম-জীবনকে তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে তুলতে হলে বিরজা হোম করা দরকার। আমি তোমায় তা সম্পন্ন করাবো। কাল প্রত্যূষে নর্ম্মদাজীর জলে স্নান তর্পণ শেষ ক'রে তুমি আমার আসনের কাছে যেয়ো। সব কিছু উপকরণ প্রস্তুত থাকবে।"

এ দিনকার অনুষ্ঠান ও দিব্য অনুভূতির কথা ত্রিপুরলিঙ্গ মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কাছে বর্ণনা করিতেন। ঢাকা স্বামীবাগ আশ্রমের মোহান্ত, নরেশানন্দ সরস্বতীজীর লেখায় আমরা তাহার এক চিত্র পাই :

"ত্রিপুরলিঙ্গের নিকট সমস্ত ব্যাপার যেন স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। প্রভাতে স্নান করিয়া স্বামীজীর আদেশ-মত তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী একজন ভক্তকে হোমদ্রব্যাদি আনিতে বলিলেন। যথা সময়ে হোম আরম্ভ হইল। সমস্ত দিবসব্যাপী হোম ক্রিয়া চলিল। রাত্রে তিনি ত্রিপুরলিঙ্গকে বিরজার অন্যান্য ক্রিয়ার উপদেশ দিলেন এবং বিরজা হোম আরম্ভ হইল। ভোর হইবার অল্প আগে তিনি পূর্ণাহুতি দিলেন। হোমকুণ্ড হইতে তখন এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতির্ম্ময় শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দেখিলে চক্ষু যেন ঝলসিয়া যায়।

"ত্রিপুরলিঙ্গের চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল—ঐ সময়ে কিভাবে তিনি ছিলেন তাঁহার কিছুই মনে নাই। কেবল মনে পড়ে, চক্ষু মুদিবার

পর নিজের ভিতরে এক উদ্দীপ্ত তেজ অনুভব করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে যেন এক অভূতপূর্ব্ব মহানন্দ রসে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেলে পরে যখন তাঁহার হুঁস হইল তখন ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি এক আনন্দ রাজ্যের অস্তিত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি মহাত্মাকে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্নেহভরে বলিলেন, "বৎস, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিলে সেই আত্মজ্যোতির তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তাহাতে স্থিতপ্রজ্ঞ হও, শোক দুঃখের অতীত হও।"[১]

স্বামীজীর স্নেহচ্ছায়ার আরো দুই তিন দিন অবস্থান করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তরাখণ্ড অভিমুখে রওনা হইলেন। পরে ওঁকারনাথ, উজ্জয়িনী ও মহাকালেশ্বর দর্শনাদি করিয়া পৌঁছিলেন কানপুরে। শিক্ষাগুরু যোগীর পবিত্র সমাধিস্থান কাছেই বিঠৌরে অবস্থিত। ত্রিপুরলিঙ্গ ব্যাকুল হইয়া সেখানে ছুটিয়া গেলেন। এই ভূমির প্রতিকণা তাঁহার কাছে পরম পবিত্র। বারবার এই ভূমিতে লুটাইয়া তিনি প্রণাম নিবেদন করিতে থাকেন।

পরম কারুণিক যোগীবরের কত পুণ্যস্মৃতি জাগিয়া উঠে তাঁহার স্মৃতিপটে। হৃদয়ে গুমরিয়া উঠে দুঃসহ ব্যথা। যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সাধনার পথে নামিয়াছেন, আজ কোথায় তিনি আত্মগোপন করিয়া রহিলেন? প্রাণপ্রিয় ছাত্র, যাহাকে তিনি অপত্যস্নেহে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সত্যই কি তাঁহার সহিত ঘটিয়াছে চির বিচ্ছেদ? ত্রিপুরলিঙ্গ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। সমাধি স্থানের পাশে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকেন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়।

হঠাৎ কাণে তাঁহার আসে উদাত্ত কণ্ঠস্বর—"বেণী! বেটা, কেন এমন হতাশ হ'য়ে পড়ছো? স্থির হও। ভয় কি তোমার? আমি যে সঙ্গে সঙ্গেই বরাবর রয়েছি।

১। স্বামীজীর কথা—স্বামী নরেশানন্দ সরস্বতী পৃঃ ৩৭-৩৮।

একি। এ যে পরমারাধ্য যোগীবরেরই কণ্ঠস্বর। সেই পরিচিত, স্নেহমাখা আহ্বান। এ যে কোনদিনই ভুলিবার নয়।

ত্রিপুরলিঙ্গ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন। হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অপার আনন্দ। সাধনায় আসে দৃঢ় প্রত্যয়। তবে তো নরদেহ ত্যাগের পরও যোগীবর তাঁহার সাথে রহিয়াছেন, সদা জাগ্রত দৃষ্টি দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন! এই করুণার যোগ্যপাত্র ত্রিপুর-লিঙ্গকে হইতেই হইবে।

বিঠৌর হইতে সেদিন তিনি উত্তরাপথের দিকে চলিয়াছেন, হঠাৎ এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুটির বাড়ী এবং ত্রিপুরলিঙ্গের শ্বশুর-বাড়ী একই গ্রামে। এতদিন পরে গৃহত্যাগী বেণীপ্রসাদকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। কহিলেন, "ভাই বেণী, একটিবার চলো, তোমার স্ত্রী পুত্রকে দেখা দিযে এসো। তারা এখন তোমার শ্বশুর বাড়ীতেই আছে। আজ তোমায় এত অনুরোধ করার আরো একটা বিশেষ কারণ আছে। আগামী কাল তোমার ছেলের উপনয়ন হবে। এ অঞ্চলে যখন এসেই পড়েছো, একটিবার তাদের দেখা দিয়ে যাও। তারপর যেথায় ইচ্ছে চলে যেয়ো। কেউ তো আর তোমায় আটকে রাখছে না।"

বন্ধুটি কিছুতেই ছাড়িবেন না, একরকম জোর করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত করিলেন।

পুত্রের উপনয়ন সংস্কারের উৎসব। কিন্তু গঙ্গাদেবীর অন্তরে সুখ নাই। বারবার সাশ্রুনয়নে ভাবিতেছেন স্বামীর কথা। সংসার ছাড়িয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, জীবনে আর যে কখনো সাক্ষাৎ হইবে তাহা মনে হয় না। আজ এমন শুভ দিন, এদিনে পুত্র তাঁহার পিতার আশীষ হইতে বঞ্চিত হইল। এ দুঃখ যে রাখিবার ঠাঁই নাই।

এমন সময় হঠাৎ প্রচারিত হয় ত্রিপুরলিঙ্গের আগমন বার্তা। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া যায়। আঁচলে চোখের জল

মুছিয়া গঙ্গাদেবী গৃহদেবতার কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে বারবার মাথা ঠেকান। কম্প্রকণ্ঠে বলিতে থাকেন, "হে অন্তর্য্যামী, হে দয়াল ঠাকুর, তুমি তবে দুঃখিনীর প্রার্থনা শুনেছো, প্রভু!"

সবাই কৌতূহলী হইয়া ত্রিপুরলিঙ্গকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। কিন্তু গঙ্গাদেবীকে সেখানে দেখা গেল না। স্বামী সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মপত্নী লইয়া এই পবিত্র আশ্রম হইতে কি করিয়া তাঁহাকে বিচ্যুত করিবেন? তাই মনের আবেগ মনে চাপিয়া গৃহকোণেই বসিয়া রহিলেন।

উপবীত অনুষ্ঠান ও উৎসব শেষ হওয়ার পর ত্রিপুরলিঙ্গ স্ত্রীকে নিকটে ডাকিলেন। শান্তস্বরে কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করার পর তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলেন। কহিলেন, "ছাখো, আমি গৃহস্থাশ্রম চিরতরে ছেড়ে গিয়েছি। বিরজা হোম ক'রে নিয়েছি সন্ন্যাস। তাই ব্যক্তিজীবনে আর আমি তোমাদের কেউ নই। তবে এটা সদাই মনে রেখো, তোমাদের কল্যাণ কামনা আমি ঠিকই করছি—কিন্তু তা করছি সর্ব্বজীবের কল্যাণের সাথে জড়িয়ে। আলাদা ক'রে নয়।

পত্নীর বক্ষে দুলিয়া উঠিয়াছে শোকের পাথার—দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে! আর ত্রিপুরলিঙ্গ তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে।

ক্ষণপরে আবার তিনি কহিলেন, "গঙ্গা, আমার সময় বেশী নেই, এখনি উঠতে হবে। তবে, যাবার আগে তোমায় বলে যাচ্ছি—এই সংসারের মায়ায় নিজেকে বেশী জড়িও না। যত জড়াবে ততই পাবে দুঃখের আঘাত। সদাই পরম প্রভুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখো, মায়ার বন্ধন ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আসবে। পাবে পরম মুক্তি।"

শোকবিধুরা গঙ্গাদেবী মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে থাকেন।

ত্রিপুরলিঙ্গ আর দেরী করেন নাই, তখনি স্থানত্যাগ করিলেন। আত্মীয় কুটুম্বদের অনুরোধ ও অশ্রুজল কোন কিছুতেই তাঁহাকে টলাইতে পারিল না।

বাল্যবন্ধুটি বহুদূর অবধি সঙ্গে আসিলেন, পথে আসিতে আসিতে কত বুঝাইলেন, "ভাই, যদি এতদিন পরে এলেই, কেন আরো কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে যাও না? তোমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম থেকে কেউ তোমায় চ্যুত করতে চায় না। শুধু আমাদের অনুরোধ, দিনকতক তোমার স্ত্রী ও পুত্রকে সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ দাও।"

কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে উভয়ে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ ত্রিপুরলিঙ্গ বলিয়া বসিলেন, "ভাই তুমি আমার পরিবারের একান্ত শুভানুধ্যায়ী। তাছাড়া, তুমি চিরদিনই ধীর স্থির মানুষ। একটা কথা তোমায় গোপনে জানাচ্ছি, কাউকে যেন বলো না। দেখলাম, আমার পুত্রের আয়ু আর বেশী নেই, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটবে। প্রাক্তন খণ্ডিত হয়ে এসেছে, তা আর এড়ানো যাবে না। এখন ভেবে বল তো, 'এ অবস্থায় আমার এখানে থাকা কি সঙ্গত? আমার স্ত্রী গঙ্গাকে আমি কিছু খুলে বলিনি, কিন্তু সংসারের অনিত্যতার কথা তাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি ভাই আর আমার সঙ্গে এসো না, এবার ঘরে ফিরে যাও। বিদায়।"

ত্রিপুরলিঙ্গের মুখের কথা সাতদিনের ভিতরেই ফলিয়া যায়। আকস্মিকভাবে, এক মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগিয়া, তাঁহার পুত্রের লোকান্তর ঘটে।

পথ চলিতে চলিতে ত্রিপুরলিঙ্গ হিমালয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মুক্তিসাধনার মহাপীঠ এই নগাধিরাজ। যুগে যুগে ইহার গুহায় মুক্তিকামী সাধকের দল আসিয়া আশ্রয় নেয়, হয় আপ্তকাম। তারপর আবার তাঁহাদেরই কৃপার পবিত্র গঙ্গাধারা নামিয়া আসে সংসারী মানুষের জীবনক্ষেত্রে।

এ অঞ্চলে পদার্পণ করার পরই ত্রিপুরলিঙ্গের হৃদয়ে এক নূতন উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে। এখানকার অরণ্যে, পর্ব্বতে আত্মগোপন করিয়া আছেন কত শক্তিধর যোগী, কত মহাজ্ঞানী তাপস। ইঁহাদের

সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। দিনের পর দিন দুর্গম পার্ব্বত্য পথের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলেন।

আশেপাশে লোকজনের বসতি তেমন নাই। কোন কোন দিন খাওয়া হয়তো জুটে, আবার এক এক দিন অনাহারেই কাটিয়া যায়। ক্ষুধায় কাতর হইলে এক একদিন পাকা গুলোড় বা ডুমুর ভোজন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

প্রস্তরাকীর্ণ অনুর্ব্বর অঞ্চল দিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন, সেখানে কোন আহার্য্যই মিলেনা। অনন্যোপায় হইয়া ঘুঁটের ছাই ঝরণার জলে গুলিয়া পান করেন। আবার অনশন, অর্দ্ধাশনের পর যদি কখনো পাহাড়িয়া বস্তিতে আসিয়া উপস্থিত হন, কেউ সাধুবাবাকে ভেড়ীর দুধ দোহন করিয়া দেয়, কেউ বা করায় ভূরিভোজন।

দীর্ঘ চড়াই উৎরাইর পথ চলিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ সেদিন তিব্বতের এক ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দেহ বড় শ্রান্ত, এক বৃক্ষতলে ঝুলিটি নামাইয়া আসন বিছাইয়া বসিলেন।

বেলা ক্রমে গড়াইয়া আসিতেছে। আগুনের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পরই এ অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পড়ে, সারা রাত ধুনী না জ্বালাইয়া উপায় নাই।

কাছেই এক গৃহস্থ বাড়ী। ত্রিপুরলিঙ্গ সেখানে আগুন চাহিতে গেলেন। অল্পবয়স্কা একটি ব্রাহ্মণ কুমারী বারান্দায় বসিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমাদের ঘর থেকে একটু আগুন আমায় দেবে?"

কি আশ্চর্য্য! আগুন দেওয়া দূরের কথা, মেয়েটি মহা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এই পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা জানা নাই। তাই বুঝিতেছেন না, আগুন চাহিয়া কি অপরাধ তিনি করিলেন।

এমন সময় হঠাৎ গৃহকর্ত্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

ত্রিপুরলিঙ্গকে তিনি ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন—তাঁহার কন্যা

াতেছে,—'প্রকৃত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁরা, তাঁরা কেন অগ্নি ংগ্রহের জন্য গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরবেন? ইচ্ছা করলেই তো াঁরা অগ্নি দেবতাকে আবাহন করতে পারেন।'

মার্জ্জনা চাহিয়া মহিলাটি কহিলেন, "বাবা, আপনি এ অবোধ ালিকার কথায় যেন রুষ্ট হবেন না, একটু দাঁড়ান, আমি ওকে আগুন দিতে বলছি।"

কয়েক টুকরা কাঠ মেয়েটির হাতে গুঁজিয়া দিয়া জননী কহিলেন, দাও, এবার সাধুবাবাকে আগুন দিয়ে দাও। ছিঃ এমন ক'রে কি হাত্মাদের গাল দিতে আছে?"

কাষ্ঠখণ্ড কয়টি মাটিতে সাজাইয়া কুমারীটি মন্ত্রোচ্চারণ করিল, দবতাকে আবাহন জানাইয়া ফুৎকার দিতেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল অগ্নিশিখা।

একটি ধাতুপাত্রে ঐ আগুন তুলিয়া রাখিয়া বালিকা তাহার নিজ াজে চলিয়া গেল।

এই কাণ্ড দেখিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ তো বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন। ঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়াছে তীব্র কৌতূহল। এমন অলৌকিক শক্তি ময়েটি কোথায় পাইয়াছে? কোন্ সাধন বলে লাভ করিয়াছে?

এ রহস্য তাঁহাকে ভেদ করিতেই হইবে। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহস্বামী কোথায়?

জানা গেল, তিনি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন, ফিরিতে কিছুটা বিলম্ব হইবে।

ত্রিপুরলিঙ্গ অঙনেই বসিয়া রহিলেন, ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তিনি স্থানত্যাগ করিবেন না।

কিছুক্ষণ বাদে ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন। দেখিতে সুপুরুষ, গৌরকান্তি। দেহের উপরিভাগ অনাবৃত। গলদেশে ঝুলিতেছে শুভ্র উপবীত। কাঁধে এক কোদালি, চাষের কাজ শেষ করিয়া আসিতেছেন, হাঁটু অবধি দুই পা ধুলা কাদায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

হস্ত পদ প্রক্ষালনের পর ব্রাহ্মণ ত্রিপুরলিঙ্গের কাছে আগাইয়া আসিলেন। করজোড়ে কহিলেন, "মহাত্মন, কৃপা ক'রে আপনি দীনের কুটিরে অতিথি হয়েছেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এতক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রাখতে হলো। আমায় মার্জ্জনা করুন। আজ এখানেই অন্ন গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন।"

"আচার্য্য, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ইচ্ছে ক'রেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছি। আপনার কন্যা এখানে যে অলৌকিক কাণ্ড দেখালো. আশ্চর্য্য হয়ে সেই কথাই শুধু ভাবছি। এর রহস্য দয়া ক'রে আমায় বলুন।"

স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনিয়া নিয়া ব্রাহ্মণ সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "মহাত্মন্, এতো অতি সহজ কথা। সত্যকার অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ যে হয়. তার গৃহে অগ্নি যে এমনি সহজভাবেই মন্ত্র সাহায্যে জ্বলে উঠে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।"

"কিন্তু আমি কেবল ভাবছি, এই বালিকা কি ক'রে অগ্নিকে এমন বশে এনেছে।"

"এ শক্তি আমরা অর্জ্জন করেছি পুরুষানুক্রমে, আর দেবপূজা অতিথি-সেবাতেই তা নিয়োগ করছি। তাই এ শক্তির ক্ষয় কখনো হয় না। আপনাদের সমতল ভূমে এ অগ্নি আবাহনের বিদ্যা একবার শিখলে লোকে তখনি তা নিজ স্বার্থের জন্য ব্যবহার করে। ফলে শক্তি তারা হারিয়ে ফেলে। বাবা, বেদমন্ত্রের শক্তি আবহমানকাল ধরে অব্যাহতই রয়েছে। শুধু মানুষ নিজে গেছে বদলে, তাই তো সে একে অস্বাভাবিক মনে করে। এ সব কথা যাক্। আপনি এবার দয়া ক'রে. হাত পা ধুয়ে ভোজনে বসুন। সন্ন্যাসী অতিথি অভুক্ত থাকতে তো আমরা খেতে পারিনে।"

"না, বাবা, আমি অপরের তৈরী অন্ন গ্রহণ করিনে।"

"বেশ তো, অগ্নি শুদ্ধ করে আপনি এ অন্ন ভোজন করুন। তা হলে তো আর আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।"

ব্রাহ্মণপত্নী তখনি অন্ন ব্যঞ্জন নিয়া আসিলেন। পানপাত্র হইতে এক অঞ্জলি জল নিয়া ব্রাহ্মণ মাটিতে ছিটাইয়া দিলেন, অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিলেন অগ্নির আবাহন মন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা হইতে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল নীলাভ অগ্নিশিখা। এই অগ্নিতে আহার্য্য-পূর্ণ থালাটি তুলিয়া ধরিলে ধীরে ধীরে উহা গরম হইয়া উঠিল। একি অদ্ভুত দৃশ্য! ত্রিপুরলিঙ্গের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সানন্দে ঐ অন্ন-ব্যঞ্জন তিনি পরিতোষ সহকারে আহার করিলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয়াদি হইল। ত্রিপুরলিঙ্গকে সঙ্গে নিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার পাঠকক্ষে ঢুকিলেন, পেটিকা হইতে বাহির করিলেন বহু দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থ। তন্ত্র ও জ্যোতিষীর অমূল্য সংগ্রহ এখানে রহিয়াছে। এ সব গ্রন্থের তত্ত্বরাজী ব্রাহ্মণের অধিগত। ইহাদের প্রয়োগেও তিনি পারঙ্গম।

ত্রিপুরলিঙ্গের দিকে চাহিয়া ব্রাহ্মণ সস্নেহে কহিলেন, "বাবা, তোমার হয়ত নিগূঢ় বিদ্যা শেখবার কৌতূহল জেগেছে। গুরুকৃপায় অনেক কিছু আমার আয়ত্তাধীন। আমি তোমায় শেখাতেও পারি। কিন্তু এক সর্ত্তে। এখানে তোমায় স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে। আমি বলি কি, তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর, এখানেই থেকে যাও। যে সব অলৌকিক শক্তি আমি অর্জ্জন করেছি, তা তোমার ভেতর সঞ্চারিত করে দেবো। এই যে গ্রন্থরাজী দেখছো, এসব আজকাল দুষ্প্রাপ্য। এই গ্রন্থভাণ্ডারও আমি তোমায় দিয়ে যাবো"

বিবাহ? এ ব্রাহ্মণ বলে কি? ত্রিপুরলিঙ্গের কৌতূহল ও গুপ্তবিদ্যা আহরণের ইচ্ছা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। নিজ জীবনের উদ্দেশ্য, মুক্তি কামনায় তাঁহার সর্ব্বস্বপণ, শক্তিধর মহাত্মাদের অযাচিত কৃপা, নিজের সাধননিষ্ঠা, সব কিছু অকপটে ব্রাহ্মণের কাছে তিনি বিবৃত করিলেন।

সব শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "না বাবা, তা হলে তোমায় এখানে আটকে রেখে আমি অধর্ম্মে পতিত হতে চাইনে। কন্যার বিবাহের যে

প্রস্তাব আমি করেছি, তা মোহগ্রস্ত হয়েই করেছি। আমায় তুমি মা
ক'র। তোমার সাধন জীবনে গুরুকৃপা ফলিত হয়ে উঠুক, অভী
তোমার সিদ্ধ হোক্। তবে এখানে কিছুদিন যদি থাকো, কয়েক
নিগূঢ় বিদ্যা আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো।"

এই শক্তিধর ব্রাহ্মণের গৃহে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়
ত্রিপুরলিঙ্গ আবার যাত্রা শুরু করিলেন।

দৃষ্টি তাঁহার এবার প্রসারিত হিমবন্তের চিরতুষারময় অঞ্চলে
দিকে। রজতগিরিসন্নিভ অভ্রভেদী গিরিচূড়া সেখানে অপরূপ মহিমা
দণ্ডায়মান। ধ্যানমূর্ত্তি মহেশ্বরের মৌন আহ্বান ত্রিপুরলিঙ্গের হৃদয়ে
তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। দ্রুতপদে সম্মুখেরদিকে তিনি
আগাইয়া চলেন।

এবার তিনি শিবভূমির অভিযাত্রী। কখনো পাহাড়ের চূড়া
চূড়ায়, কখনো নির্ঝরিণীর তীরে, কখনো বা জংলা পাকদণ্ডির পথে
আগাইয়া চলিয়াছেন। অন্তরে আকাঙ্ক্ষা, যাত্রাপথে ভাগ্যক্রমে
যদি কোন শক্তিধর যোগীর সাক্ষাৎ মিলে, তবে তাঁহার চরণতলে
আশ্রয় নিবেন। সাধন জীবনকে করিবেন চরিতার্থ।

সে দিন প্রত্যূষ হইতেই পর্য্যটন শুরু হইয়াছে। চড়াই উৎরা
অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গের দেহ অবসন্ন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায়ও কাত
কম হন নাই। কিন্তু এখানে এ সময়ে আহার্য্য বা পানীয় কি করিয়
মিলিবে?

পথের দুইধারে প্রস্তরাকীর্ণ রুক্ষ পাহাড়ের সারি, বন-জঙ্গ
থাকিলে তবুও হয়তো ফলমূল কিছু জোটানো যাইত। কাছাকাছি
কোথাও কোন লোকালয় বা সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম নাই। তবে আশ্র
মিলিবার সম্ভাবনা কই? বহু নিম্নে তিন চার মাইল দূরে এক পার্ব্বত
নদীর শীর্ণ রেখা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দেহের যে অবস্থা, তাহাতে
সেখানে নামিয়া গিয়া জল সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব।

গুরুর নাম ঘন ঘন স্মরণ করিতেছেন ত্রিপুরলিঙ্গ। অবসন্ন দেহকে টানিয়া নিয়া কোনমতে পথ চলিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ কাণে পশিল অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

"বেটা ত্রিপুরলিঙ্গ, এ পথ দিয়ে কোথায় তুমি চলেছো? একটু অপেক্ষা ক'রো। আমি নীচে নেমে আসছি।" —পাহাড়ের কোলে দাঁড়াইয়া জটাজুটমণ্ডিত এক বর্ষীয়ান যোগী উদাত্ত স্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন।

মহাত্মা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই ত্রিপুরলিঙ্গের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল অপার বিস্ময়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইঁহাকে কোনদিন দর্শন করিয়াছেন বলিয়া তো মনে পড়ে না। তবে কি করিয়া উনি তাঁহার নাম জানিলেন? কেনই বা এ সময়ে যোগীবরের আবির্ভাব? সঙ্কট ত্রাণের জন্য?

প্রসন্নোজ্জ্বল হাসি ছড়াইয়া যোগী কহিলেন, "বৎস, আমিই তোমায় ডেকেছি। ডেকেছি তার কারণও আছে। তুমি যে আমার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলে।"

"সে কি! দর্শন করতে চেয়েছি—আপনাকে?" অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠেন ত্রিপুরলিঙ্গ।

"হ্যাঁ, বৎস ঠিক তাই। তোমার অন্তস্তলে তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্গত হয়েছে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। তবে তা তোমার সচেতন মনের কাছে ধরা পড়েনি। আচ্ছা, বলতো, এ অনির্দ্দেশ্য যাত্রায় কেন তুমি বেরিয়েছো? দিনের পর দিন হিমালয়ের দূর দুর্গম প্রদেশে কেনই বা এগিয়ে চলেছো? এখনো তা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়নি। আসলে এই অভিযাত্রার পেছনে রয়েছে তোমার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। আর রয়েছে এক গূঢ় ঐশী ইঙ্গিত। পরে এ কথা বুঝতে পারবে।"

সম্মোহিতের মত ত্রিপুরলিঙ্গজী তাঁহার চরণে পতিত হইলেন, নিবেদন করিলেন সশ্রদ্ধ প্রণাম।

যোগী কহিলেন, "বৎস, তোমার পরিচয় আমি সবই জানি। আমি

কে, তা জানতে উৎসুক হয়েছো? শোন তবে। আমার লৌকিক পরিচয় বলতে কিছু নেই। অপর যে পরিচয় আছে তা ক্রমশঃ তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। তবে আমার একটা ডাক নাম আছে বৈ কি এ অঞ্চলে সবাই আমায় বলে—লামাস্বামী।”

ত্রিপুরলিঙ্গের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসানুভূতি। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন বার ডাকিয়া কহিতেছে “ওরে, এ মহাত্মা যে তোর এক সত্যকার আপন জন। এঁরই পরমাশ্রয় তুই গ্রহণ কর্।”

সাশ্রুনয়নে তিনি নিবেদন করিলেন, “প্রভু, আমি নিতান্ত অসহায়—শিক্ষাগুরুর সঙ্গচ্যুত হবার পর নোঙরহীন নৌকার মত ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। এবার কৃতসঙ্কল্প হয়ে এই শিবভূমিতে এসেছি—হয় সিদ্ধিলাভ করবো, নতুবা ক’রবো শরীরপাত।”

“বৎস, তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। আগে খেয়ে দেয়ে সুস্থ হও বিশ্রাম ক্’র। বিস্তারিত কথা পরে হবে। এসো, নিকটেই আমার আবাস স্থান।”

যোগী পথ দেখাইয়া চলিলেন। উভয়ে উপনীত হইলেন পর্ব্বত-শৃঙ্গের পশ্চাৎদিকে এক প্রস্তর-গুহায়।

গুহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ত্রিপুরলিঙ্গের বিস্ময়ের অবধি রহিলনা। দেখিলেন অদূরে নিম্ন ভূমিতে প্রসারিত রহিয়াছে তরুরাজি শোভিত এক শ্যামল ক্ষেত্র। আর তাহার পাশ দিয়া কুলুকুলু নাদে বহিয়া চলিয়াছে একটি পার্ব্বত্য ঝরণা। চারিদিকে অভ্রভেদী রুক্ষ পর্ব্বতশৃঙ্গের বেষ্টনী। মধ্যস্থলে বিরাজিত সবুজ তৃণলতামণ্ডিত সুরম্য বনভূমি। এ দৃশ্য সত্যই অভাবনীয়!

যোগীবর স্মিতহাস্যে কহিলেন, “বৎস, এমনতর বহু শ্যামল ভূমি লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গিয়েছে। হিমালয়ের ভাঁজে ভাঁজে, অতি দুর্গম স্থানে এগুলো লুকোনো। সমতলের মানুষ তো দূরের কথা, অনেক পর্ব্বতচারীও কোন সন্ধান জানে না।”

ত্রিপুরলিঙ্গকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া যোগীবর ঐ বনে প্রবেশ করিলেন। ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, হাতে রহিয়াছে এক ভাঁড় সুপেয় জল এবং দুইটি পক্ক ফল।

ফল দুইটি ভোজন করার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরলিঙ্গের শ্রান্তি ও অবসন্নতা দূর হইয়া গেল।

"বৎস, এখন কিছুকাল তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। আমি একটু কার্য্যান্তরে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমায় ডাকবো।"—বলিয়া মহাত্মা অন্তর্হিত হইলেন।

এক সুবৃহৎ পাষাণবেদীর উপর দেহ প্রসারিত করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

নিদ্রা ভাঙ্গিতেই দেখিলেন এক অপরূপ দৃশ্য। যোগীবর গুহার কোণে পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। ধুনীর আগুনের আভায় গৌরদেহ হইয়াছে কাঞ্চনাভ। আয়ত নয়ন দুটি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

যোগীবর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ত্রিপুরলিঙ্গ, তোমায় এখানে দু'এক বৎসর অবস্থান করতে হবে। আমি তোমায় যোগ সাধনার নিগূঢ় ক্রিয়াদি শিক্ষা দেবো। কিন্তু বৎস, তার আগে তোমার অন্তস্তল থেকে অপসারিত করতে হবে যোগবিভূতি বা সিদ্ধাই অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। মনে রেখো এ আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সাধন-পথের বড় অন্তরায়। নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন যে পরমাত্মা, তাঁর দিকেই নিবদ্ধ রাখবে একাগ্র দৃষ্টি। যে সাধন এখানে পাবে তা অভ্যাস করবে অনন্যকর্ম্মা হয়ে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি জয়যুক্ত হও।"

মহাত্মার চরণে প্রণিপাত জানাইয়া ত্রিপুরলিঙ্গ তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এখন হইতে কঠোর যোগসাধনার মধ্য দিয়া তাঁহার অধ্যাত্মজীবন আগাইয়া চলে।

দেড় বৎসর এ পাহাড়ে তিন অতিবাহিত করেন, যোগীবরের আশীর্ব্বাদে হন আপ্তকাম।

এখানকার সাধনায় যে চরম দিব্যানুভূতি তিনি লাভ করেন, সে প্রসঙ্গে স্বামীজীর শিষ্য নরেশানন্দজী লিখিয়াছেন, "পাহাড়ের গায়ে এক বৃক্ষমূলে ত্রিপুরলিঙ্গ বসিয়া আছেন, ভাবতন্ময়তায় একেবারে মগ্ন—ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল। এই ভাবে কতক্ষণ তিনি তিনি ছিলেন তাহা তাঁহার বোধ ছিলনা। কিন্তু যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন তিনি সমস্তই মধুময় বোধ করিতে লাগিলেন। কাহার মধুর স্পর্শে হৃদয়তন্ত্রী যেন সুমধুর তানে বাজিয়া উঠিল। মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল—তাঁহার মনে হইতে লাগিল জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতন্যময়। সে আনন্দের শেষ নাই—বৃক্ষলতা, পাহাড় পর্ব্বত, আকাশ, বায়ু, জলস্থল সকলই যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ—সে আনন্দের ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। কি এক অপূর্ব্ব ও মধুর সুরতানসমন্বিত সঙ্গীত উত্থিত হইয়া অনন্তাভিমুখে কোথায় যেন ভাসিয়া চলিয়াছে—তাহার আর শেষ নাই। ত্রিপুরলিঙ্গ আরো অনুভব করিলেন, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল কি এক মধুর উজ্জ্বল প্রভায় উদ্‌ভাসিত হইয়া অমৃত আস্বাদনের জন্য অনন্তের পথে পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর 'অব্যক্তং অচিন্ত্যং অনির্বচনীয়ং' অবস্থা। এইরূপ স্থির নিশ্চল নিস্পন্দভাবে বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল।"[১]

গুহায় ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা স্মিতহাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস ত্রিপুরলিঙ্গ, তোমার সাধনার সাফল্যে আমি মহা আনন্দিত হয়েছি। যে দিব্য অনুভূতির স্বাদ আজ গ্রহণ করলে, খুব কম সাধকই এত শীঘ্র তার অধিকারী হয়। পরমাত্মা তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন। তোমার অভীষ্ট অনেকাংশে সিদ্ধ হয়েছে। এবার তুমি সমতলভূমিতে নেমে যাও। সেখানে গিয়ে নির্দ্ধারিত ঐশী কর্ম্ম উদযাপন ক'র। আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাই, অচিরে তোমার পরম-প্রাপ্তি ঘটুক। ব্রহ্মলাভ হোক্।"

১ স্বামীজীর কথা : নরেশানন্দ সরস্বতী ; পৃঃ ৫৪-৫৫।

কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর ঐ পর্ব্বতগুহায় এক বর্ষীয়ান বিশিষ্ট যোগীর আগমন ঘটে। ইঁহার নাম প্রজ্ঞানন্দ স্বামী। মহাত্মার নিকট হইতে নিগূঢ় যোগসাধনা ইনি গ্রহণ করিয়াছেন, দীর্ঘদিন তাহা অভ্যাস করিয়াও চলিয়াছেন। সাধারণতঃ হিমালয়ের নিম্নভূমিতে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই প্রজ্ঞানন্দ অবস্থান করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাকে এই পর্ব্বতশীর্ষে উঠিয়া আসিতে হয়। মহাত্মার কাছে উচ্চতর যোগক্রিয়ার নির্দ্দেশাদি নিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যান।

ত্রিপুরলিঙ্গের সহিত মহাত্মা তাঁহার এই কৃতী শিষ্যের পরিচয় সাধন করিয়া দিলেন। কহিলেন, "বৎস ত্রিপুরলিঙ্গ, তুমি স্বনামধন্য যোগী ত্রৈলঙ্গ মহারাজের কাছে দীক্ষা পেয়েছো। যোগসাধনার নানা স্তর ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে চলেছো। যোগীদের শক্তি-বিভূতির সাথে তোমার কিছুটা চাক্ষুষ পরিচয় থাকা দরকার। প্রজ্ঞানন্দ এ বিষয়ে তোমায় সাহায্য করতে পারবে।"

নরেশানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—"লামাস্বামী প্রজ্ঞানন্দকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দ সূক্ষ্ম শরীরে ভ্রমণ ও পরকায়া প্রবেশ প্রণালীর নিয়ম ও যৌগিক ক্রিয়াপদ্ধতিগুলি ত্রিপুরলিঙ্গকে যথাযথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি বেশ উপলব্ধি করিলেন, যোগীগণের পক্ষে সূক্ষ্মদেহে গমনাগমন, পরকায়া প্রবেশ বা যে কোনও তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বহুদিন, এমন কি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত, সংস্কারময় দেহ রাখা সম্ভব হয়। ত্রিপুরলিঙ্গের অষ্টাঙ্গ যোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও সত্যসঙ্কল্প সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় তত্ত্বগুলি অনুধাবন বা আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হইল না।"

পরমানন্দে আরো কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর মহাত্মা লামাস্বামীর কাছে ত্রিপুরলিঙ্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন। এবার তাঁহার পরিব্রাজনের লক্ষ্যস্থল—পূর্ব্ব ভারতের তীর্থসমূহ।

হিমালয়ের বনপথ দিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলেন। পথে

নেপালের পশুপতিনাথে কিছুদিন অবস্থানের পর সিকিম ভূটান হইয়া পদার্পণ করেন আসামে।

এখানে কামাখ্যা ও পরশুরামকুণ্ড দর্শন করিয়া উপস্থিত হন জয়ন্তীয়া পাহাড়ে। পাহাড়ের কোলে, গহন বনের অভ্যন্তরে চোখে পড়িল এক প্রাচীন শিব মন্দির। খরবেগে পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে এক পার্ব্বত্য ঝরণা। এখানকার নির্জ্জনতা, প্রাকৃতিক শোভা ও পবিত্র পরিবেশ দেখিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ মুগ্ধ হইলেন। স্থির করিলেন, এই মন্দিরে কিছুকাল ধ্যান ভজনে কাটাইবেন।

মন্দিরের বারান্দায় সবেমাত্র আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় নিকটস্থ গ্রামের একটি লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আজ তাহার মানৎ ছিল, তাই শিবের মাথায় এক ভাঁড় দুধ চড়াইতে আসিয়াছে। কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া যায়। লোকটি ত্রিপুরলিঙ্গের চরণে প্রণতি জানাইয়া প্রশ্ন করে, "সাধুবাবা বুঝি আজই এসেছেন এ মন্দিরে? সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এবার তাড়াতাড়ি চলুন আমাদের গাঁয়ে। সেখানেই আপনার সেবার বন্দোবস্ত করা যাবে।"

"তাতো হয় না ভাই। কিছুদিন এখানে থাকব বলেই ভেবেছি।" —ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তর দেন।

বিস্ময়ে লোকটির নয়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠে। মন্তব্য করে, "বাবা, এ মন্দিরে আজ অবধি কেউ রাত্রিবাস করতে পারেনি। নিজের মঙ্গল চান তো, আজই এ জায়গা ত্যাগ ক'রে যান। অনেক সাধুই এ মন্দিরে প্রাণ হারিয়েছেন।"

সহাস্যে ত্রিপুরলিঙ্গ জানাইয়া দেন, যে সঙ্কল্প তিনি করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ না হওয়া অবধি এই দেবস্থান হইতে এক পা নড়িবার ইচ্ছা তাঁহার নাই।

"দেখ্‌ছি, এ বিদেশী সাধুর মৃত্যু আজ ঘনিয়ে এসেছে।"—আপন মনে বক্ বক্ করিতে করিতে লোকটি বনপথ ধরিয়া গ্রামের দিকে অদৃশ্য হইয়া যায়।

রাত্রি ক্রমে গভীর হয়, বনভূমি এক সুগম্ভীর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠে। মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ শিবের আরাধনায় উপবিষ্ট হন। ডুবিয়া যান ধ্যানের গভীরে।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখেন এক অলৌকিক দৃশ্য! সারা গর্ভমন্দির শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জটাজুটসমন্বিত, তেজঃপুঞ্জকায় এক দিব্য পুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। নয়নদ্বয় অগ্নিগোলকের মত জ্বলিতেছে. আর নিষ্পলক দৃষ্টিতে ত্রিপুরলিঙ্গের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন।

সাহস সঞ্চয় করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গ নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। এই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে শিবারোধনায় রত হয়েছিলাম। আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শন এখানে পেলাম। কৃপা করে বলুন, আপনি কে ?"

গম্ভীর স্বরে দিব্য পুরুষ উত্তর দেন, "বৎস, আমার পরিচয় শুনে তোমার কোন লাভ নেই। তা এখন থাক। আজ আমি আবির্ভূত হয়েছি তোমারই মঙ্গলার্থী হয়ে। তোমার পরিচয় আমি জানি, তোমার গুরুদেবের কথাও অবগত আছি। বৎস, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমায় একটি সাধন নির্দ্দেশ দেবার জন্য। তুমি তা গ্রহণ ক'রে পরমপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাও। হ্যাঁ, আর একটা কথা। কাল প্রত্যুষেই তুমি এই মন্দির ত্যাগ করবে। এতে অন্যথা না হয়।"

ত্রিপুরলিঙ্গকে নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব দান করিয়া দিব্যপুরুষ মুহূর্ত্তমধ্যে সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ত্রিপুরলিঙ্গ এই দিব্যপুরুষের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরকালে এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন—"এ সব দিব্যপুরুষ সাধকদের হিতের জন্যই তপঃসিদ্ধ তীর্থে আবির্ভূত হন।"

পরদিনই ত্রিপুরলিঙ্গ এই মন্দির ত্যাগ করিয়া যান। তারপর জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে তিনি যাত্রা করেন বাংলাদেশ অভিমুখে।

এখন হইতে ঢাকা নগরীই হয় যোগী ত্রিপুরলিঙ্গের লীলাভূমি। শহরের উপান্তে বেগুনবাড়ী নামক গ্রাম। এই গ্রামেরই গাঁ ঘেঁষিয়া আগাইয়া চলিয়াছে গহন বনাঞ্চল। শাল পলাশ আম জামের অগণিত বৃক্ষ ছড়ানো চারিদিকে। লাল মাটি আর কাঁকরের সাথে জড়াইয়া আছে অজস্র সবুজ ঝোপঝাঁড়। নিভৃত তপস্যার উপযোগী এ স্থান ত্রিপুরলিঙ্গের বড় ভাল লাগিল। স্থির করিলেন, কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করিবেন।

সম্মুখস্থ এক বটবৃক্ষের নীচে তিনি আসন বিছাইয়া বসিলেন, ধুনী প্রজ্জ্বলিত করার অনতিকাল মধ্যেই হইলেন ধ্যানস্থ। তারপর বাহ্যজ্ঞান রহিলনা।

কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ অদূরে বনমধ্যে শোনা গেল তুমুল সোরগোল। নয়ন উন্মীলন করিতেই ত্রিপুরলিঙ্গ দেখিলেন এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য! তাঁহার পাশে, কয়েক হাত দূরেই একটি বৃহদাকার বাঘ নিশ্চিন্ত আরামে শয়ন করিয়া আছে। ত্রিপুরলিঙ্গ যেন তাহার এক অতি আপনার জন, তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া সে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে চায়।

একটু পরেই অদূরে উপস্থিত হয় হস্তীপৃষ্ঠে আরোহিত একদল শিকারী। সকলেরই হাতে দূর পাল্লার রাইফেল। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট সাধু ও হিংস্র ব্যাঘ্রের এই অপরূপ মিলন দৃশ্য দেখিয়া তাহারা তো একেবারে হতবাক্।

হাতার হাওদায় উপবিষ্ট আছেন এক সুদর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। তাঁহারই ইঙ্গিতে শিকারীদলের কেহ এতক্ষণ বাঘটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়ে নাই। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে সকলেই তাকাইয়া আছেন। ভাবিতেছেন, এ হিংস্র বাঘ কোন্ ইন্দ্রজাল বলে সাধুর কাছে পোষ মানিয়াছে? নিজের প্রতাপ ভুলিয়া কেন হইয়াছে শান্ত ও নির্ব্বিকার?

সকলেই চুপচাপ। কাহারো মুখে একটি কথাও সরিতেছে না।

বনমধ্যে শিকারীদের তাড়া খাইবার পর বাঘটি এখানে চলিয়া আসে এতক্ষণ সাধুর সম্মুখে নিরিবিলিতে বেশ বিশ্রাম করিতেছিল। এবার জনসমাগমে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসে। তারপর হঠাৎ ত্রিপুরলিঙ্গের পিছন দিয়া বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায়।

শিকারী দলে এবার গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। সুদর্শন পুরুষটি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। ত্রিপুরলিঙ্গের কাছে আসিয়া জানাইলেন সশ্রদ্ধ সেলাম। কহিলেন, "সাধুজী, আপনি সত্যই ধন্য। খোদাতালার দোয়া আপনি পেয়েছেন। নইলে হিংস্র বাঘ আপনার কাছে এসে পোষা কুকুরের মত হয়ে যাবে কেন? কিন্তু, আপনি এই বিজন বনে কেন বসে আছেন? চলুন শহরে, আমার গরীব-খানায়। সেখানে আপনার বসবাস ও ভোজনের সব ব্যবস্থা আমি সানন্দে ক'রে দেবো।"

ত্রিপুরলিঙ্গের আনন স্মিত হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মৃদুস্বরে কহেন, "আমায় আপনার গৃহে নিয়ে গিয়ে কি লাভ হবে, বলুন তো?"

"আমার কিসমৎ ভাল। আপনার মত কেরামৎসম্পন্ন মহাত্মার দর্শন পেয়েছি। এ কিসমৎ যে সবাইকে বেঁটে দিতে ইচ্ছে করছে। তাই চাইছি, সবাই আপনার দর্শন পাক্।"

"আপনি কেরামৎ অর্থাৎ যোগ বিভূতিকে এতো বড় করে দেখছেন কেন? বনের বাঘ কেন তার হিংসা ভুলে গেল, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছেন? কিন্তু এতো অতি সহজ কথা। পরমাত্মার ধ্যানে আমি সদা তন্ময় থাকি, পরমাত্মা সারা বিশ্বে ওতপ্রোত, তাই বিশ্বের সব কিছুকেই আপন বলে ভালবাসি আন্তরিকভাবে। বাঘও তাই আমার অতি আপন—পরমাত্মায়। সে আমার কাছে এসে স্বাভাবিক প্রেমের আকর্ষণেই বাধা পড়েছিলো। এ অতি সহজ কথা, এতে ইন্দ্রজালের কিছু নেই।"

আগন্তুক মৃদু হাসিলেন। কহিলেন, "সাধুজী, আমরা অজ্ঞ, তত্ত্বের কথা কিছুই জানিনে। কিন্তু এটুকু অবশ্যই বুঝি—সব কিছুর ভেতর

আল্লাহ্‌তালাকে দেখা, নিজের অহমিকাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সব কিছুকে আপন বলে উপলব্ধি করা ও ভালবাসা, এতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু সিদ্ধ পুরুষেরাই পারেন এটা।"

একজন সঙ্গী আগাইয়া আসিয়া কহিলেন "সাধুজী, ইনি হচ্ছেন ঢাকার স্বনামধন্য নবাব, আবদুল গনি সাহেব। শুধু ধনী প্রতাপশালী জমিদারই নন, সৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলেও এ অঞ্চলে ইনি সুপরিচিত। আপনি এঁর আতিথ্য গ্রহণ করলে, এ শহরের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ আপনার সান্নিধ্য পাবে, উপকৃত হবে। আপনি কৃপা ক'রে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।"

ত্রিপুরলিঙ্গ উত্তরে কহিলেন, "এ স্থানটি ধ্যান ভজনের পক্ষে বড় উপযোগী। আমি এখানে আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে চাই। পরে আপনাদের এ অনুরোধ রাখবো।"

ইহার কিছুদিন পরে গনিমিঞা সাহেবের ব্যবস্থা অনুযায়ী ত্রিপুরলিঙ্গ কুরমীটোলা এবং শাহ্‌বাগে অবস্থান করেন। সে সময়ে অল্পদিনের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। তাঁহার জীবনে যোগবিভূতির নানা প্রকাশও ঘটিতে থাকে।

দারিদ্র্য ও শোকতাপে জর্জ্জর নরনারী প্রায়ই তাঁহার কাছে ভীড় করিত। মাগিত আশীর্ব্বাদ ও আশ্রয়। সুগৌর-সুঠামতনু এ মহাত্মাকে মুসলমান ভক্তেরা ডাকিত রঙ্গন-শাহ্‌ ফকীর নামে। হিন্দুরা বলিত— সিদ্ধাই ঠাকুর।

ভক্তিনা নামে এক বৃদ্ধা হিন্দুস্থানী রমণী এ সময়ে ত্রিপুরলিঙ্গের মহা ভক্ত হইয়া পড়ে। প্রায়ই সে শাহ্‌বাগে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, ভিক্ষার জন্য আনিত ফলমুল। সদা নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ত্রিপুরলিঙ্গজী তাহার দেওয়া খাদ্য আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন।

শহরের বাজারে ভক্তিনার একটি ক্ষুদ্র ডালের দোকান ছিল। বৃদ্ধার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ত্রিপুরলিঙ্গজী সে-বার

ঐ দোকানে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। কিছু দিন চলে এই নিভৃত বাস। দেখা যায়, দিন রাতের প্রায় সময়ই কম্বল মুড়ি দিয়া এই ডালওয়ালীর দোকানে, চৌপাইর উপর তিনি শায়িত রহিয়াছেন। কতিপয় ঘনিষ্ঠ ভক্ত ছাড়া অপর কেহ এই শক্তিধর মহাত্মাকে চিনিতনা, তাঁহার মাহাত্ম্যও জানিতনা।

এ আত্মগোপনের পালা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অচিরে সিদ্ধ যোগীর বিভূতি ও কৃপার কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে।

বনগ্রামের আকুবাবু ছিলেন ঢাকার এক প্রাচীন জমিদার বংশের সন্তান। বিপুল বিত্ত বিষয়ের তিনি অধিকারী। এই সময়ে আকুবাবু মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাই চলিতে থাকে, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষটায় সঙ্কট চরমে উঠে, শহরের প্রবীণ চিকিৎসকেরাও হাল ছাড়িয়া দেন।

এ অবস্থায় আকুবাবুর এক ভ্রাতা কি করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গজীর শক্তি বিভূতির কথা অবগত হন। ডালওয়ালী ভক্তিনার দোকানে আসিয়া তিনি কাঁদিয়া পড়েন। বারবার মিনতি জানাইয়া চাহেন ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা।

যোগীবরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়। বলেন, "ছ্যাখো, শিবজীর কৃপায় সব কিছু সম্ভব হতে পারে। তিনি আশুতোষ, একটু স্তব স্তুতিতেই হন মহা তুষ্ট। তোমরা শিবের ভজনা কর, বিল্বপত্র তাঁর শিরে চড়াও।"

আকুবাবুর ভ্রাতা এবার চরণ ধরিয়া পড়েন। অশ্রুসজল চক্ষে বলেন, "মহারাজ, আমরা হীনবুদ্ধি বিষয়ী। আমাদের ভজনে কোন কাজ হবে না, পাষাণলিঙ্গ থেকে কৃপাবারি কখনোই ঝরবেনা।

"কিন্তু, বেটা, আমি কি করতে পারি?"

"আপনি সব পারেন, মহারাজ। আপনি হচ্ছেন যোগসিদ্ধ, শিবকল্প মহাপুরুষ। ঈশ্বরীয় কৃপা আপনার মত শক্তিধর মহাপুরুষেরাই শুধু

নামাতে পারেন। আমরা জীবন্ত শিবরূপে আপনাকে কাছে পেয়েছি আপনার কাছেই কৃপভিক্ষা চাইছি। এ কৃপা না পেলে আমি এখা থেকে নড়বো না।"

যোগীবর তাঁহার আসন হইতে উত্থিত হন। কমণ্ডলুর জলের মধে তিনটি বিল্বপত্র ডুবাইয়া নিয়া আর্ত্ত ভক্তকে কহেন, "যাও, এখনি এ পত্র তিনটি বেটে, তিনবার রোগীকে খাইয়ে দাও। আর শিয়রে বসে শোনাও শিবস্তুতি। ভয় নেই, সে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

আকুবাবুর প্রাণ রক্ষা হয়, শুধু তাহাই নয়, পুনরায় হৃতস্বাস্থ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘদিন কর্ম্মক্ষমও থাকেন।

রোগমুক্তির পর হইতে আকুবাবু ত্রিপুরলিঙ্গজীর মহা ভক্ত হইয় উঠেন। তাঁহার করাতিটোলার বিস্তৃত বাগিচায়, শহরের অন্যা ভক্তের সহযোগিতায় যোগীবরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এক মনোর আশ্রম।

স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গজীর আস্তানা—তাই এ আশ্রমের নাম দেওয় হয়, স্বামীবাগ। পরবর্ত্তীকালে সমগ্র পল্লীটিই স্বামীবাগ নামে পরিচি হইয়া উঠে। এই সময় হইতে ঢাকার স্বামীজী বলিতে জনসাধার ত্রিপুরলিঙ্গ মহারাজকেই বুঝিত।

এবার হইতে শুরু হয় আচার্য্য জীবন। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূখ সকলেই দলে দলে আসিতে থাকে তাঁহার সমীপে। কেহ আসে শোক-তাপ দুর্দ্দৈব নিবারণের জন্য, কেহ বা আসে অধ্যাত্মজীবনের জিজ্ঞাস নিয়া। কৃপালু স্বামীজীর যোগশক্তি, বিদ্যাবত্তা ও স্নেহপ্রেম সদাই নিয়োজিত থাকে দুঃখীর দুঃখ মোচনে, আর্ত্তের ত্রাণকর্ম্মে। স্বামীবাগ আশ্রম ভক্তসমাগমে সরগরম হইয়া উঠে।

সে-বার এক ভক্ত ত্রিপুরলিঙ্গজীকে প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, আপনি আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন ভগবানের আশীষরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান আপনি করবেন, ঈশ্বরলাভের পথনির্দ্দেশ দেবেন, এই হচ্ছে কাম্য। কিন্তু আপনি এতো লোকের

রোগ শোকের ভার নিয়ে ভীড় জমিয়ে বসেছেন কেন, তা কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে।"

স্বামীজী হাসিয়া বলেন, "বেটা, আমার গুরুদেবের আদেশ,—যে ক'টা দিন এই শরীর থাকবে, সে ক'টা দিন লোকমঙ্গলের কাজে যেন ব্যয় করি। কিন্তু আসল লোকমঙ্গল হচ্ছে ভবরোগের ব্যাধি সারানো। দেখছো তো, সে ব্যাধির কথা নিয়ে শতকরা দুটো লোকও আসেনা —আসে রোগশোক আর মামলা-মকদ্দমা নিয়ে।"

"তবে আপনি এদের নিয়ে এতো ঝামেলা পোহাচ্ছেন কেন?"

"কেন, জানো? মানবীয় দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের ভেতর দিয়ে এরা আমার কাছে আসে। তারপর কারুর কারুর মনে হয়তো জেগে ওঠে ভববন্ধন মোচনের কথা। তাছাড়া, জানতো, এই শরীরটা শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদপূত। তাই এ শরীরের সান্নিধ্যে মাঝে মাঝে এসে বাস করলে মঙ্গল তো লোকের কিছুটা হয়ই।"

স্বামীজীর এই কৃপালীলা, তাঁহার লোকমঙ্গলের এই কর্ম্মধারা ভক্তদের ব্যক্তিজীবনের গণ্ডী ছাড়াইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনেও বিস্তৃত হইতে দেখা যাইত। অথচ আপন সিদ্ধজীবনের নিভৃত মর্ম্মকোষে তিনি সদাই থাকিতেন নির্লিপ্ত, উদাসীন।

ভক্ত ও অনুরাগীদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক মুক্তি অন্দোলনেও ত্রিপুরলিঙ্গজী পরোক্ষে কম সাহায্য করেন নাই। এ প্রসঙ্গে খ্যাতনামা বিপ্লবীনেতা শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন—

"সমিতির (বিপ্লবী) প্রধান সভ্য এবং ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল আনন্দ পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য। ক্রমে ঢাকার অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীর শিষ্য হন। পুলিন বাবু অনেক সময় স্বামীজীর সঙ্গে সমিতি বিষয়ে আলোচনা করতেন ও তাঁর পরামর্শ চাইতেন। স্বামীজীর আশ্রম ছিল সমিতির একটা প্রধান

আড্ডা এবং তিনি সমিতির কাজের নানা সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। আশ্রম এবং নিকটবর্ত্তী জমিতে কয়েকবার আমাদের কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া হয়েছে। বৃটিশ সরকার যখন সমিতি ধ্বংস করতে উদ্যত হয় এবং ধর পাকড় আরম্ভ ক'রে, তখনও তিনি ভীত হননি।"[১]

বলা বাহুল্য, এই ধরণের কাজে স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে কখনো জড়িত করেন নাই। অসহায় মানুষকে রোগশোক, দারিদ্র্য, দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষার জন্য তাঁহার করুণা যেমন নামিয়া আসিত, তেমনি বিদেশী শাসনের লাঞ্ছনা ও অত্যাচার দমনেও দেখা যাইত তাঁহার সমর্থন।[২] তিনি প্রায়ই বলিতেন—যে দাসত্ব মানুষের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া দেয়, তাহার অবসান ঘটানো অবশ্য প্রয়োজন।

বহিরঙ্গ জীবনের অন্তরালে সিদ্ধ যোগী সদাই থাকিতেন আপন তপস্যায় সমাহিত। আত্মিক জীবনের অন্তঃসলিলা ধারা নিরন্তর সেখানে বহিয়া চলিত। অধিকারী সাধকেরা তাহা হইতে সঞ্চয় করিয়া নিত প্রাণশক্তি। কেহ আসিত সাত্ত্বিক সংস্কারজাত স্বাভাবিক টানে, কেহ বা আসিত অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে।

নারিন্দিয়ার পুরন্দর ঘোষের জীবনে এই মহাপুরুষের বিভূতিলীলা সে-বার অপূর্ব্ব রূপান্তর আনিয়া দিয়াছিল। ঘোষ মহাশয় ছিলেন এক দুর্দ্দান্ত ধরণের মানুষ। ব্যবসায় কর্ম্মে টাকা রোজগার করিতেন প্রচুর, বিত্তবিষয়ও ছিল যথেষ্ট। তেমনি এই অর্থের অপব্যয়েও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এমন কোন পাপকার্য্য বা অপরাধ ছিল না যাহা

১ প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬৮—বিপ্লবীর জীবন দর্শন—পৃঃ ৯৩-৯৪

২ স্বাদেশিকতা ও মুক্তি-আন্দোলনে অনুরূপ সহায়তা দান অন্যান্য বিশিষ্ট যোগীদের বেলায়ও দেখা গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে আছেন অরবিন্দের সাহায্যকারী যোগী গঙ্গোনাথ আশ্রমের স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ছাড়োভির সাখড়িয়াবাবা, যতীন মুখার্জ্জীর আশীর্ব্বাদক ভোলাগিরি মহারাজ, সতীশ মুখোপাধ্যায়ের গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি।

তাঁহা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত না। এই পাষণ্ডীর জীবনে হঠাৎ সেদিন পতিত হয় ত্রিপুরলিঙ্গজীর কৃপারশ্মি।

কাজকর্ম্ম উপলক্ষে পুরন্দর ঘোষকে মাঝে মাঝে মেঘনা নদীর পথে যাতায়াত করিতে হয়। সেদিন বর্ষার রাতে নৌকাযোগে তিনি ভৈরব-বাজারে চলিয়াছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে শুরু হইল ঝড়ের তাণ্ডব। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মাঝিরা নৌকা বাঁচাইতে পারিল না, নদীর মাঝখানে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

মাঝি মাল্লারা আগেই ঝাঁপ দিয়াছে। অগাধ জলে পুরন্দর ঘোষ ছিট্‌কিয়া পড়িলেন। শুরু হইল তাঁহার আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস। অন্ধকারে কোথায় সাঁতরাইয়া উঠিবেন? কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, তীর কোন্‌দিকে বুঝিবার উপায় নাই। চারিদিকে কেবল ঢেউ আর ঢেউ। ঝটিকাতাড়িত হইয়া উন্মত্তের মত বারবার তাহা ছুটিয়া আসিতেছে, করিতেছে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত।

দেহ শ্রান্ত, অবসন্ন। এ অবস্থায় বেশীক্ষণ যুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। পুরন্দর বুঝিলেন, আজ আর প্রাণ বাঁচানো যাইবে না। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া নদীবক্ষে হাত পা এলাইয়া দিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে ঘটিল এক অলৌকিক কাণ্ড। চকিত দৃষ্টিতে পুরন্দর দেখিলেন, অদূরে নদীবক্ষে দণ্ডায়মান এক অনিন্দ্যকান্তি, শিবকল্প পুরুষ। ব্যগ্রস্বরে তিনি কহিতেছেন, "ওরে, একেবারে যেন গা ছেড়ে দিস্‌নে, তলিয়ে যাবি। এগিয়ে যা, দু পা সামনেই মাটি। সেখানে উঠে দাঁড়া। কোন ভয় নেই, আমি তো রয়েছি।"

পুরন্দর নব বলে উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকিতেই পায়ে ঠেকিল মৃত্তিকা। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন নদী-গর্ভে ডুবিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কে দিল এই নির্দ্দেশ? কোন্ দিব্যপুরুষ অলৌকিকভাবে হইলেন আবির্ভূত? কে তাঁহার এই প্রাণদাতা?

একটু স্থির হইতেই পুরন্দর ঘোষের মনে পড়িল—এ মূর্ত্তি তাঁহার পরিচিত। ঢাকার স্বামীবাগের যোগী ত্রিপুরলিঙ্গের সহিত এ মূর্ত্তির

সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাঁহার নারিন্দিয়া ভবনের দ্বিতল হইতে মাঝে মাঝে তিনি মহাত্মাকে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছেন। লোকমুখে তাঁহার অজস্র খ্যাতিও শুনা আছে। কিন্তু সাধু সন্তদের প্রতি চিরদিনই নিজে বিরূপ। তাই আশ্রমে গিয়া যোগীবরকে কোনদিন দর্শন করেন নাই। এবার নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, তিনি সত্যই এক যোগবিভূতিসম্পন্ন বিরাট মহাপুরুষ।

ঝড় জল থামিয়া গেল। বহুকষ্টে নদীমধ্যস্থ চড়া হইতে সাঁতরাইয়া পুরন্দর ঘোষ তীরে উঠিলেন।

ঢাকায় পৌঁছিয়াই সরাসরি চলিয়া গেলেন স্বামীজীর আশ্রমে। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি মহা পাষণ্ড নরাধম। তবু আমার ওপর আপনার কি অহেতুকী করুণা! সেদিন মেঘনার বুকে, ঝড় বাদলের মধ্যে আপনাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। আপনার আবির্ভাব আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি।"

ত্রিপুরলিঙ্গ মুচকি হাসিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "বেটা, তুমি এতো কাছে, এই নারিন্দায় রয়েছো, আর আমার সঙ্গে একটিবার দেখা করছোনা? সেই জন্যেই তো নিজে থেকে এগিয়ে গেলাম, ঝড়জলের ভেতরেই তোমার সাথে দেখা ক'রে এলাম।"

"মহারাজ, একটা কথা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। আমার মত দুর্ভাগার জীবন আপনি বাঁচালেন কেন?"

"হয়তো বড় কিছু সৌভাগ্য তোমার জীবনে আসবে ব'লে।"

"কৃপা ক'রে সব খুলে বলুন।"

"শোন পুরন্দর। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তুমি আবার ধিক্কারজনক জীবন যাপন করবে—পুতিগন্ধময় কূপে ডুবে থাকবে, এজন্য তোমায় বাঁচানো হয়নি। এর পেছনে গূঢ় ঐশী উদ্দেশ্য রয়েছে, আমি তারই সহায়কমাত্র।"

"সে উদ্দেশ্যটি কি, তা একটু জানতে ইচ্ছে হয়, মহারাজ।"

"তোমার ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রবল সাত্ত্বিক সংস্কার—

তোমার ভ্রান্ত, মায়াচ্ছন্ন, পাষণ্ডী জীবনের নীচে চাপা পড়ে আছে। প্রাণে বেঁচে উঠেছো। এবার ভোগ আর দুর্ভোগ দুই-ই ছেড়ে, শুরু কর ত্যাগের জীবন। বেটা, ঈশ্বরপ্রাপ্তির যোগ তোমার জীবনে রয়েছে, তা যে ফলতেই হবে।"

বাক্য তো নয়, চৈতন্যময় মন্ত্রবিশেষ। মহাপুরুষের কথা কয়টি পুরন্দর ঘোষের জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নূতন সুরঝঙ্কার তুলিয়া দিল। সারা দেহ হইয়া উঠিল পুলকাঞ্চিত। ভাবাবেশে প্রমত্ত হইয়া তিনি টলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, যে জীবনকে আপনি রক্ষা করেছেন, তার উদ্ধারের ভারও আজ আপনাকে নিতে হবে। আর আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছিনে। বিষয় আমার কাছে বিষ হয়ে গিয়েছে। আপনার আশ্রয়ে থেকে এবার শুরু করবো প্রাণপাত সাধনা। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।"

"তোমার জীবন আমি রক্ষা করেছি, উদ্দীপনাও জাগিয়ে তুলেছি। পরমাত্মার সে আদেশ আমার উপর ছিল। কিন্তু বেটা, আমি তোমার গুরু নই। তিনি রয়েছেন তীর্থরাজ প্রয়াগধামে। তুমি সেখানে গিয়ে তপস্যা কর, অভীষ্ট তোমার সিদ্ধ হবে।"

তীব্র বৈরাগ্যের অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে পুরন্দর ঘোষের জীবনে। স্বামীজীর ঐ কথা শুনার পর আর তিনি বিলম্ব করেন নাই। সেই রাত্রেই গৃহ-পরিবার, বিত্ত-বিষয় সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করেন, উপনীত হন প্রয়াগধামে। সেখানে ত্রিপুরলিঙ্গজীর কথিত গুরুর দর্শন অল্পকাল মধ্যে মিলিয়া যায়। পরমপ্রাপ্তির সাধনায় তিনি ব্রতী হইয়া পড়েন।

ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষদের সত্যকার পরিচয় ও মাহাত্ম্য নির্ণীত হয় ব্রহ্মজ্ঞদেরই স্বীকৃতির মাধ্যমে। ত্রিপুরলিঙ্গজীর পরিচয়ও বহুতর সিদ্ধ মহাত্মার কথায় ও আচরণে উদ্ঘাটিত হইতে দেখা গিয়াছে।

সে-বার স্বামীজী মহারাজের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এক মনোরম দৃশ্যপট

উন্মোচিত হয় উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী, ভোলাগিরিজীর আগমনে।

ত্রিপুরলিঙ্গজী কৃপাপরবশ হইয়া এক সময়ে তাঁহার স্বামীবাগ আশ্রমে কয়েকটি অনাথা তরুণীকে আশ্রয় প্রদান করেন। তাছাড়া, যে সব মহিলাভক্ত এখানে নিয়ত আসেন তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এজন্য একদল দুষ্ট লোক স্বামীজীর বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করিতে থাকে।

সে-বার ভোলাগিরি মহারাজ হরিদ্বার হইতে ঢাকায় আসিয়াছেন। শহরে তাঁহার শিষ্য, ভক্ত ও গুণগ্রাহীর সংখ্যা প্রচুর। চারিদিকে এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষকে নিয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। দর্শনপ্রার্থী জনতার স্রোত চলিয়াছে অবিরাম।

কর্ম্মব্যস্ত গিরিজী সেদিন তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য, ডাঃ নৃপেন বোসকে ডাকিয়া কহিলেন, "নৃপেন, এ শহরে এসে একবার যদি স্বামীবাগে না যাই, ত্রিপুরলিঙ্গ মহারাজকে দর্শন না করি, তা হলে বড় অন্যায় হবে। কাল ভোরেই একবার যেতে চাই। তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

ডাঃ নৃপেন বোস শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জন, জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার প্রতাপ প্রতিপত্তি খুব। কিছুদিন আগে কোন কুচক্রী লোক তাঁহার কাছে স্বামীজী সম্পর্কে জঘন্য নিন্দাবাদ করিয়াছে। ডাঃ বোস ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানেন না, কিন্তু লোকটির কথায় কিছুটা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল মাঝে মাঝে স্বামীজী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। চরিত্র নিয়া কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন না।

স্বামীজীর আশ্রমে যাওয়ার জন্য ডাঃ বোসের মোটেই ইচ্ছা নাই। কিন্তু কি করিবেন, গুরু মহারাজের আজ্ঞা—বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে হইল।

ভোলাগিরি মহারাজ আসিয়াছেন, স্বামীবাগ আশ্রমে সোরগোল পড়িয়া গেল। ত্রিপুরলিঙ্গজী সানন্দে আগাইয়া আসিয়া তাঁহাব মাননীয়

অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। দুই মহাপুরুষের মিলনে উত্থিত হইল দিব্য আনন্দের তরঙ্গ।

সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্নের পর ধর্ম্ম প্রসঙ্গের আলোচনা কিছুক্ষণ চলিল। অতঃপর ভোলাগিরি মহারাজ ডাঃ বোসের দিকে চকিতে একবার তাকাইয়া নিলেন। ইঙ্গিত করিলেন ত্রিপুরলিঙ্গজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার জন্য।

ডাঃ বোস প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গিরিমহারাজ সহাস্যে স্বামীজীকে কহিলেন, "মহারাজ, আপ্ এক দফে নাঙ্গা হো যাইয়ে তো।"

সমবেত ভক্ত ও শিষ্যেরা তো অবাক। ব্রহ্মবিদ্ ভোলাগিরিজীর মাথায় এ আবার কোন্ খেয়াল চাপিয়াছে? কে বুঝিবে তাঁহার এ অদ্ভুত আব্দারের তাৎপর্য্য?

"হাঁ হাঁ, মহারাজ, অভি ম্যঁয় হুকুম মান্ রহা হুঁ।"—বলিয়াই স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গ পরনের বহির্ব্বাস ও কৌপীন খুলিয়া ফেলিলেন। সর্ব্ব সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল মহাপুরুষের উলঙ্গ মূর্ত্তি।

ডাঃ নৃপেন বোস সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, বিরাটকায় স্বামীজীর পুরুষাঙ্গটি দেখিতে দেখিতে একেবারে সদ্যোজাত শিশুর লিঙ্গের মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল।

এই ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের সম্মুখে সকলে চিত্রার্পিতের মত বসিয়া আছেন। কাহারো মুখে কথা সরিতেছে না। আর এদিকে ডাঃ বোস মনে মনে আপনাকে দিতেছেন ধিক্কার। ছি ছি, এই শক্তিধর যোগীর চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া কি মহা পাপই না করিয়াছেন!

ক্ষণপরেই ত্রিপুরলিঙ্গ মহারাজ বালকের মত হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে অট্টহাসির রবে সারা আশ্রম উচ্চকিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বোসের দৃষ্টিগোচর হইল আর এক নূতন বিস্ময়কর দৃশ্য। স্বামীজীর পুরুষাঙ্গটি এবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক আয়তনকে কয়েক গুণ ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

এবার বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া ত্রিপুরলিঙ্গজী শান্ত হইয়া বসিলেন। ভোলাগিরি মহারাজ শিষ্যের দিকে হানিলেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। তারপর কহিলেন, "নৃপেন, অওর একদফে মহাত্মাজীকা প্রণাম দো। অভি হমলোগ ঘর চ'লে।"

ডাঃ বোসের অন্তরে এবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে অনুশোচনার আগুন। ভাবিতেছেন, তিনি মহা পাষণ্ডী। নতুবা এমন মহাপুরুষকে তিনি বৃথা কেন সন্দেহ করিবেন? কম্পিত দেহে আবার তিনি লুটাইয়া পড়িলেন স্বামীজীর চরণতলে।

ফিরিবার পথে গাড়ীতে বসিয়া ভোলাগিরিজী শিষ্যকে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই—'ছাখো তোমরা নিতান্ত মূর্খ, অল্পবুদ্ধি। অতীন্দ্রিয় লোকের, সূক্ষ্ম জগতের কোন তত্ত্বই জানোনা। তবে সাধু-মহাপুরুষদের অন্তর্জ্জীবনের রহস্য ও তাঁদের মাহাত্ম্য কি ক'রে বুঝবে? তাঁদের শক্তি বিভূতির পরিমাপ করার সামর্থ্যই বা তোমাদের মত অজ্ঞানদের কোথায়? বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে কখনো সাধুদের বিচার করতে যেয়ো না। মনে রেখো, তাতে নিজের অকল্যাণই ডেকে আনা হয়।"

ভোলাগিরি ও ত্রিপুরলিঙ্গের এই নাটকীয় সাক্ষাৎ সেদিন শুধু নিন্দুক ও ভ্রান্তবুদ্ধি মানুষদের সংশোধন করে নাই, স্বামীজীর শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যেও জাগায় উদ্দীপনা ও গুরুমহিমা উপলব্ধি করার প্রেরণা। গিরি মহারাজের সেদিনকার ঐ লীলারঙ্গের মধ্য দিয়া স্বামীজীর যোগশক্তির মাহাত্ম্য নূতন করিয়া প্রচারিত হয়, জনমনে তিনি পরিগ্রহ করেন পরম শ্রদ্ধার আসন।

দেড় শত বৎসরেরও অধিককাল এই শক্তিধর যোগী তাঁহার মরদেহে অবস্থান করেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহার করুণার ধারা উৎসারিত হয় অজস্র ধারায়, অপরূপ বর্ণ সমারোহের মধ্য দিয়া। শত শত আর্ত্ত আশ্রয়ার্থী ও মুমুক্ষু সেই করুণার প্রবাহে অবগাহন করে, জীবন-সাধনায় হয় কৃতকৃতার্থ।

হংসবাবা অবধূত

সেদিন শিবরাত্রি। আশ্রমে সারা দিনই চলিয়াছে ধ্যানভজন আর শাস্ত্রগ্রন্থের পারায়ণ। রাত্রি গভীর হইয়াছে, এইমাত্র ব্রহ্মসূত্রের পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ হইয়া গেল। স্বামী অনুভবদেব এবার সাধনকুটিরে গিয়া ধ্যানে বসিবেন।

এমন সময় একটি বালক তাঁহার সম্মুখে আগাইয়া আসিল, নিবেদন করিল সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

অপূর্ব্ব দর্শন এই বালক। যেন আগুনের ফুল্‌কি। অনুভবদেব প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বেটা, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। চারদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। এখনো কেন তুমি ঘরে ফিরে যাওনি? জানো তো, আশ্রমের আশেপাশে যে জঙ্গল রয়েছে তাতে মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়। আচ্ছা, বলতো, তোমার ঘর কোথায়? আমি বরং কাউকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি।"

"মহারাজ, তার দরকার নেই। আমি যে চিরদিনের জন্য ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। আপনার আশ্রমেই থেকে যেতে চাই।" বালক ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দেয়।

মহাত্মা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। "ঘর ছেড়ে বেরিয়েছো! তবে কি মা বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছো, বেটা? না পাঠকার্য্য তোমার ভালো লাগছে না? কি হয়েছে খুলে বল তো।"

"মহারাজ, সে সব কিছুই নয়। কোন ঝগড়াঝাটি ক'রে আমি ঘর ছাড়িনি। আমি এসেছি আমার মনের সঙ্কল্প নিয়ে। আমি সাধু হবো, শিউজীর চরণে চিরতরে উৎসর্গ করবো জীবন। আপনি আমায় কৃপা করুন, আশ্রয় দিন।"

নিষ্পলক নেত্রে স্বামী অনুভবদেব এই বালকের দিকে কিছুক্ষণ

তাকাইয়া রহিলেন। বুঝিলেন, পূর্ব্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার তাহার প্রবল। আর সে সংস্কারই আজ তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে ঘরের বাহিরে, দিয়াছে আত্মিক প্রেরণা! সহজে এ বালককে থামানো যাইবে না।

স্মিতহাস্যে মহাত্মা প্রশ্ন করিলেন, "বেটা, তোমার বয়স কত?"

"বারো বৎসর।"

"এই কচি বয়সে, সন্ন্যাসী হবার কথা কেন তুমি ভাবলে, বলতো? গৃহের আরাম, মা বাপের স্নেহ-আদর, সঙ্গীদের খেলাধূলার আসর, সব ছেড়ে কেন এ পথে পা বাড়াচ্ছো? তাছাড়া, বেটা, তোমার ধারণা নেই, আমি গুরু হিসেবে কত কঠোর হতে পারি।"

"মহারাজ আমি সামান্য বালক। আপনার মহিমা কি বুঝবো? তবে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। সম্প্রতি আমাদের ঘরে অতিথি হয়েছিলেন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী। কথাপ্রসঙ্গে বারবার তিনি বলেছেন, 'অমৃতসরের বেদান্তী-সাধু অনুভবদেবের তুলনা নেই। সারা পাঞ্জাবের তিনি গৌরবের বস্তু।' সন্ন্যাসীর কথা শুনে আপনার নাম চিরতরে আমার মনে গাঁথা হয়ে গেল। তারপর একবস্ত্রে, পদব্রজে বেরিয়ে পড়েছি আপনার আশ্রয়ের জন্য।"

"ছাখো বেটা, সাধুর জীবনের লক্ষ্য শুধু একটি, তা হচ্ছে ঈশ্বর-প্রাপ্তি। আর এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়। দেহবোধ, অহংবোধ নির্ম্মূল করতে হয়। তপস্যার তাপে দেহ মন, নিজের সব কিছু গলিয়ে ফেললে তবে মেশা যায় সেই পরম রসের সাথে। তুমি বালক, এখন এতো কথা বুঝবে না। কিন্তু আসল কথা —দেহের সর্ব্ব আরাম ছাড়তে হবে যদি সত্যকার সাধু হতে চাও। তা কি পারবে?"

গৃহত্যাগী বালককে এড়ানো সম্ভব হয় নাই। জীবনের সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়া পরম সুখ, পরম শান্তির অন্বেষণে সে আশ্রমজীবন গ্রহণ করে। চরম কৃচ্ছ্রসাধনা, স্বাধ্যায় ও যোগতপের মধ্য দিয়া

তাঁহার উত্তরণ ঘটে এক মহাবেদান্তী সন্ন্যাসীরূপে। হংসদেব অবধূত নামে সারা ভারতের অধ্যাত্মসমাজে তিনি পরিচিত হন। সাঁওতাল পরগণার যশিডিস্থিত কৈলাস পাহাড়ে স্থাপিত হয় এ সিদ্ধ মহাত্মার আশ্রম। শত শত মুমুক্ষু তাঁহার আশ্রয় লাভে ধন্য হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সিপাহী যুদ্ধের প্রায় সমকালে পাঞ্জাবের এক ক্ষুদ্র গ্রামে হংসবাবা আবির্ভূত হন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম। পিতা মাতা উভয়েই ছিলেন সাত্ত্বিক প্রকৃতির। আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না হইলেও অতিথি ও সাধু সজ্জনের সেবায় হংসবাবার পিতা মাতার প্রচুর উৎসাহ ছিল। গৃহে প্রায়ই সাধুসন্তেরা আগমন করিতেন। তাঁহাদের সান্নিধ্যে বসিয়া বালক হংসদেব একমনে শুনিতেন তীর্থভ্রমণের বহু বিচিত্র কথা, প্রাচীন সাধকদের মহিমা ও সিদ্ধাইর কথা। মন তাঁহার অজানা কল্পলোকের আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইত।

তখনকার দিনে এই সব পরিক্রমাকারী সাধুর মধ্য দিয়া সমাজের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইত অপার কল্যাণ। গ্রামবাসীরাও ছিল সরল, ভক্তিপরায়ণ ও অতিথিবৎসল। সাধু সজ্জন গ্রামে আসিলেই, যে যাহার সাধ্যমত আহার্য্য ও সেবার ব্যবস্থা নিয়া আগাইয়া আসিত।

উত্তরকালে হংসবাবা কথা প্রসঙ্গে বলিতেন, "ছাখো, আগেকার দিনে আমাদের গ্রামজীবন এখনকার মত এতো আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। দেশে প্রচুর খাদ্য ছিল। তার চাইতেও বেশী ছিল প্রাণের প্রাচুর্য্য। সাধুসেবা ও পরোপকারবৃত্তির স্থান ছিল সর্বোপরি। পাঞ্জাবের প্রতি গাঁয়েই ছিল এক সুন্দর নিয়ম। গাঁয়ের গৃহস্থেরা নিজেদের দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনখানা ক'রে রুটি তৈরি ক'রতো। প্রথমখানা সাধু সেবায়, দ্বিতীয়খানা অতিথি অভ্যাগতের জন্য এবং তৃতীয়খানা ধর্ম্মশালায় আগত ব্যক্তিদের জন্য থাকতো নির্দ্দিষ্ট। এই পরিবেশে আমরা ছোটবেলায় বর্দ্ধিত হয়েছি। কাজেই সাত্ত্বিকতা স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা সংক্রামিত হয়েছিল বালককাল থেকে।"

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, বৃহৎ এক বটবৃক্ষের নীচে মাঝে মাঝে ছাউনী পড়িত নাগা সন্ন্যাসীদের। কি এক অজানা আকর্ষণে হংসদেব এই উলঙ্গ, সংসার-বিরক্ত সাধুদের কাছে ছুটিয়া আসিতেন। সোৎসাহে লাগিয়া যাইতেন তাঁহাদের গঞ্জিকা ও চরস যোগাড়ের কাজে। গ্রামের বাড়ী বাড়ী হইতে ঝুড়িভর্ত্তি রুটি তরকারী হালুয়া চাহিয়া আনিয়া পরিতোষ সহকারে তাঁহাদের ভোজন করাইতেন। সর্ব্বত্যাগী, ঈশ্বর-পথিক এই সাধকদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালক হংসদেব বিস্মৃত হইতেন তাঁহার ঘর-বাড়ী আত্মীয় স্বজন ও খেলাধূলার প্রিয় সঙ্গীদের।

এমনি সময়ে সেবার এক সন্ন্যাসীর কাছে তিনি শুনিতে পান অমৃতসরের ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ অনুভবদেবের কথা। পরদিনই সবার অলক্ষ্যে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন। তারপর দীর্ঘ পথ এই অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হন এই অশ্রমে। ভাগ্যবলে লাভ করেন মহাত্মার চরণাশ্রয়।

নবাগত বালককে অনুভবদেব তাঁহার আশ্রমে ভর্ত্তি করিয়া নিলেন। এখানকার কাজকর্ম্মের দায়িত্ব অনেক। বিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনা অতিথি অভ্যাগতের সেবা তো আছেই, তদুপরি রহিয়াছে বহু আশ্রমিকের আহার্য্য তৈরীর কাজ। আশ্রমে গরু মহিষ থাকে কয়েক শত, এগুলির তত্ত্বাবধানও কম কষ্টকর নয়।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে শুরু হয় নূতন ব্রহ্মচারীর নিত্যকার কাজ-কর্ম্ম। ধ্যান জপ, স্বাধ্যায়ের শেষে সে বাহির হইয়া পড়ে গোচারণে। ফিরিয়া আসিয়াই লাগিতে হয় বহু লোকের রসুই, পরিবেশন ও থালা বাসন পরিষ্কারের কাজে। রাত্রে সাধন ভজন ও আশ্রমের কাজ শেষ করিয়া যখন সে শয়ন করিতে যায়, শরীর এলাইয়া পড়ে চরম অবসন্নতায়। এমনি করিয়া চলিতে থাকে তাহার নূতন জীবনের দিনচর্য্যা।

কয়েক বৎসর অতীত হওয়ার পর আচার্য্য এ নবীন ব্রহ্মচারীকে

কহিলেন, "বৎস, আশ্রমের কাজে তুমি এতদিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছো, তাতে আমি সন্তোষ লাভ করেছি। এবার থেকে তোমায় বেদান্তের পাঠগ্রহণ করতে হবে। পণ্ডিত কালা সিং হচ্ছেন এই অঞ্চলের বেদান্তীদের অগ্রগণ্য, আমার অত্যন্ত অনুগত ব্যক্তি। আমি তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিচ্ছি, তিনি তোমায় জ্ঞানশাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ দেবেন। তুমি তাঁকে শিক্ষাগুরুর পদে বরণ কর, জ্ঞানমার্গীয় সাধনার ভিত্তিকে আরো দৃঢ় ক'রে তোল।"

এই স্বনামধন্য পণ্ডিতের কাছে হংসবাবা কয়েক বৎসর পাঠ গ্রহণ করেন। অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভাবলে আয়ত্ত করেন বেদান্তের জটিল তত্ত্বসমূহ।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন মহাত্মা অনুভবদেবের তিরোধান ঘটে। নবীন ব্রহ্মচারীর বুকে শোকের এ আঘাত বাজে শেলের মত। অধীর হইয়া ভাবিতে থাকেন, আত্মিক জীবনের যে সাধনাকে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া আছেন আজ কে তাহার পথ নির্দ্দেশ দিবে? মুমুক্ষার আগুন বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কে তাহাতে ঢালিবে অমৃত বারি? উন্মাদের মত নানা মঠে, মন্দিরে ও তীর্থস্থানে দিনের পর দিন তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন।

তারপর সেদিন এক নির্ব্বাণী আখড়ায় হীরানন্দ অবধূতের দর্শন মিলে। এ মহাত্মার কৃপায় লাভ করেন সন্ন্যাসদীক্ষা। সন্ন্যাস-নাম হয় হংসদেব অবধূত, কিন্তু উত্তর জীবনে জনসমাজে প্রখ্যাত হইয়া উঠেন হংসবাবা নামে।

মহাত্মা হীরানন্দ এক প্রসিদ্ধ আত্মজ্ঞানী সাধক, ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। নবীন শিষ্য হংসবাবাকে তিনি কহিলেন, "বেটা, খুব আনন্দের কথা, এতকাল নিষ্ঠাভরে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছো, এগিয়ে এসেছো নিবৃত্তিমার্গের পথে। এবার বারো বৎসরের জন্য তুমি পরিব্রাজনে বহির্গত হও। কিন্তু এই সময়ে দুটি ব্রত তোমায় পালন

করতে হবে। কখনো গৃহস্থ ভবনে রাত্রিবাস করবে না, আর থাকবে অযাচক বৃত্তি নিয়ে। কোন অবস্থাতেই কারো কাছে ভিক্ষা চেয়োনা, পরমাত্মার কৃপায় আপনা হতে যা আহার্য্য আসবে, তাই দিয়েই করবে দিন গুজরান।"

"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। এ আজ্ঞা আমি প্রাণপণে পালন করতে চেষ্টা করবো।"

"বেটা, সদাই স্মরণ রেখো, তোমার পরমপ্রাপ্তি নির্ভর করছে বৈরাগ্য সাধনের উপর। চরম কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন ক'রে থাকো, আর দেহবুদ্ধি বিলুপ্ত করার *জন্য* কর সর্ব্বস্ব পণ। আশীষ জানাই, তোমার এতদিনের সাধনা জয়যুক্ত হোক, আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক হৃদয় কন্দরে।"

গুরুর বাক্য হংসবাবার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায়। পরিব্রাজক-জীবনে-নির্দ্দেশগুলি তিনি পালন করেন অপার নিষ্ঠায়। কৌপীনবস্ত, তিতিক্ষাবান এই সন্ন্যাসীর হাতে এসময়ে একটি কমণ্ডলুও দেখা যায় নাই। যে মাটির পাত্রে জল পান করিতেন পরদিন আর সেটিকে ব্যবহার করিতে দেখা যাইতনা।

হিমালয়ের উচ্চতর প্রদেশে অনেক বার তাঁহাকে প্রচণ্ড শীতে কাটাইতে হইয়াছে। এ সময়কার কৃচ্ছ্র সাধনার প্রসঙ্গে বলিতেন—"গুরু আমার বড় কৃপালু ছিলেন। দেহবোধ বিনষ্ট করার জন্য চরম পরীক্ষার মধ্যে আমায় নিয়ে গিয়েছেন। কৃপাবলে বারবার করেছেন উত্তীর্ণ নানা বিপর্য্যয়ের হাত থেকে। কৌপীনসম্বল হয়ে উত্তরাখণ্ডে কত ঘুরেছি। এক একদিন হিমপ্রবাহ তীব্র হয়ে উঠতো, বাইরে অবস্থান করা অসম্ভব হতো। তখন সাধনার উৎসাহ প্রচণ্ড, কোন কিছুর দিকেই ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। কোন কোন দিন এমনও হয়েছে—বৃক্ষতলে পত্রস্তূপের ওপর শয়ন ক'রে আছি, আর শিয়রে মাটির ভাণ্ডে যে পনীয় জল রাখা হয়েছিল রাত্রের শৈত্যে তা একেবারে বরফ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ শৈত্য আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে

পারেনি। মাসের পর মাস বরফান পাহাড়ে বাস করার ফলে গাত্রচর্ম্ম হয়ে গিয়েছিল পুরু ও বিবর্ণ। সমতলের লোক হঠাৎ আমায় দেখলে স্বাভাবিক মানুষ ব'লে ভাবতে পারতো না।"

গুরুর আজ্ঞায় হংসবাবা বারো বৎসর বৈরাগ্যময় পরিব্রাজক জীবন যাপন করেন। অযাচিতভাবে যখন যেটুকু ভিক্ষায় মিলিত তাহা দিয়াই করিতেন জীবন ধারণ। বৎসরের পর বৎসর একটি দিনও রন্ধন করেন নাই, আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াও ভোজন করেন নাই।

'হরিহর' বলিয়া ধ্বনি দিয়া হংসবাবা গৃহীদের দ্বারে প্রতিদিন একবার উপস্থিত হইতেন। কখনো মিলিত ভোজ্যদ্রব্য, কখনো বা ভর্ৎসনা বা শ্লেষোক্তি। কিন্তু এই তিতিক্ষাবান সন্ন্যাসীর কাছে নিন্দাস্তুতি দু-ই ছিল সমান। জাগতিক কোন আচার আচরণের দিকেই তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না। বিশ্বের সকল কিছুই তাঁহার দৃষ্টিতে ছিল বিনাশশীল প্রপঞ্চ বা মায়া।

অরণ্যে, পর্ব্বতে পরিব্রাজনের সময় তাঁহাকে বারবার হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু তপঃনিষ্ঠ সাধক অলৌকিক ভাবে প্রতিবারই প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

সেবার তিনি কুমায়ুনে নন্দাদেবী পাহাড়ে পর্য্যটন করিতেছেন। অরণ্যের মধ্যে দেখিলেন এক পরিত্যক্ত পর্ণকুটির। বোধহয় কোন সাধু ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং কিছুদিন এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন। পরমানন্দে এই কুটিরে হংসবাবা দীর্ঘদিন অবস্থান করেন, ডুবিয়া থাকেন নিরন্তন ধ্যানে।

মাঘের হাড়কাঁপানো শীতে হংসবাবা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ধ্যানাবিষ্ট থাকিতেন। গ্রীষ্মের অনলবর্ষী রৌদ্রকর, বর্ষার ঝড় তাণ্ডব, মাথার উপর দিয়া কখন চলিয়া যাইত, সেদিকে তাহার হুঁস ছিলনা। সর্ব্ব অবস্থায়ই তিনি থাকিতেন নিরাসক্ত ও সদা প্রসন্নমূর্ত্তি।

এ সময়কার বৈরাগ্যময় জীবন ও তপস্যার প্রসঙ্গে উত্তরকালে

তাঁহার কাছে অনেক গল্প শুনা যাইত। কহিতেন, "তখন ছিল আমার —গুজর্ গেই গুজরান্, কেয়া ঝোপ্রি কেয়া ময়দান—এই অবস্থা। রাত প্রায়ই আমার কাটতো নক্ষত্রখচিত মহাকাশের উদার আশ্রয়ে। বৃক্ষতলে শুকনো পাতার শয্যায় শুয়ে কত যে রাত যাপন করতে হয়েছে তার ঠিক নেই। হিংস্র জীবজন্তুর উপদ্রব বেশী যেখানে, সেখানে রাত কাটাতাম বৃক্ষ শাখায়। নীচে জ্বলতো খড়কুটোর ধূনি দিনের পর দিন, এমনিভাবে গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধন ও ব্রহ্মাভ্যাস আমায় অনুষ্ঠান করতে হতো।"

আসমুদ্র হিমাচলের প্রায় সবগুলি প্রধান তীর্থ হংসবাবা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান। একবার পর্য্যটন করিতে করিতে ভারতের বাহিরে আফ্গানীস্থানে তিনি গমন করেন। কাবুল হইতে কিছু দূরে একটি নির্জ্জন পার্ব্বত্য অঞ্চল তাঁহার মনকে বড় আকৃষ্ট করে। এখানে প্রায় দেড় বৎসর তিনি ধ্যান ভজনে অতিবাহিত করেন।

এই হিন্দু যোগীর খ্যাতি অচিরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। দূর গ্রামাঞ্চল হইতে আফগানরা তাঁহার দর্শনের জন্য আসিতে থাকে। আখ্রোট, বাদাম, কিসমিস প্রভৃতি তাহারা শ্রদ্ধার সহিত হংসবাবাকে ভেট দিত। আর তাঁহার কৃপার ধারা ঝরিয়া পড়িত দুঃখক্লিষ্ট গ্রাম্য জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে। কেহ যোগীর কাছে পাইত রোগমুক্তির আশীর্ব্বাদ, কেহ বা দুঃখ শোকের সান্ত্বনা। কিন্তু জনসমাগম বাড়িতে থাকায় হংসবাবার সাধন ভজনে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তাই হঠাৎ একদিন সেখান হইতে সরিয়া পড়েন।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর আবার তিনি আসিয়া উপস্থিত হন হিমালয়ে। নাগাধিরাজ হিমালয় ও পবিত্র নর্ম্মদার তীর বরাবরই ছিল হংসবাবার পরম প্রিয়। এই দুই স্থানে তাঁহাকে দীর্ঘদিন গভীর তপস্যায় রত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

সে-বার কিছুদিন উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে তিনি পরিব্রাজন

করিতেছেন। এ স্থানে ব্যাঘ্রের বড় উপদ্রব। সেদিন ধ্যানভজনের শেষে হংসবাবা জানালা খুলিয়াছেন, দেখেন কুটিরের অঙ্গনে একটা নরখাদক বাঘ উপবিষ্ট। মানুষের গন্ধ সে পাইয়াছে, তাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করিয়া আছে, কখন তাহার শিকার ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবে।

গৃহের জানালায় একটি নিরস্ত্র সাধু, আর বাহিরে লুব্ধনেত্র হিংস্র ব্যাঘ্র। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

হংসবাবা ভাবিলেন, যে পরমাত্মার ধ্যান তাঁহার নিজের ভিতর করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারই অনুকম্পন চলিয়াছে ঐ ব্যাঘ্রের প্রাণ-শক্তিতে। তবে দুইয়ের ভিতরে তফাৎ কোথায়? মনে এই চিন্তা খেলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের দুয়ার খুলিয়া দিলেন। সম্মুখে তাঁহার দৃপ্ত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট ব্যাঘ্রপুঙ্গব, চোখ দুইটি ভাঁটার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

হংসবাবা আগাইয়া গিয়া করজোড়ে কহিলেন, "মহাত্মন, আমার ও আপনার ভেতর তো সত্যকার কোন পার্থক্য নেই। একই পরমাত্মা স্পন্দিত হচ্ছেন দুই ভিন্ন দেহে। তবে কেন আমাদের মধ্যে বৈরিতা থাকবে?"

মানবীয় ভাষায় উচ্চারিত এই উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাঘ্র উপলব্ধি করিল কিনা, কে বলিবে? কিন্তু দেখা গেল, নর মাংসের লোভ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা এক শান্তশিষ্ট গৃহপালিত পশুর মত সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

আর একবারের কথা। একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী জমায়েতের সঙ্গে হংসবাবা মধ্যপ্রদেশের অরণ্যাঞ্চলে পথ চলিতেছেন। হঠাৎ দেখা দিল এক বৃহদাকার ব্যাঘ্র। বনভূমি কম্পিত করিয়া বারবার উহা গর্জ্জন করিতেছে, আর রোষকষায়িত নেত্রে তাকাইতেছে।

এ সময়ে দলের একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অকুতোভয়ে বাঘটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "বাপুহে, তুমি শান্ত হও। এই ছাখো

তোমার ভোজনের জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করছি। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর ক'টা দিনই বা বাঁচবো? আমায় গ্রহণ ক'রে আমার এই সঙ্গীদের তুমি ছেড়ে দাও।"

কি জানি কেন ব্যাঘ্রটি এই সহজলভ্য শিকার গ্রহণ করে নাই। ক্রুদ্ধ গর্জ্জন তাহার ধীরে ধীরে থামিয়া যায়। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রাচীন সন্ন্যাসীটির দিকে তাকাইয়া থাকার পর নতমস্তকে বনের আড়ালে অন্তর্হিত হয়।

ঐশ্বরীয় কৃপা ও আত্মসমর্পণের দীপ্তিতে হংসবাবার পরিব্রাজক জীবনের এই ঘটনাগুলি সমুজ্জ্বল।

সে-বার তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েকটি সন্ন্যাসী সঙ্গীসহ কামাখ্যা পাহাড়ে আসিয়াছেন। সারাদিন দীর্ঘ পথ চলিতে হইয়াছে, তদুপরি এই পাহাড়ের চড়াই। সবারই দেহ একেবারে অবসন্ন। রাত্রে দেবী দর্শন করিয়া আসিয়াই কিঞ্চিৎ ফলমূল তাঁহারা ভোজন করিলেন। তারপর গা এলাইয়া দিলেন বৃক্ষতলে।

এই দিনকার এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হংসবাবা ভক্তদের কাছে সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"আমরা শয়ন করতে না করতেই এক হিংস্র বাঘ সেখানে এসে উপস্থিত। তখন ঐ অঞ্চলে বাঘের বড় উৎপাত ছিল। আগুন না জ্বালিয়ে কেউ বাইরে শুতে পারতো না। আমার সঙ্গীরা সবাই ছিল পথশ্রমে কাতর। আগুন জ্বালানোর তর সয়নি, কম্বল জড়িয়ে সবাই শুয়ে পড়েছে। এমন সময় একটা বাঘ গম্ভীরভাবে আমাদের শয্যার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। চুপচাপ এদিক ওদিক তাকিয়ে বিজ্ঞের মত সে কি যেন দেখছে।

"সঙ্গীদের একজনের হঠাৎ চোখে পড়লো এই ব্যাঘ্র পুঙ্গবের উপর। উচ্চ স্বরে সে বলে উঠলো দলের প্রধান সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য ক'রে, 'মহারাজ, একদফে উঠ্ যাইয়ে। দেখিয়ে—শের আয়া। একদম জমায়েজমে ঘুস্ গিয়া।'

"প্রবীণ সন্ন্যাসীটি ততক্ষণে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগের আয়োজন করেছেন। শায়িত অবস্থায়ই তিনি কৌতুক ক'রে বললেন, 'আনে দো ভাই, উনকো সাথ বাৎচিৎ করনেকে ফুরসৎ নহি হ্যায়। অভি জমায়েতমে হি উন্‌কো ভর্ত্তি কর লো।'

"দলপতি সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত আরামে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। আমরাও সবাই রয়েছি চিত্রার্পিতের মত। হঠাৎ বাঘটির সুবুদ্ধির উদয় হ'ল কেন, কে জানে? এক লাফে সামনের একটা খাদ পেরিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের ভেতর কারুর কোন চাঞ্চল্য দেখা যায়নি এই নরখাদক বাঘের আবির্ভাবে। ক্ষণপরে সবাই নাক ডাকিয়ে অভিভূত হলেন নিদ্রায়।

"পরিব্রাজন কালে গুরুশক্তি ও আত্মসমর্পণ যোগ এমনি করেই বরাবর আমাদের রক্ষা করেছে, এনে দিয়েছে আত্মিক জীবনে নূতন প্রেরণা। আর পরমাত্মার অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস আমাদের দিনের পর দিন অটুট হয়ে উঠেছে।"

হিমালয়ের নিম্নভূমিতে সেবার হংসবাবা পর্য্যটন করিতেছেন। এসময়ে একটি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন। বনে জঙ্গলে, রোদে বৃষ্টিতে বাবা ঘুরিতেছেন, আচ্ছাদনের অভাবে কতই না তাঁহার কষ্ট হইতেছে—একথা ভাবিয়া ভক্তটি কহিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার জন্য একটি ছোট সরকারী তাঁবুর ব্যবস্থা করেছি। যতদিন এই অঞ্চলে পরিব্রাজন করবেন, এটি আপনি ব্যবহার করুন। এখান থেকে যাবার সময় এটা ফেরৎ দিলেই চলবে।"

"না বাবা, আমি জংলী লোক, ইচ্ছেমত বন বাদাড়ে, যেখানে সেখানে দিন কাটাই। এ সরকারী তাঁবু হারিয়ে শেষটায় কি বিপদে পড়বো? এ দিয়ে আমার কাজ নেই।" উত্তর দেন হংসবাবা।

"সেজন্য আপনার চিন্তা নেই, মহারাজ। আমি আমার অধীনস্থ এক চৌকিদারকে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে। সব সময় সে আপনার সঙ্গে

থাকবে, এই তাঁবুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আপনাকে আমার এ সেবার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করতেই হবে। নইলে কাজকর্ম্ম ছেড়ে আমাকেই চলতে হবে আপনার সঙ্গে।”

এই নির্ব্বন্ধাতিশয্য এড়ানো যায় নাই। হংসবাবাকে ঐ সরকারী তাঁবুটি বাধ্য হইয়া নিতে হয়। চৌকিদারও সঙ্গে চলে।

বাবা রাত্রে কাহাকেও নিজ শয়নকক্ষে কখনো থাকিতে দেন না। কারণ মধ্যযামে নানা যোগক্রিয়া তাঁহাকে করিতে হয়। এবার এই সরকারী পাহারাদারকে নিয়া তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। লোকটি রাত্রে কিছুতেই তাঁবুর বাহিরে থাকিতে রাজী নয়, কারণ, সে জানে—এই অরণ্য হিংস্র পশুতে ভরা।

অগত্যা হংসবাবাকে শয়ন ব্যবস্থা পাল্টাইতে হইল। এখন হইতে চৌকিদারকেই শয়ন করিতে দিতেন তাঁবুর ভিতরে, আর নিজে থাকিতেন পূর্ব্ববৎ বৃক্ষতলে।

ঐ অঞ্চলের পরিব্রাজন শেষ করিয়া যখন তিনি ভক্ত সরকারী কর্ম্মচারীটির কাছে ফিরিয়া আসেন, তখন কিন্তু তাহাকে এ বিষয়ে কিছু জানিতে দেন নাই। কারণ, আসল কথা ফাঁস করিলে তাঁবু-রক্ষক লোকটির আর রক্ষা থাকিত না। মানবীয় প্রেমের এই প্রকাশ বরাবরই হংসবাবার জীবনে দেখা গিয়াছে।

একাদিক্রমে বারো বৎসর হংসবাবা পরিব্রাজন করিয়া বেড়ান। সেই সঙ্গে উদ্‌যাপন করেন চরম কৃচ্ছ্র ব্রত ও বৈরাগ্যময় তপস্যা।

অতঃপর স্বামী হীরানন্দ অবধূতের সকাশে তিনি ফিরিয়া আসেন। এবার গুরুর পুণ্যময় সান্নিধ্যে থাকিয়া সমাপ্ত করেন ব্রহ্ম-অভ্যাসের সাধনা, পরমাত্মবোধ স্ফুরিত হইয়া উঠে তাঁহার সাধনসত্তায়।

স্বামী হীরানন্দ কহিলেন, “বৎস, তুমি আপ্তকাম হয়েছো। হয়েছো সর্ব্বপাশমুক্ত অবধূত। এবার পাশবদ্ধ জীবের কল্যাণে তোমায় কিছু কাজ করতে হবে। শুরু করতে হবে আচার্য্য জীবন।”

গুরুর চরণে প্রণতি জানাইয়া হংসবাবা বাহির হইয়া পড়িলেন।

তারপর কয়েক বৎসর নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সাঁওতাল পরগণার যশিডিতে আসিয়া স্থাপন করেন তাঁহার সাধন-আশ্রম।

দূরে দিকচক্রবালে মাথা উঁচাইয়া আছে ত্রিকূট, তপোবন ও দিগ্‌রিয়া পাহাড়ের চূড়ার পর চূড়া। আরো দূরে, আকাশের বুকে তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে পরেশনাথ পর্ব্বতমালার অস্ফুট রেখাচিত্র। এই পটভূমিকায়, যশিডির এক প্রান্তে, ক্ষুদ্র পাহাড়ের শৃঙ্গে স্থাপিত হয় হংসবাবার ঐ আশ্রম। এখানকার নিভৃত পরিবেশে বসিয়া জ্ঞানতপস্বী তাঁহার সাধন জীবনের কল্যাণধারা বিস্তারিত করিতে থাকেন। ভক্তেরা শ্রদ্ধাভরে আশ্রমটির নাম দেয়—কৈলাস।

বৎসরের কয়েক মাস হংসবাবা এই আশ্রমে অবস্থান করিতেন, আর বাকী সময় কাটাইতেন নর্ম্মদার তীরে নিভৃত পর্ণকুটিরে।

গোড়ার দিকে আশ্রমে একটি কাঁচা ঘর ছাড়া আর কিছু ছিল না। বাবা কাহারও সাথে এক কুটিরে রাত্রিবাস করিতেন না,—কখনো কোন সন্ন্যাসী বা অতিথি অভ্যাগত আসিলে নিজের কুটিরটিই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেন। পরমানন্দে রাত কাটাইতেন প্রাঙ্গণে।

রান্নাঘর তৈরী করার মত স্বচ্ছলতা তখনো এ আশ্রমের হয় নাই। তাই বাবার রসুই হইত উন্মুক্ত স্থানে। এক এক দিন ঝড় বাদলের তাণ্ডবে উনুনে আগুন জ্বালানো যাইত না। রান্না সেদিন বন্ধ থাকিত, বাবা দিন কাটাইতেন উপবাসী থাকিয়া।

একবার বর্ষার সময় আশ্রমের কুটিরের চাল দিয়া জল পড়িতে থাকে, ঘরের তৈজসপত্র সব একেবারে ভিজিয়া যায়। সারা রাত একটি ছাতা মাথায় দিয়া হংসবাবা নিরুদ্বেগে বসিয়া থাকেন। রাত্রি এভাবেই প্রভাত হয়।

পরদিন এক মহিলা ভক্ত আসিয়া অনুযোগ দেন, "আচ্ছা বাবা, এ আপনার কি কাণ্ড বলুন তো। সারা রাত আপনি বসে কাটালেন! এতো সব ধনী ভক্ত আপনার কাছে আসা-যাওয়া করে, তাদের একটু বললেই তো আশ্রমের জন্য এখনি একটা পাকা বাড়ী উঠতে পারে।

তাহলে আপনাকে আর দিনের পর দিন এতো কষ্ট করতে হয় না।"

মহাপুরুষ উত্তরে বলেন, "কেন মাঈ, আমি বেশ আনন্দেই তো রাতটা জেগে কাটিয়েছি। বৃষ্টি বাদলে আমার কি করতে পেরেছে? আমার শরীরের হয়তো একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমি তো আর শরীর নই?"

ইহার পর আর কি কথা চলিতে পারে? ভক্ত মহিলাটি নিরুত্তর হইয়া আত্মজ্ঞানী মহাতাপসের দিকে চাহিয়া থাকেন।

আশ্রমের দুরবস্থা বেশী দিন থাকে নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে একটি দোতলা কুঠি ও পাকা ইঁদারা এই পাহাড়ে নির্ম্মিত হয়।

কৈলাস পাহাড়ে আগে সাপের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। সে-বার এক ব্রহ্মচারী হংসবাবার আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। সাধন ভজনে তাঁহার বড় নিষ্ঠা, অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাবার প্রিয় হইয়া উঠেন।

রোজ শেষ রাত্রে ব্রহ্মচারী শয্যা ত্যাগ করেন। স্নান তর্পণাদি সারিয়া জপ তপ ও ধ্যানে বসেন। সেদিন রাত থাকিতেই এক মাইল দূরস্থিত কুতুনিয়া নদীতে তিনি স্নান করিতে যাইতেছেন। পাহাড় হইতে অর্দ্ধপথে নামিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় কাণে বাজিল হংসবাবার সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, "ব্রহ্মচারী, হুঁসিয়ার!"

ব্রহ্মচারী তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মাটির নীচের দিকে চোখ পড়িতেই দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক বিষধর সাপ তাঁহার সম্মুখে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সরোষে করিতেছে ফোঁস ফোঁস শব্দ।

হস্তস্থিত দণ্ড উঠাইয়া সাপের মাথায় সজোরে আঘাত করিতে যাইবেন, এমন সময় আবার শোনা গেল নেপথ্যের নিষেধবাণী, "উসকো মৎ মারো।"

হাতের দণ্ড হাতেই রহিয়া গেল। ব্রহ্মচারী পাথরের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন সর্পের সে

উত্তেজনা আর নাই, ফণা নামাইয়া ধীরে ধীরে উহা পাশের এক খাদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায় দিনের বেলায়ও সাপ লোকের নজরে পড়ে না। অথচ দূরে পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া কি করিয়া হংসবাবা উহা লক্ষ্য করিলেন, তাহা বিস্ময়কর। পরদিন এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "হম্ কেয়া জানে? ইয়ে সব পরমাত্মাকো ইচ্ছা।"

এমনি সহজ নির্লিপ্তির সহিত হংসবাবা মহারাজ তাঁহার অলৌকিক বিভূতির ঐশ্বর্য্য বহন করিয়া চলিতেন।

এক ভক্ত সেদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা বাবা, এই জংলা জায়গায়, এতো সাপ বাঘের মধ্যে আপনি কি ক'রে বাস করেন? আপনার কি ভয় ক'রে না?

সহাস্যে মহাপুরুষ উত্তর দেন, "বেটা সাপ বাঘ আর সাধু—এরাই বনের আসল অধিবাসী, কাজেই আমার দিক থেকে ভয় করার তো কিছু নেই।"

কৈলাস পাহাড়ের আশ্রমে হংসবাবাকে ঘিরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে ভক্ত শিষ্যদের একটি বৃহৎ মণ্ডলী। ক্রমে ভীড় জমিতে থাকে আধিব্যাধি পীড়িত আর্ত মানবের। হংসবাবা নিজে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তদুপরি ছিল তাঁহার যোগশক্তির প্রভাব। কাজেই তাঁহার আশ্রমে রোগীরা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইত। দৈহিক ব্যাধির হাত হইতে তাহাদের অনেকে লাভ করিত মুক্তি। নিজ আশ্রমে বসিয়া এই কল্যাণব্রত হংসবাবা দীর্ঘদিন উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দিব্যকান্তি, আনন্দময় এই মহাপুরুষের চারিপাশে সদা বিস্তারিত হইত আশা, আশ্বাস ও আনন্দ। তাঁহার শ্রীমুখের 'হরিহর' ধ্বনি লোকের জীবনে বুলাইয়া দিত শান্তি ও অমৃতের প্রলেপ। আগন্তুকেরা

প্রণাম নিবেদন করিলে তিনি বলিয়া উঠিতেন 'হরিহর।' ভক্তদের প্রাণে এই ধ্বনি জাগাইয়া তুলিত উদ্দীপনা।

কাহারো কোন আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করিতে হইলে বাবা বলিতেন—'উহ্ হরিহরমে মসগুল হো গিয়া।' কাহারো মৃত্যু হইলে তাঁহার মুখে শুনা যাইত—'উসকো হরিহর হো গিয়া।'

হংসবাবার ঋদ্ধি সিদ্ধির এক বিশেষ প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার কুম্ভমেলার আখড়ায়। মেলা প্রাঙ্গণে নির্ব্বাণী সাধুর গৈরিক ঝাণ্ডা উড়াইয়া স্বমহিমায় তিনি অধিষ্ঠিত থাকিতেন। দলে দলে আসিয়া জুটিত তাঁহার বাঙ্গালী, গুজরাটি ও মারাঠী শিষ্যেরা। আর আসিত বহু জানিত ও অজানিত সাধু সন্ন্যাসী অভ্যাগত। নিত্য সেখানে দেওয়া হইত ভাণ্ডারা। দিয়তাং ভুজ্যতাং—চলিত দিনের পর দিন।

সাধু-সন্ন্যাসীরা আখড়ায় ভিক্ষা করিতে আসিলেই মহাপুরুষ আগাইয়া আসিতেন। 'আও মেরে নারায়ণ' 'আও মেরে প্রাণ' বলিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান জানাইতেন। প্রতি বেলায় পাত পড়িত হাজায় হাজার মানুষের। কোথা হইতে টাকা কড়ি আসিত, এত লোকের আটা ময়দা, ঘি, চিনি যোগাড় হইত, কি করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে সমাধা হইত এ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তাহা সকলেরই কাছে ছিল বিস্ময়কর।

কোন কোন ভক্ত মন্তব্য করিতেন, "বাবা, আপনি কোন সঞ্চয়ই কখনো রাখেন না, অথচ আপনার আখড়ায় এত লোকের ভাণ্ডারা দেওয়া হচ্ছে কি ক'রে, তা ভেবে পাইনে। এ নিশ্চয়ই সম্ভব হচ্ছে আপনার যোগ বিভূতির গুণে।"

হংসবাবা সহাস্যে উত্তর দিতেন, "দ্যাখো, এখানকার সবই হচ্ছে পরমাত্মার ইচ্ছায়।"

সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ আবৃত্তি করিতেন তাঁহার প্রিয় দোঁহা

সাঁঞি সবকো দেত্ হ্যায়, পোখিত হ্যায় দিন রয়েন্
লোক নাম মের কহে তা'তে নীচে নয়েন।

অর্থাৎ, পরমেশ্বরই সবাইকে করেছেন পোষণ, অথচ লোকে করছে রটনা যে, আমিই হচ্ছি দাতা। এ জন্য নয়ন আমার লজ্জানত।

হরিদ্বার, নাসিক, প্রয়াগ প্রভৃতি কুম্ভস্নানের সময় হংসবাবার আখড়ায় বহু প্রবীণ ও শক্তিধর সন্ন্যাসীদের আগমন ঘটিত। হংসবাবা অবধূতকে ইঁহারা সকলেই বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখিতেন, দিতেন ব্রহ্মবিদের যোগ্য মর্যাদা।

হংসবাবার যশিডি পাহাড়ের আশ্রমটি ছিল জনজীবনের কোলাহল হইতে দূরে। নিস্তরঙ্গ মহাজীবনের ধারা নিঃশব্দে সদাই এই নিভৃত আশ্রমে থাকিত বহমান।

প্রতি সন্ধ্যায় এই পুণ্যস্থানে দেখা যাইত এক মিলন দৃশ্য। মুমুক্ষু ভক্তেরা এখানে আসিয়া সমবেত হইতেছে, বাবার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া হইতেছে কৃতার্থ। ভক্তদের আত্মিক কল্যাণের জন্য বাবারও ব্যগ্রতার সীমা নাই। মহাজ্ঞানী তাপস অপূর্ব্ব কৌশলে ব্যাখ্যা করেন জটিল তত্ত্বরাজী। বেদান্তের মর্ম্মবাণীকে সহজগ্রাহ্য করিয়া তোলেন কত মনোরম আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া।

সন্ধ্যার অস্তরাগ ছড়াইয়া পড়ে আকাশের গায়ে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। হংসবাবার গৌরকান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি রঞ্জিত হইয়া উঠে এই অপরূপ রাগে। ভক্তেরা একের পরে এক প্রণাম নিবেদন করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানী সাধকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় উদ্দীপনাময়ী

শিবোঽহম, শুদ্ধোঽহম, নিরঞ্জনোঽহম, নির্বিকারোঽহম!

সারা কৈলাস পাহাড়ের পরিমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে শিবকল্প এই মহাপুরুষের ধ্বনিতরঙ্গ। মুগ্ধ বিস্ময়ে, নির্নিমিষে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে।

ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবনের নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যার কথা তাহারা তাঁহাকে নিবেদন করে। জ্ঞানমূর্ত্তি মহাসাধকের এক একটি জ্ঞানগর্ভ

বাক্যে, এক একটি কাহিনী ও দোঁহার বর্ণনায় তাহাদের সর্ব্ব সংশয় দূর হইয়া যায়।

এক জিজ্ঞাসু ভক্ত সে-বার প্রশ্ন করেন, "বাবা, আমাদের বাঁচবার পথ, মুক্তির পথ কি—তা কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিন।"

প্রশান্তকণ্ঠে মহাপুরুষ উত্তর দেন, "ছাখো, মানুষের ইন্দ্রিয়ের বেগ বড় প্রবল। বিচার আর সংযম ছাড়া তাকে দমন করা কখনো সম্ভব নয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে, পতঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এরা প্রত্যেকেই এক একটি ইন্দ্রিয়ের বশ। এর ফলে তারা বরণ করে মৃত্যুকে। পতঙ্গের বিনষ্টির কারণ, তার চক্ষু। আগুনের রঙে মোহিত হয়ে সে তাতে ঝাঁপ দেয়। কুরঙ্গের কর্ণেন্দ্রিয় তাকে টেনে নেয় বংশীধ্বনির দিকে, তারপর সে হত হয় ব্যাধের বাণে। হাতী স্পর্শেন্দ্রিয়ের দূর্ব্বলতায় এগিয়ে যায় হস্তিনীর দিকে, ফাঁদের ভেতর। মৎস্য রসনার লোভে পড়ে প্রাণ দেয়—মৎস্যশিকারীর বড়শীতে। এ সব জীবের বিনষ্টি আসে এক একটি ইন্দ্রিয়ের অসংযমে। তবে ভেবে ছাখো তো, পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত মানুষের বিপদ কত বেশী। পাঁচ দিক থেকে টানাটানি ক'রে তাকে নিয়ে যাচ্ছে বিনাশের দিকে। তবে বিপদমুক্তির পথও রয়েছে। ভগবান তাকে দিয়েছেন বিচারশক্তি, দিয়েছেন সংযম।"

এক ভক্ত সেদিন নিবেদন ক'রে, "মহারাজ, আমরা সংসারী লোক, দিনরাত নানা ঝঞ্ঝাট আমাদের পোহাতে হয়। মুক্তির জন্য সাধন ভজন ক'রবো, তার সময় কোথায়? সংসারের ঝামেলা না মিটলে, একটু গুছিয়ে না বসতে পারলে কি করে ভগবানকে ডাকি?"

"আচ্ছা বাবা, সমুদ্রে যে স্নান করতে যায় সে কি কখনো কূলে বসে অপেক্ষা ক'রে, আর ভাবে—সমুদ্র আগে তরঙ্গশূন্য হোক্, তারপর স্নান ক'রতে নামবো? সংসারের কোলাহল আগে থামুক তারপর সাধন ভজন শুরু করবো—এযদি ভেবে থাকো, তবে এ জীবনে

মুক্তির প্রয়াস কোনদিনই আর ক'রা হয়ে উঠবেনা। কাজেই যে যতটুকু পারো, এই মুহূর্ত্ত থেকে কাজ শুরু করে দাও।"

হংসবাবা সেদিন ভক্ত ও শিষ্যদের নিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্ম ও প্রারব্ধ তত্ত্বের কথা উঠিল। তিনি কহিলেন, "কর্ম্ম হচ্ছে তিন প্রকার—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত কর্ম্মের মানে—জীব জন্মে জন্মে যে কর্ম্ম ক'রে এসেছে তার সমষ্টি, অর্থাৎ যে কর্ম্মফল জীবের ভোগের নিমিত্ত জমা আছে। আর প্রারব্ধের মানে হচ্ছে—ঐ সঞ্চিত কর্ম্মের ভেতর যে অংশ জীবের বর্ত্তমান জীবনকালে এ দেহে ভোগ করতে হবে, তাই।"

বাবা বলিতে চাহেন—"প্রারব্ধ-ভোগের জন্যই জীব দেহধারণ করেছে, জন্ম নিয়েছে। সঞ্চিত কর্ম্ম থেকে যে অংশ জীবের ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত হয়, তাই হচ্ছে প্রারব্ধ। এই প্রারব্ধ অনেক সময় সম্পদ বা বিপদরূপে দেখা দেয়।"

তারপর এই তত্ত্বটি প্রাঞ্জল করিতে গিয়া কহেন, "যদি কোন ভাণ্ডার ঘরে বহু দ্রব্য সঞ্চিত রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত সঞ্চিত দ্রব্য থেকে কিছু নিয়ে ব্যবহার করা যায়, তা'হলে যে জিনিষটি ভোগের নিমিত্ত এলো সেটিকে প্রারব্ধ বলা যেতে পারে। আর ঐ ভাণ্ডারের সঞ্চিত দ্রব্যগুলি হলো সঞ্চিত কর্ম্মফল। এই প্রারব্ধ বড়ো বলবান।"

"তবে কি এই প্রারব্ধের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই, বাবা?" প্রশ্ন করেন এক জিজ্ঞাসু ভক্ত।

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে, একথা ঠিকই। কিন্তু মধ্যাহ্নের খর তাপে ক্লিষ্ট হয়ে কোন পথিক যেমন মাথায় ছাতার আবরণ টেনে দেয়—আরাম করে, তেমনি যদি কেউ ভগবানের চরণে শরণ নেয়, তবে কঠোর প্রারব্ধের দণ্ডও কিছুটা লঘু হয়ে যায়।"

"ক্রিয়মাণ কর্ম্মের মানে কি, বাবা?"

"জীব যে সকল কর্ম্ম তার বর্ত্তমান জীবনে করে যাচ্ছে, তাই তার

ক্রিয়মান কর্ম্ম। আগেই বলেছি, প্রারব্ধ অত্যন্ত বলবান্ কিন্তু যদি কেউ একান্তভাবে ভগবৎ চরণে শরণ গ্রহণ করে, তবে সে প্রারব্ধের প্রকোপ তার ঐ কর্ম্মানুসারে মৃদু হয়ে আসে। তেমনি জীবের সঞ্চিত কর্ম্মফল ক্রিয়মান কর্ম্মদ্বারা লঘু করা যায়। প্রারব্ধ হচ্ছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল। এ জন্মের সৎকর্ম্ম ও পুরুষকার দ্বারা তার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় বৈকি।"

"আচ্ছা বাবা, এ জীবনের ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ফল কিরূপে বিনষ্ট করা যাবে ?"

"জ্ঞান দ্বারা। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা'।"

জীবের কর্ম্ম ও প্রারব্ধ সম্পর্কে আর একদিন মহাপুরুষ ভক্তদের কহিলেন, "প্রত্যেক কর্ম্ম হতে দুই প্রকার ফল উৎপন্ন হয় এবং তা হ'তেই সৃষ্ট হয় আমাদের ভাগ্য। নীচ কর্ম্ম থেকে হয় নীচ বাসনার সৃষ্টি, আর উচ্চ কর্ম্ম ও সাধুসঙ্গ থেকে জন্মে উচ্চ বাসনা। এই বাসনা হতেই প্রারব্ধ সূচিত হয় এবং কর্ম্মফল অনুযায়ী ভাগ্য পরজন্মে গঠিত হয়। প্রারব্ধ কখনো ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। 'প্রারব্ধ—কর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ'। যেমন ধনু হতে শর নিক্ষিপ্ত হ'লে তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, তেমনি পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত প্রারব্ধ যেভাবে এজন্মে সূচিত হয়েছে তারও কোন পরিবর্ত্তন করা যায় না—"

"যাগ যজ্ঞ শান্তি স্বস্ত্যয়নেও কি ভাগ্য বদলানো যায় না ?"

"না বেটা, তা হয়না। যে কুকুর হয়ে জন্মেছে সে কুকুরই থাকবে—এ জন্মে মানুষ হ'বার সম্ভাবনা তার নেই। তবে কোন কোন কুকুর ধনীর অঙ্কে ঘুরে বেড়ায়, পরম সুখে ও আদরে লালিত হয়। আবার অপর কুকুর খেতে না পেয়ে হয় কঙ্কালসার, দ্বারে দ্বারে পায় লাঞ্ছনা।"

"তবে লোকে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে কেন ?"

"যাগ যজ্ঞের দ্বারা ক্রিয়মাণ পাপ নাশ হয়, যেমন কোন ব্যক্তি গুরু ভোজনের পর অসুখে পড়ে, তারপর চিকিৎসকের ঔষধে হয়

রোগমুক্ত, তেমনি ভগবানের নামের দ্বারা ক্রিয়মাণ পাপ নাশ পায়—উত্তম বাসনার সৃষ্টি হয়। প্রারব্ধের ফলও কিছু মৃদু হয়। সদাই মনে রাখবে, বাসনাই বন্ধনের হেতু ও সকল দুঃখের মূল। বাসনা নাশ হলে আর জন্ম নিতে হয় না।"

"বাবা, জীব তো ক্লেশ পায় তার তৃষ্ণা থেকে। কিন্তু তার এ তৃষ্ণা যায় কিভাবে?"

"বস্তু বিচার দ্বারা—বৈরাগ্যের দ্বারা।"

জ্ঞানযোগী সাধক প্রায়ই বলিতেন, "মানুষের ভেতরে চিরবিরাজিত রয়েছেন সচ্চিদানন্দ। সর্ব্ব আনন্দের তিনি উৎস। এ উৎসকে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? অবিদ্যার মোহ এড়িয়ে, স্থিরভাবে বিচার ক'রে খুঁজতে হবে সেই উৎস-পথ।"

বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের কথা বুঝাইতে গিয়া হংসবাবা একটি সুন্দর আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেন—

"সরোবরে স্নান করতে গিয়ে এক মহিলা তার রত্নহার ভুলে ফেলে যান। একটি কাক তা ঠোঁট দিয়ে তুলে নেয়, ঘাটের উপরিস্থিত এক বৃক্ষে গিয়ে বসে। কিন্তু কিছুক্ষণ হারটি নাড়াচাড়া করেই সে বুঝতে পারে, এটি ভোজনযোগ্য কোন বস্তু নয়। তাই বৃক্ষশাখায় এটিকে ঝুলিয়ে রেখে সে উড়ে যায়।"

"এর পরই এক স্নানার্থী ঘাটে এসে উপস্থিত। জলের ওপর সে দেখতে পায় রত্নহারের প্রতিচ্ছবি। ভাবে—জলের তলেই বুঝি তা রয়েছে। খোঁজাখুঁজি সে অনেক ক'রে। কিন্তু হার কোথায় মিলবে? শুধু জলই ঘোলা হয় আর ঘাটের জল কর্দ্দমাক্ত হয়ে ওঠে। শেষটায় লোকটি হতাশ হয়ে চলে যায়।"

এরপর আসে আর এক স্নানার্থী। তাঁরও চোখে পড়ে ঐ চকচকে হারের প্রতিফলন। ধীর মস্তিষ্কে নানা বিচার বিবেচনা ক'রে, লোকটি বুঝতে পারে, জলের ভেতরে তো হার নেই, রয়েছে তার প্রতিবিম্ব। তবে আসল বস্তুটি কোথায়? বৃক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে

দেখতে পায়, তার শাখায় সেই রত্নহার ঝুলছে। অমূল্য বস্তুটি লাভ করার সৌভাগ্য তারই হলো। এমনি ধীর বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরমাত্মাকে লাভ করতে হয়।"

একটি মুমুক্ষু শিষ্য সে-বার সখেদে হংসবাবাকে বলেন, "বাবা, সংসারের এত মায়া, মোহ ও কর্ম্মের জালে আমাদের আবদ্ধ থাকতে হয়, তাই ভগবানের দিকে মন সহজে ফেরানো যায় না। কৃপা ক'রে এর উপায় বলুন।"

"ত্যাখো, বদ্ধ জীবের মন তো প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হবেই। এর প্রতিকার করতে হবে মনের জন্য আর একটি বিকল্প খাত তৈরী করে। সেই খাত দিয়ে চালনা ক'র তোমার ভগবৎমুখীন মনের প্রবাহকে। নূতন খাতে চালিত এই প্রবাহ তোমার বিষয়মুখী মনকে ক্রমে নিস্তেজ ক'রে আনবে। ক্রমে হবে অন্তর্মুখী। পরমাত্মার প্রতিও সহজে নিবিষ্ট হতে পারবে। ধীরে ধীরে এই পথটি ধরে সাধন করে চলো। এই হচ্ছে সাধকের ব্রহ্মাভ্যাস বা আত্মধ্যান—

সতত ব্রহ্ম অভ্যাস্‌সে মল বিক্ষেপকো নাশ
জ্ঞানদৃঢ় নির্বাসনা জীবন্মুক্তি প্রতিভাস।"

বাবা আরো বলিলেন, "সদাই বলবৎ রাখবে এই অভ্যাস। এর ফলে মনের মল নাশ হবে, মনবাসনাশূন্য হবে। এই পথেই যে জীব লাভ ক'রে জীবন্মুক্তি পরাজ্ঞান।"

কৈলাস পাহাড়ের শীর্ষে এই জ্ঞানমূর্ত্তি সাধকের পদতলে আসিয়া সমবেত হইত দেশ-বিদেশের অধ্যাত্মরসপিপাসু মানুষ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতের ধনী ব্যক্তিরাও আসিত দলে দলে। ইহাদের কেহ আসিত হংসবাবার অধ্যাত্মকৃপার প্রার্থী হইয়া, কেহ আসিত আর্ত্ত ভক্তরূপে। অনেকে সাগ্রহে প্রস্তাব দিত—"বাবা, আপনি অনুমতি দিন, আমরা এই কৈলাস পাহাড়ে এক বিশাল মঠ নির্ম্মাণ ক'রে তুলি। আপনার এই সাধন স্থানকে গড়ে তুলি জ্ঞানসাধনার বিরাট কেন্দ্ররূপে।"

মহাসাধক স্মিতহাস্যে বলিতেন, "বেটা, আমি বৈরাগী মানুষ, অর্দ্ধ

উলঙ্গ হয়ে একান্তে বসে থাকি এই নির্জ্জন পাহাড়চূড়ায়। আর প্রায়ই পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিই নর্ম্মদার কূলে। মঠমন্দির দিয়ে আমি কি করবো ? আর অর্থে তো আমার কোন প্রয়োজনই নেই বাবা। আমি যে শাহেনশাহ্ হয়েই বসে আছি। জানতো সেই দোঁহা—

চা গেয়ি, চিন্তা গেয়ি, মন্‌মে নেহি প্রবাহ।
যিস্ মনমে, সন্তোষ হ্যায় উয়ো শাহেন-শাহ্

—যাঁর কোন চাওয়া নেই, চিন্তা নেই—অন্তরে যাঁর বিরাজিত করছে চির-সন্তোষ, তিনি যে সত্যই এক শাহেনশাহ্—রাজাধিরাজ।"

এই শাহেনশাহ্ রূপেই তাঁহাকে অধিষ্ঠিত দেখা যাইত যশিডির পাহাড়ে, নর্ম্মদা সৈকতে, আব কুম্ভমেলার জনারণ্যময় প্রান্তরে।

ভারতের সাধক
শঙ্করনাথ রায়